আমিই খালেদ মোশার্‌রফ

সম্পাদনা এম আর আখতার মুকুল

আমিই খালেদ মোশার্‌রফ

সম্পাদনা

এম আর আখতার মুকুল

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

প্রথম অনন্যা প্রকাশ
জুন ২০১৭

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© ২০১৭ সম্পাদক

প্রচ্ছদ
বিপ্লব দে

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ২৭৫.০০ টাকা

ISBN 978 984 432 392 6

Ami-E Khaled Mosharraf Edited by M R Akhtar Mukul
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Ananya Published : June 2017, Cover Design : Biplob De
Price : 275.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ☐ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ☐ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে অনন্যা'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

উৎসর্গ

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখায় প্রভাবমুক্ত
বাঙালি জাতীয়তাবাদ-এর দর্শন বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের
সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে

খালেদ মোশার্‌রফ বীর উত্তম
এ টি এম হায়দার বীর উত্তম এবং
এন হুদা বীর বিক্রম-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

"....রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শা আল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"
বঙ্গবন্ধুর-৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে

মুজিবনগরে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী
তাজউদ্দীন আহম্মদ
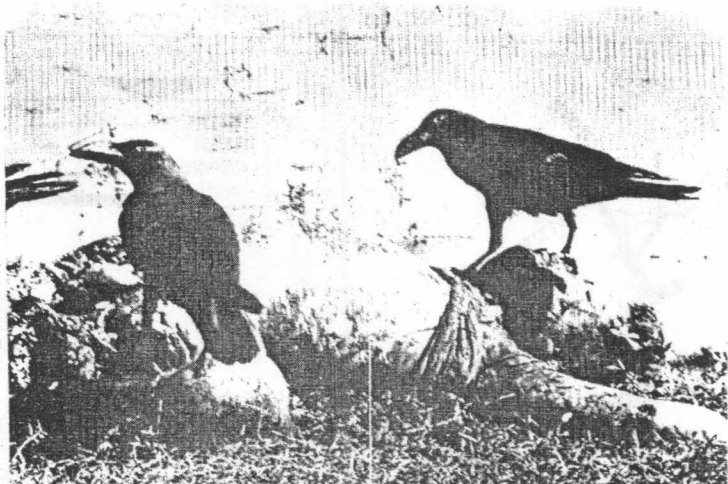
এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে

পোস্টার অংকন ঃ কামরুল হাসান

প্রকাশনায় মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর
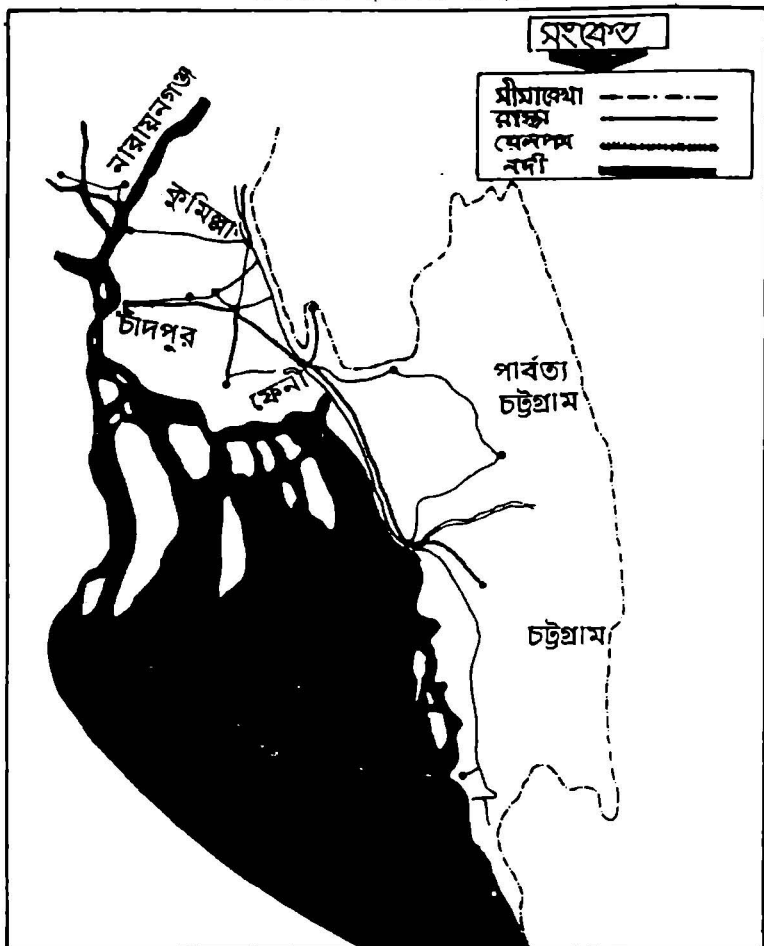
চাঁদপুর সেক্টর

এলাকা : দাউদকান্দি থেকে ফেনী বিলোনিয়া এবং সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা

পাকিস্তান নৌবাহিনী : চট্টগ্রাম রিয়ার এডমিরাল শরীফ

১৫০০ জন নৌ-সেনা এবং ৪০/৬০ এম এম কামান বসানো ২১টি গানবোট (যুদ্ধে বহু হতাহত এবং সমস্ত গানবোট বিদ্ধস্ত)

সমরনায়কবৃন্দ

: উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মো. জেনারেল রহিম খান (৩৯ তম ডিভিশন)

: ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লাহ্ (৯৭ ব্রিগেড, ২ কমান্ডো এবং ২১ আজাদ কাশ্মীর)

: ব্রিগেডিয়ার আতিফ (১১৭ ব্রিগেড)

: ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজী (৫৩ ব্রিগেড)

: ব্রিগেডিয়ার তাসকিন (৯১ ব্রিগেড)
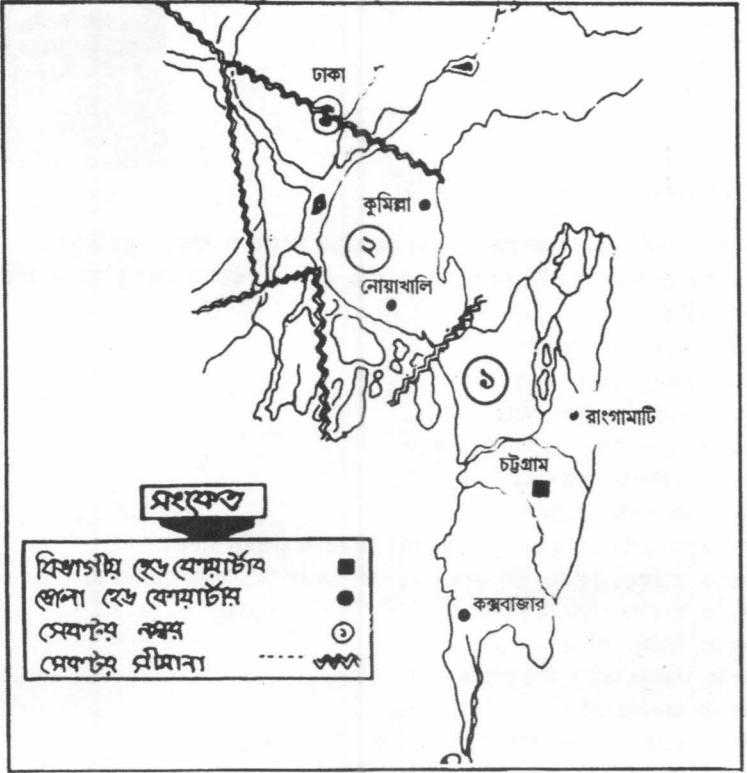
দুই নম্বর সেক্টর

এলাকা : নোয়াখালী বৃহত্তর জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেলওয়ে লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ

সেক্টর কমান্ডার
মেজর খালেদ মুশাররফ
এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

সেক্টর কমান্ডার
মেজর এ টি এম হায়দার
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত

সেক্টর নম্বর ২ এবং 'কে' ফোর্স

সেক্টর নম্বর ২ এবং 'কে' ফোর্স, মেজর জেনারেল খালেদ মোশার্‌রফ বীর উত্তম
সেক্টর কমান্ডার পরবর্তী সময় 'কে'-ফোর্সের প্রধান ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম এ মতিন বীর প্রতীক
কর্ণেল আনোয়ারুল আলম
কর্ণেল (অব.) শওকত আলী
কর্ণেল আইনুদ্দিন, বীর প্রতীক
কর্ণেল এম আশরাফ হোসেন, পি এস পি
লে. ক. গাফ্‌ফার, বীর উত্তম (অব.)
লে. কর্ণেল (অব.) বাহার
লে. কর্ণেল এ টি এম হায়দার, ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)
লে. ক. মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম ('৮১-তে সামরিক বিদ্রোহ ঘটাতে নিহত)
লে. ক. হারুনুর রশীদ, বীর প্রতীক
লে. ক. ফজলুল কবীর
লে ক. ফজলুল কবীর, বীর প্রতীক
লে. ক. ফজলুল কবীর
লে. ক. (অব.) আকবর হোসেন, বীর প্রতীক
লে. ক. ইমানুজ্জামান, বীর বিক্রম
লে. ক. (অব.) জাফর ইমাম, বীর বিক্রম
লে. ক. দিদারুল আলম, বীর প্রতীক (চাকরিচ্যুত)
লে. ক. শহীদুল ইসলাম, বীর প্রতীক
লে. ক. এ টি এম আব্দুল ওয়াহাব, পি এস সি
লে. ক. (অব.) মোখলেছুর রহমান
লে. ক. মোস্তফা কামাল
লে. ক. (অব.) জয়নুল আবেদীন
মেজর মালেক
মেজর সালেক চৌধুরী বীর উত্তম (মৃত)]
মেজর (অব.) এ আজীজ পাশা
মেজর (অব.) বজলুল হুদা
মেজর (অব.) দিদার আনোয়ার হোসেন
মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান (চাকুরিচ্যুত)
মেজর (অব.) হাশমী মোস্তফা কামাল
মেজর জামিলউদ্দীন, এহসান, বীর প্রতীক

লে. কর্ণেল (অব.) আব্দুল গাফ্ফার বীর উত্তম

লে. কর্ণেল (অব.) জাফর ইমাম বীর উত্তম

লে. কর্ণেল হারুনুর রশীদ বীর প্রতীক

মেজর জিল্লুর রহমান
ক্যাপ্টেন (অব.) হুমায়ুন কবীর, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) আখতার, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) সেতারা বেগম, বীর প্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) মমতাজ হাসান, বীর প্রতীক
লে. (অব.) শাহরিয়ার হুদা
লে. আজিজুল ইসলাম, বীর বিক্রম (শহীদ)

সেক্টর নম্বর ১-এর সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব.) রফিক-উল-ইসলাম বীর উত্তম রচিত 'লক্ষ' প্রাণের বিনিময়ে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

১৬ ডিসেম্বর তারিখের আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের তালিকা

১৬ ডিসেম্বর তারিখের আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের তালিকা

নিয়মিত সামরিক বাহিনী

ক. অফিসার : ১,৬০৬

খ. জে সি ও : ২,৩৪৫

গ. জোয়ান : ৬৪,১০৯

ঘ. নন-কমব্যাট : ১,০২২

বিমান বাহিনী

ক. অফিসার : ৬১

খ. ওয়ারেন্ট অফিসার : ৩১

গ. এয়ারম্যান : ১,০৪৯

আধা-সামরিক বাহিনী

ক. অফিসার : ৭৯

খ. জে সি ও : ৪৪৮

গ. জোয়ান : ১১,৬৬৫

অন্যান্য

সশস্ত্র পুলিশ এবং

বেসামরিক অফিসার ও ব্যক্তিবর্গ : ৭,৭২১

মোট : ৯১,৫৪৯

নৌ-বাহিনী

ক. অফিসার : ৯১

খ. পেটী-অফিসার : ৩০

গ. নৌ-সেনা : ১,২৯২

[সূত্র : দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং]

প্রস্তাবনা

স্বাধীন বাংলাদেশে আইন সম্মত পদ্ধতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল মাত্র ৪৩ মাসের মতো; ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত পর্যন্ত। এরপরেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। শুরুটা হয়েছিল অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই পর্দার অন্তরালে। এখন তো সব কিছুই গবেষণার বিষয় বস্তু। তবুও বাহ্যত আমরা দেখতে পেলাম, ১৯৭৫-এর আগস্ট থেকে ঘটনাগুলো সব ছবির মতো একটার পর একটা ঘটে গেল :

সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যা	: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫
মোস্তাক স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট	: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫
ঢাকা জেলে চার নেতা হত্যা	: ৩ নভেম্বর ১৯৭৫
খন্দকার মোস্তাক ক্ষমতাচ্যুত	: ৪ নভেম্বর ১৯৭৫
ক্ষমতায় খালেদ মোশার্‌রফ	: ৪-৬ নভেম্বর ১৯৭৫
খালেদ মোশার্‌রফ হত্যা	: ৬ নভেম্বর ১৯৭৫
জিয়া-সায়েম ক্ষমতায়	: ৭ নভেম্বর ১৯৭৫

এসময় আমি কার্যোপলক্ষে ছিলাম সুদূর লন্ডনে। এরপর নানা ঘটনা প্রবাহে বছর কয়েকের জন্য নির্বাসিত জীবন। যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন ১৯৭৮-এর সমাপ্তিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 'গণতন্ত্রে উত্তরণের' প্রক্রিয়া চল্‌ছে।

তখন থেকেই আমার মনে প্রচণ্ড বাসনা, নতুন প্রজন্মের জন্য একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর খালেদ মোশার্‌রফ সম্পর্কে একটি তথ্য বহুল পুস্তক রচনার।

এরপর বিস্তৃতির অন্তরালে আরও বারোটি বছর গত হয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ তে অবসর গ্রহণের পর ১৯৯০ সালে এসে আমার এই সম্পাদিত গ্রন্থ 'আমিই খালেদ মোশার্‌রফ'। বইটির সব ক'টি নিবন্ধই সংগৃহীত; শুধুমাত্র গ্রন্থনা আমার।

মাঘ ১৩৯৬ নওরতন কলোনি
নিউ বেইলি রোড ঢাকা

এম আর আখতার মুকুল
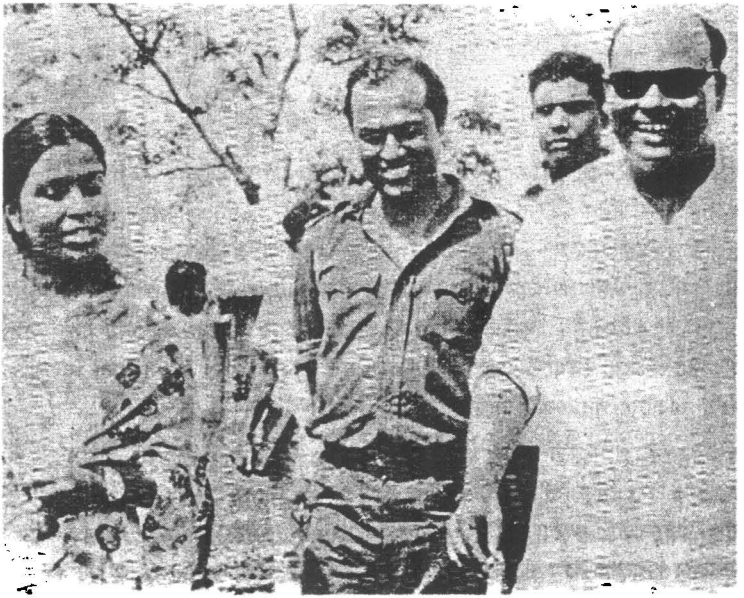
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২নং সেক্টর-এর রণাঙ্গন পরিদর্শনকালে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ। পাশে ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম।

১৯৭৫-এর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নানা ঘটনা প্রবাহে স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খালেদ মোশাররফ-এর হাতে। তাঁকে নৌ-বাহিনী প্রধান রিয়াল এ্যাডমিরাল এম এইচ খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব মেজর জেনারেল-এর ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন।

খালেদ মোশাররফ এবং সালমা খালেদ। এঁদের বিয়ে ১৯৬৩ সালে

পিতৃহারা দুই কন্যার সাথে বেগম সালমা খালেদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ক. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম

খ. সাপ্তাহিক 'এখনই সময়' ঢাকা

গ. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসপি

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ৯ম খণ্ড

আমিই খালেদ মোশার্‌রফ

আমার পিতৃ প্রদত্ত নাম খালেদ মোশার্‌রফ। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে আমার জন্ম। জন্মস্থান জামালপুর জেলার ইসলামপুরের অন্তর্গত মোশার্‌রফগঞ্জ গ্রামে। পিতার নাম মোশার্‌রফ হোসেন এবং মাতা জমিলা আখতার।

আমি রূপকথায় বিশ্বাসী নই। কিংবদন্তীর কথাবার্তাও আমার বিশেষ জানা নেই। আমি বাংলাদেশের ইতিহাসের সামান্য একটু অংশ সগর্বে বলতে পারি। কেননা এই গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন, আমি তাঁদেরই একজন। সব সময়ে মনে রাখবেন, বাঙালি জাতির সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিজয় হচ্ছে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিজয়। আর এটাই হচ্ছে আমাদের রক্তাক্ত প্রকৃত ইতিহাস।

১৯৭১ সালে মুজিবনগরের নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধে আমি ছিলাম ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে 'কে' ফোর্সের প্রধান।

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের জন্য আমার এই জবানবন্দি। এটা তো শুধু জবানবন্দি নয়; এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। অথচ এসব বাস্তব ইতিহাস আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে হয় অনুপস্থিত— না হয় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত।

একটা গণতান্ত্রিক রায়কে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের তৎকালীন জংগী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশে

গণহত্যায় লিপ্ত হয়। এর মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার আহ্বানে (২৬ শে মার্চ ভোর রাতে) আপামর বাঙালি জনসাধারণ সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর চাকুরিতে থাকা সত্ত্বেও আমরা এর ব্যতিক্রম নই। সেদিন বাংলাদেশে অবস্থানরত বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল।

অচিরেই মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে সংগঠন করলেন এক বিশাল মুক্তিবাহিনী। বাংলাদেশের রণাঙ্গণকে তিনি বিভক্ত করলেন ১১টি সেক্টরে (নৌ-কমান্ডের পৃথক সেক্টরসহ)। আমি দায়িত্ব লাভ করলাম পূর্ব রণাঙ্গণে গুরুত্বপূর্ণ ২ নম্বর সেক্টরের।

আমাদের প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত হলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এম এ জি ওসমানী এম সি এ। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনাব ওসমানী আওয়ামী লীগ টিকিটে সিলেট থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য। এ সবই হচ্ছে বাস্তব ইতিহাস।

আমার জবানবন্দি কিন্তু অসম্পূর্ণ। ১৯৭১ সালের ১৯ শে মার্চ থেকে ২৮ শে জুন পর্যন্ত মাত্র ১০০ দিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের জবানবন্দি। এরপরেই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ। আসলে কিন্তু রণক্ষেত্রের বিজয়ের ইতিহাস তো বলতেই পারলাম না। সে ইতিহাস হচ্ছে ১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একটার পর একটা বিজয়ের ইতিহাস। পুরো বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার আর সময় পেলাম কই?

['আমিই খালেদ মোশার্‌রফ' বইটির শিরোনামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশার্‌রফ-এর জবানিতে এই প্রাসংগিক কথাবার্তা- সম্পাদক]

আমার অসম্পূর্ণ জবানবন্দি

১৯শে মার্চ, ১৯৭১ আমাকে ঢাকা সেনানিবাস থেকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেড অফিস কুমিল্লাতে বদলী করা হয়। আমি ২২শে মার্চ আমার পরিবারকে ঢাকার ধানমণ্ডিতে রেখে কুমিল্লা চলে যাই এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে যোগদান করি। ইউনিটে পৌঁছবার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম আমার সৈনিকরা বেশ উদ্বিগ্ন। পাঞ্জাবিদের কমান্ডো এবং গোলন্দাজ (আর্টিলারি) বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে মেশিনগান লাগিয়ে অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ পেলেই সবাইকে হত্যা করবে। সেনানিবাস রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবিরা এসব পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের মনে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আমি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে চায় এখন তাদের কী কর্তব্য? আমি সবাইকে সতর্ক থাকতে বলি এবং আত্মরক্ষার্থে প্রহরী দ্বিগুণ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের শান্ত করি।

পরের দিন ২৩শে মার্চ ছুটির দিন ছিল। ২৪শে মার্চ সকাল সাতটায় আমি প্রথম অফিসে রিপোর্ট করি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল খিজির হায়াত খানের কাছে। তিনি চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন এবং পাঞ্জাবি। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল খিজির হায়াত খান আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, আমার পোস্টিংয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। এবং ইউনিট সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। ঐদিন আমি যখন অফিসে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড উপপ্রধানের কাজ বুঝে নিচ্ছিলাম সকাল প্রায় সাড়ে দশটায়, তখন খিজির হায়াত খান আমাকে ডেকে পাঠান। আমি অফিসের ভিতরে ঢুকে দেখি খিজির হায়াত খান উদ্বিগ্ন। তিনি আমাকে বসার জন্য বললেন এবং জানান যে, আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আজই কুমিল্লা থেকে রওনা হতে হবে। আমি উত্তর দিলাম, হুকুম যদি হয় আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আমি মাত্র একদিন হয় এসেছি এবং আমার দায়িত্ব কেবল বুঝে নিচ্ছি, এসময় আমাকে ইউনিট থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়ত আপনার পক্ষে ভুল হবে। তাঁকে আরো বুঝাতে চেষ্টা করলাম, ব্যাটালিয়নে আরও অফিসার আছে, তাদেরকেও পাঠান যেতে পারে। তা ছাড়া কোনো ইউনিট উপপ্রধানকে সাধারণত এভাবে পাঠানো হয় না।

আমার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন, ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সে জন্য তোমাকেই যেতে হবে। আমি জানতে চাইলাম আমাকে কী ধরনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। কর্ণেল খিজির হায়াত খান বললেন, খবর এসেছে সিলেটের শমসেরনগর-এ নক্সালপন্থীরা বেশ তৎপর হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে। আরো খবর হচ্ছে ভারত থেকে বেশ অনুপ্রবেশও হচ্ছে। এইসব কারণে ৪র্থ বেঙ্গলের একটা কোম্পানি নিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং তাদের দমন করতে হবে।

আমি জবাব দিলাম একটা কোম্পানি যখন যাবে, তখন কোনো জুনিয়র মেজরকে সেখানে পাঠানো যেতে পারে। সাধারণত উপপ্রধান একটা কোম্পানি নিয়ে কখনও যায় না। আমার বক্তব্যে খিজির হায়াত খান কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, ঠিক আছে আপনি যান। আমি আপনাকে একটু পরে ডেকে পাঠাব। কিছুক্ষণ পরে কর্ণেল আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ব্রিগেড কমান্ডার ইকবাল শফি এক্ষুণি আপনাকে ডেকেছে। আমাকে নিয়ে কর্ণেল খিজির হায়াত বিগ্রেড কমান্ডারের কাছে গেলেন। বিগ্রেড কমান্ডার আমাকে দেখেই বললেন, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যা একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ সম্পন্ন করতে পারবে না। এই জন্য আমি তোমাকেই নির্বাচিত করেছি। আশা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। আর্মি ট্রুপস ছাড়া শমসেরনগরে ইপি আর-এর দুটি কোম্পানি আছে। এই বড় ফোর্স-এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসারের দরকার। তুমিই একমাত্র বাঙালি অফিসার কুমিল্লাতে, যাকে আমি এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি।

আমি বুঝতে পারলাম যেতে আমাকে হবেই। উপায় যখন আর নাই তখন যতটুকু তাদের কাছে আদায় করা নেয়া যায়, সে টুকুই আমার পক্ষে মঙ্গল। আমি ব্রিগেডিয়ার শফিকে বললাম, যে কাজের ভার আমাকে দিচ্ছেন, শুধু একটা কোম্পানি দিয়ে তা হবে না। কোম্পানির চেয়ে বেশি সৈন্য আমাকে দেওয়া হোক। আর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা শক্তিশালী অয়ারলেস সেট দরকার। এ ছাড়া যেহেতু আমি অনেক দূরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি, সেহেতু আমার ট্রুপস-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভারী, হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টার ইত্যাদি এবং যথেষ্ট পরিমাণ গোলাবারুদ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। ব্রিগেডিয়ার শফি প্রথমে বললেন, তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠান হচ্ছে, তাতে এসব ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে না। আমি উত্তরে বললাম যে, আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন তাতে আমার সামরিক জ্ঞান অনুসারে এই সমস্ত ভারী অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হবে- বিশেষ করে যেখানে হেডকোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাবার আশা কম। আমার বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি কনভিন্স্ড হলেন এবং কর্ণেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দিলেন আমার যা

প্রয়োজন তা যেন আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা ব্রিগেডিয়ার শফির কাছ থেকে ইউনিটে ফিরে এলাম। এসেই ব্যাটালিয়নের এডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন গফ্‌ফারকে (এখন মেজর) ডেকে নির্দেশ দিলাম, সমস্ত ব্যাটালিয়ন থেকে বেছে বেছে ২৫০ জনের মতো সৈনিককে আল্‌ফা কোম্পানিতে একত্রিত করার জন্য।

গফ্‌ফারকে বলে দিলাম, ব্যাটালিয়নের ভারী অস্ত্রশস্ত্র যত আছে সব নিয়ে নাও। গোলাবারুদ এমনভাবে নেবে যাতে একমাস যুদ্ধ করা যায়। আমাদের ২৬টা গাড়ি ব্রিগেড থেকে দেওয়া হয়েছিল। সব বোঝাই করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের তৈরি করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই সময় আমি একটা অস্বাভাবিক ঘটনা দেখতে পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমাদের লোকজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত খিজির হায়াত এবং অন্যান্য ব্রিগেড স্টাফ-এর অফিসাররা অফিসেই বসে।

আমি ২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাওয়ার জন্য তৈরি হই। ব্যাটালিয়নে যে সমস্ত বাঙালি অফিসার রয়ে গেল, তারা সবাই আমার যাবার পূর্বে মেসে এসে দেখা করে গেল। এদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর)। তাকে আমি এ-মর্মে উপদেশ দিলাম যে, আমি চলে যাচ্ছি, এতে ঘাবড়াবার কিছু নাই। এখন তুমিই সিনিয়র। যদি কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে এই ৪র্থ বেঙ্গল-এর বাকি ট্রুপস-এর নিরাপত্তার পুরা বন্দোবস্ত করবে। প্রয়োজন হয় যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে আর আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা হলাম। রাত প্রায় দুইটা-আড়াইটার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সেখানে রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড। এই প্রতিবন্ধকতার জন্য আমাদের এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই ব্যারিকেড ভাঙতে ভাঙতে শহরের দিকে এগোচ্ছিলাম। শহরের একপ্রান্তে যে পুল আছে (নিয়াজ পার্কের কাছে) সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্র-জনতা আমাদের বাধা দেয়। হাজার হাজার লোক এবং ছাত্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং বলে, যেতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকজনের সংগে কথা বলতে চাইলাম। ওখানেই আওয়ামী লীগের তদানীন্তন এম সি এ সাচ্চু মিয়া এবং অন্য কয়েকজন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রনেতারা আমাকে জানান যে, পূর্ব বাংলার অনেক জায়গায় পাকিসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটারি চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা আরো বললেন, আপনাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈনিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা আপনাদের যেতে দেব না।

এইভাবে কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। ইতোমধ্যে মেজর শাফায়াত জামিল (বর্তমানে লে. কর্ণেল), যিনি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটা কোম্পানি

নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থান করছিলেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনিও বুঝাতে চেষ্টা করলেন যাতে ব্যারিকেড এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও তারা আমাদের অনুরোধ রাখতে রাজি নন। এরপর ওদের সঙ্গে করে মেজর শাফায়াত জামিলের ক্যাম্পে গেলাম। সেখানে আবার কথাবার্তা চলে। তাদের আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেই যে, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট, যখন দরকার পড়বে বাঙালি জাতির জন্য পিছিয়ে থাকবে না। এখন আমাদের বাধা দেয়া ঠিক হবে না। সকাল সাড়ে পাঁচটায় সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের আর বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শমসেরনগরের পথে ২৫ শে মার্চের সকালে আবার আমরা রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে মেজর শাফায়াত জামিলকে আলাদা ডেকে সতর্ক করে দিলাম এবং আমার সঙ্গে অয়ারলেস মারফত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলাম।

সকাল দশটা-এগারটার সময় আমরা শ্রীমঙ্গলে পৌঁছি। সেখান থেকে শমসেরনগর যাবার রাস্তা আমার জানা ছিল না। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, শমসেরনগর যেতে হলে মৌলভীবাজার হয়ে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গলে কনভয় দাঁড় করিয়ে স্থানীয় কিছু লোককে জিজ্ঞেস করি শমসেরনগরের যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে। জানতে পারি মৌলভীবাজার হয়ে যাওয়া যায় অথবা আর একটি রাস্তা আছে সোজা শ্রীমঙ্গল হয়ে জঙ্গল এবং পাহাড়ের মধ্য হয়ে। এই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের। আমরা সোজা জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শমসেরনগরের পথে রওনা দিলাম। যে রাস্তা দিয়ে, যাওয়ার কথা ছিল সে রাস্তা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের পথ। এই রাস্তা খুব খারাপ ছিল, তাই অতি কষ্টে দুপুর ২ টার সময় শমসেরনগরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে যেয়ে ডাকবাংলোতে আমি আমার ছাউনি লাগালাম।

দুপুরে খেয়ে আমি এবং লে. মাহবুব শমসেরনগরের চারদিক ঘুরে দেখে আসি। মনে হলো পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আরো কিছু পেট্রোল পার্টি চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেই। স্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারি কোনো অঘটন সেখানে ঘটেনি। ইপিআর-এর যে দুটো কোম্পানির কথা আমাকে বলা হয়েছিল, তাদের কোনো পাত্তা নাই। ই পি আর-এর একজন সুবেদার এবং আরো কয়েকজন সিপাই শমসেরনগর এয়ারপোর্টে অবস্থান করছিল। তাদের সংগে যোগাযোগ করে সঠিক কোনো উত্তর পাইনি। শমসেরনগরের টি-গার্ডেনগুলো ঘুরে জানতে পারলাম সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি ম্যানেজার এবং অফিসাররা ঢাকায় চলে গেছে। নক্সালপন্থী বা অনুপ্রবেশকারীদের কোনো চিহ্ন আমি খুঁজে পেলাম না। ২৫ মার্চের রাতটা এভাবে খবরাখবর নিয়ে এবং পেট্রোলিং করে কেটে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে ঘোরালো মনে হলো। আমার মনে জাগলো আমাকে এখানে কৌশল করে পাঠানো হয়েছে। এবং যা কিছু তারা

বলেছিল, তার সবটাই মিথ্যা। আমি সমস্ত সকাল অয়ারলেস-এর মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো যোগাযোগ হলো না। এইভাবে দুপুর পর্যন্ত চলে যায়।

আমি আর লে. মাহবুব ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম। এমনি সময় খবর এল একজন পাঞ্জাবি অফিসার এবং বেশ কয়েকজন সৈন্য শমসেরনগর বাজারে এসেছে। সেখানে কারফিউ জারি করে ওরা স্থানীয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে। সেই দলটি আমাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিল। আমাদের সেন্ট্রিকে সেই দলের অফিসারকে ডাকার জন্য পাঠাই। অফিসারটি ক্যাম্পের ভিতরে আসে এবং আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করে। এমন ভাব দেখায় যে, আমরা এখানে আছি এটা সে জানত না। কথাবার্তায় আমি জানলাম, ৩১-পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর বেশকিছু সৈন্য সিলেট থেকে মৌলভীবাজারে এসে দুদিন আগে ক্যাম্প করেছে। অফিসারের হাবভাব এবং কথাবার্তা আমাকে সন্দিহান করে তোলে। যতক্ষণ সে ডাকবাংলোয় বসেছিল, ততক্ষণ সে স্টেনগানটি কোথাও না রেখে নিজের হাতে রাখে। এতে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এদের আগমন সম্বন্ধেও আমাকে অবহিত করা হয়নি। এটাও ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পরে অফিসারটি তার দলবল নিয়ে চলে যায় এবং যাওয়ার আগে আমাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ক্যাম্পে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায় জানালাম।

সেই দিনই বিকেলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বপ্রথম জানতে পাই, ঢাকাতে কিছু একটা ভয়ংকর অঘটন ঘটেছে। কিন্তু সঠিক কেউ কিছু বলতে পারে না। আস্তে আস্তে লোকমুখে আরও শুনতে পাই যে, ঢাকায় পাকি সেনাবাহিনী হাজারে হাজারে লোক গুলি করে মেরে ফেলেছে এবং মারছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতেও পাকিবাহিনী এধরনের নৃশংস অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ঢাকা ছেড়ে জান বাঁচানোর জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে। পাকিসেনাবাহিনী ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্দোষ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বর্বরোচিতভাবে আক্রমণ করেছে। ঢাকা শহর একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমি অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করতে থাকলাম আমার এখন কর্তব্য কী। অয়ারলেস সেট খোলার হুকুম দিয়ে হেডকোয়ার্টরের সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে গেলাম। অনেক চেষ্টার পরেও কোনো যোগাযোগ হলো না। তবুও আরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে বললাম। অনেকক্ষণ পর আমাকে লে. মাহবুব এসে খবর দিল যে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে অতি কষ্টে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম অয়ারলেসে কথা বলার জন্য। যখন আমি কথা বলতে চাই, তখনই অন্য প্রান্তে কর্ণেল খিজির হায়াত কিংবা ক্যাপ্টেন আমজাদ (পাঞ্জাবি) জবাব দেয়। তাদের

কাছে কোনো কথাই খুলে বলা সম্ভব ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম কর্ণেল খিজির হায়াত এবং ৪র্থ বেঙ্গল-এর বাকী অংশ কুমিল্লা থেকে ২৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসেছে। কর্ণেল খিজির হায়াত আমাকে জানালেন, সবকিছু স্বাভাবিক এবং তিনি আরো জানালেন যে, অতিসত্বর তিনি একবার শমসেরনগরে পরিদর্শনে আসবেন। বললাম এখানে সব শান্ত এবং আমার এখানে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমাকে ফেরার অনুমতি দেয়া হোক। তিনি জবাবে আমাকে শমসেরনগরেই থাকতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি আবার অয়ারলেসে কথা বলার চেষ্টা করি।

এবার ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফারের (এখন মেজর) সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে, ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফারের পাশে কোনো পাঞ্জাবি অফিসার দাঁড়িয়ে। সেজন্য সব কথা খুলে বলতে পারছিল না। আমি শুধু তাকে বললাম যখন সুযোগ পাবে তখন মেজর শাফায়াত জামিলকে (বর্তমানে লে. কর্ণেল) আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে। আরো কিছুক্ষণ পরে মেজর শাফায়াত জামিল আমার সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলেন। জানালেন ঢাকাতে পাকি সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের মধ্যে এই কথা ২৬ শে মার্চের সন্ধ্যাবেলায়। শাফায়াত জামিল লোকমুখে শুনেছেন যে, সব লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার দিকে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর শাফায়াত জামিল এবং ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফার আরো জানান যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে এবং ৪র্থ বেঙ্গলকে এটা কার্যকরী করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসাধারণ সান্ধ্যআইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেছে। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কী তা আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমার পক্ষে এ-প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন ছিল। আমি প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থান করছি। বাংলাদেশে আর কোথায় কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। ঢাকা শহরে পাকিবাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে এবং আরো অনেক জায়গাতেও করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মুহূর্তে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই যে, তাদের কাছে কোনো উপদেশ নেব। একদিকে সামরিক শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যবোধ; অন্যদিকে বিবেকের দংশন আমাকে পীড়িত করছিল। এই উভয়সংকটে পড়ে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। মেজর শাফায়াত জামিলকে বললাম, আমাকে কিছুটা সময় দাও। আমি কিছুক্ষণ পরে বলব, তবে কোনোমতেই যেন গুলি চালানো না হয়। লোকজনকে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা কর। আমি আমার কামরার চতুর্দিকে পায়চারি করতে শুরু করলাম এবং এমন অবস্থায় নানা ধরনের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি বসে পড়লাম এবং লে. মাহবুবও (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) সেখানে বসে ছিল। আমার সঙ্গে যে সব বাঙালি সৈনিকরা ছিল, তারাও উদ্বিগ্ন হয়ে আমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা স্মরণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ : স্লোগান 'জয় বাংলা'

অবশেষে আমার বিবেক আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদিও কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ সেই মুহূর্তে ছিল না তবুও বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের ঘোষণার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, "এবার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আমি লে. মাহবুবকে ডেকে বললাম, এই মুহূর্তে আমি স্বাধীন বাংলার আনুগত্য স্বীকার করলাম। এখনই সব সৈনিকদের বলে দাও, আজ থেকে আমরা আর কেউ পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নই। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দাও। এখন থেকে আমরা পাকিসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবো। সব সৈনিকদের তৈরি হতে বল। এখান থেকে আমরা ঢাকার দিকে রওনা দেব এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্রিত করতে হবে। লে. মাহবুব যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে বাকি সবাইকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম বঙ্গশার্দুলদের স্লোগান "জয় বাংলা"। আমি তাদেরকে প্রথমে শান্ত করলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম আমাদের এখন থেকে যে সংগ্রাম শুরু হলো সেটা কঠিন এবং বিপদসংকুল। সকলেই নিজেকে স্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে দেশ ও জাতির এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্যে আত্মীয়স্বজন, আর্থিক কষ্ট এবং সবকিছু সুবিধা ত্যাগ করে আত্মবিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি দেখতে পেলাম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা সবাই দৃঢ় সংকল্পে থেকে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। প্রথমে অয়ারলেসে মেজর শাফায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং তাকে নির্দেশ দেই যেন সেও তৈরি থাকে। তাকে আরো বললাম, কুমিল্লার রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতে। শীঘ্রই আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছব। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। আমি লে. মাহবুবের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে শ্রীমঙ্গলে পাঠিয়ে দিই এবং সেখানে ডিফেন্স নিতে নির্দেশ দেই যাতে আমাদের যাওয়ার পথে মৌলভীবাজার থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এসে বাধা দিতে না পারে। শমসেরনগর থেকে জঙ্গলের পথে রাত বারটায় আমি আমার কনভয় নিয়ে রওনা হয়ে যাই। রাস্তায় আমাদের অগ্রসর গতি অনেক মন্থর ছিল। কারণ সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড এবং কোনো কোনো জায়গায় রাস্তা কেটেও দেয়া হয়েছিল। জঙ্গলের অনেক জায়গায় বিরাট গাছ কেটে রাস্তার উপর ফেলে দেয়া হয়েছিল। এইসব প্রতিবন্ধকতা আমাদের কেটে কেটে বা মাটি ফেলে পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। সব প্রতিবন্ধকের কাছেই অনেক লোক লুকিয়ে দেখছিল আমরা কী করি। যখনই তারা বুঝতে পারত আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্ট

এবং ঢাকার দিকে বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখনই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলতে এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সাহায্য করত। আমরা ভোর সাড়ে পাঁচটায় সাতছড়িতে পৌঁছলাম। এখানে আমার সৈনিকরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়।

আমি আবার অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যোগাযোগ করি। ঐ অবস্থাতে কর্ণেল খিজির হায়াতের সঙ্গেও আলাপ হয়। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে, সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক। মেজর শাফায়াত জামিলও আমার সঙ্গে কথা বলে। সে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জানতে চায় আমি কোথায় এবং আসতে কেন দেরি হচ্ছে। আমি বললাম, ভয়ের কোনো কারণ নেই, কেন না আমি অনেক কাছে এসে গেছি। তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি আবার রওনা হই। সকাল ৬ টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দশ মাইল দূরে মাধবপুরে পৌঁছি এবং মেজর শাফায়াত জামিলের সঙ্গে অয়ারলেসে কথা বলি। আমাকে বললেন, সকাল ১০টায় কর্ণেল খিজির হায়াত একটা কনফারেন্স ডেকেছেন (আমি পরে জানতে পারি যে, কুমিল্লা থেকে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর একটা কোম্পানি সেই সময়ে আসছিল)। কনফারেন্স-এর কথা যখন আমি শাফায়াতের কাছে শুনতে পেলাম, তখন আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি এবং তাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি। আমি তখনই শাফায়াতকে নির্দেশ দিলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করো না। প্রয়োজন হলে সমস্ত পাঞ্জাবি অফিসারকে কর্ণেল খিজির হায়াতসহ গ্রেফতার করে ফেল এবং বাকী পাঞ্জাবি সৈন্যদের নিরস্ত্র কর। আমরা আবার রওনা হয়ে গেলাম।

পরে শুনেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা। সেদিন দশটা বাজার দশ মিনিট আগে কর্ণেল খিজির হায়াত, মেজর নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন আমজাদ কনফারেন্সে বসেছিল। ঠিক এমনি এক সময়ে মেজর শাফায়াত জামিল, লে. কবির (বর্তমানে ক্যাপ্টেন), লে. হারুন (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) হঠাৎ সেই কামরায় প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাবি অফিসারদের অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দেন। মেজর নেওয়াজ যিনি নিজে একজন কমান্ডো ছিলেন তিনি কিছুটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু লে. হারুনের ত্বরিত প্রচেষ্টায় তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সব পাঞ্জাবি অফিসারকে তারা বাংলাদেশের নামে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যে বাকী বঙ্গশার্দুলরা বাইরে যে সব পাঞ্জাবি সৈনিক ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে এবং যারা বাধা দেয়ার চেষ্টা করে তাদের চরম শাস্তি প্রদান করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। দিনটি ছিল ২৭ শে মার্চ। ইতিমধ্যে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছেই এসে গেছি। আমার বাহিনী এবং শাফায়াতের বাহিনী বেলা ১১ টার দিকে সম্মিলিত হয়। আমি বুঝলাম আমার প্রথম কর্তব্য হলো, যে সমস্ত এলাকা মুক্ত হয়েছে তা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আমি প্রথমেই অফিসারদের নিয়ে একটা বৈঠক করি এবং এই প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থাকে কী ভাবে কার্যকরী করতে হবে তার সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনা জানাই। আমার এই পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা মেঘনা নদীকে উত্তরে রেখে পশ্চিমে প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করব এবং দক্ষিণে ময়নামতি সেনানিবাস পর্যন্ত মুক্ত করে প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করব। উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার থেকে সিলেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে সিলেটে আরও একটি ঘাঁটি স্থাপন করব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরববাজারে প্রথম দু'টো কোম্পানি পাঠিয়ে দিই। আর একটা পার্টিকে কুমিল্লার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অগ্রসর হতে বলি। মেঘনার পূর্ব পাড়ে একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরির ব্যবস্থা করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়াও, তিতাস নদীর চতুর্দিকে একটা আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করি। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে একটা কোম্পানি দিয়ে সিলেটের দিকে পাঠিয়ে দেই। শ্রীমঙ্গলে তাদের সাথে স্থানীয় সংগ্রামী আনসার, মুজাহিদ এবং আরো কিছু সংখ্যক সৈন্য কর্ণেল রবের নেতৃত্বে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল) যোগ দেয়। এই দলটির সাথে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সব সৈন্য মৌলভীবাজারে ছিল তাদের সাথে লড়াই হয়। পাঞ্জাবিরা অনেক হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরে মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে যায়। সিলেট শহর পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমি বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব রকিব। তিনি অত্যন্ত উৎসাহী, সাহসী এবং সংগ্রামী ছিলেন। তিনি সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেসামরিক সাহায্যের যতটুকু প্রয়োজন ছিল- যেমন রসদ সরবরাহ, যানবাহন জোগাড়, সৈনিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, আর্থিক সাহায্য অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে করেছেন। তিনি পুলিশ অয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা এবং মহকুমা প্রশাসকদের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধ করছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমার সাথে জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তাদের আমি বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমার আনুগত্যের কথা বলি। তারা আমাকে সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কীভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করা যায়। আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাই, যে কোনো উপায়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে যদি কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে পারেন, তাহলে আমি আমার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো সুন্দর ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি তখন জানতাম যে, আমার কাছে যা গোলাবারুদ আছে তা নিয়ে বেশি দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাঁরা এই বার্তা নিয়ে আগরতলাতে চলে যান।

এমনি এক সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসরমান পাঞ্জাবি সৈন্যদের সাথে আমার অগ্রবর্তী সৈন্যদের কোম্পানিগঞ্জে লড়াই হয়। এতে পাকিস্তানিরা অনেক হতাহত হয়ে আবার কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পশ্চাদপসরণ করে।

২৯শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শত্রুসেনা প্রথম বিমান হামলা চালায়। এতে আমার একজন সৈনিক শহীদ হন। সেদিনই সন্ধ্যায় একজন অফিসার এবং ৮ জন সিপাইসহ পাকিস্তানিদের একটা রেকি পার্টি (তথ্য অনুসন্ধানী দল) ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসে। এই দলটি আমাদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির অ্যামবুশে পড়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা সব শত্রুসেনা এবং একখানা গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর বিমান হামলা অব্যাহত থাকলে আমদের প্রতিরক্ষা আরো অধিকতর শক্তিশালী হতে থাকে। আমি এই অবস্থাতে ভৈরব বাজার এবং নরসিংদীর ভিতরের রেলওয়ে লাইন অনেক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং আর একটা দলকে নরসিংদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেই। এই দলটির সঙ্গে ঢাকা থেকে আগত প্রাক্তন ই পি আর এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের কিছু সৈন্যের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সম্মিলিত দলটি ঢাকা থেকে পাকিসেনাদের অগ্রসরমান এক বিরাট বাহিনীকে অ্যামবুশ করে পর্যুদস্ত করে এবং ঢাকার দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

আমাদের তখনো বাইরের আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাঙালি সেনাবাহিনীর কোনো দলের সাথে যোগাযোগ হয়নি। অন্যান্য জায়গার অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

এই নাজুক অবস্থায় আমি জানতে পাই যে, মেজর সফিউল্লাহ (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার) ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জে এসে তাঁর দ্বিতীয় বেঙ্গলকে একত্রিত করেছে। আরও জানতে পারলাম যে, সে তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাবার পরিকল্পনা করেছে। এই সংবাদে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ, আমি জানতাম ঢাকাকে পাকিস্তানিদের অন্ততপক্ষে দুই ব্রিগেড সৈন্য রয়েছে তাছাড়া সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ বাহিনীর কামান এবং বিমানবাহিনী আছে। এসব অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। বিরাট পাকিসেনার বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার মানেই ছিল আমাদের শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা।

আমার সঙ্গে মেজর সফিউল্লাহ্‌র যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত কোনো সরাসরি রাস্তা না থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তা নাহলে এ সর্বনাশকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। অনেক চেষ্টার পর আমি একটা খালি রেলওয়ে ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করলাম। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে সে ইঞ্জিনে বসিয়ে সোজা কিশোরগঞ্জ পাঠিয়ে দিলাম। তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলাম। কোনো কিছু করার আগে মেজর শফিউল্লাহ যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সম্ভব হলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানাই।

এরপর ক্যাপ্টেন মাহবুবও কিশোরগঞ্জ থেকে ফিরে এসে জানায়, মেজর সফিউল্লাহ্ এবং তাঁর সমস্ত সেনাদল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। মেজর সফিউল্লাহ্ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছেন এবং তিনি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে আসেন। আমাদের দুটো দলের যোগাযোগ হওয়াতে আমাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। এরপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করি। এসময় এমর্মে খবর এল যে, পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণ করার যথেষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা পাকিস্তানিদের আক্রমণ কৌশল সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের উপর বিমান, হেলিকপ্টার এবং নদীপথে ঢাকার দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। নদী পথে আক্রমণ করার জন্য তারা মেঘনার পথে গানবোটে আসতে পারে এবং মেঘনার দক্ষিণ পাড়ে ল্যান্ডিং করতে পারে এবং তারা সাথে সাথে হেলিকপ্টারযোগেও কমান্ডো এবং শক্তিবাহিনী নামাতে পারে।

যে বিস্তীর্ণ মুক্ত এলাকা আমাদের আয়ত্তাধীন ছিল, এর সমস্ত এলাকাতে অবস্থান নেয়ার মতো আমার কাছে সৈন্য ছিল না। সেই জন্য আমি আমার ট্রুপসকে যেখানে পাকিবাহিনীর অবতরণের এবং আক্রমণের বেশি সম্ভাবনা, সেই জায়গাগুলোতে ডিফেন্স নেয়ার বন্দোবস্ত করি। এই সময়ে আমি জানতে পাই ৪র্থ বেঙ্গল-এর জনা পঞ্চাশকে সৈন্য, যারা কুমিল্লার দক্ষিণে জাংগালিয়া ইলেকট্রিক গ্রিড স্টেশনে প্রহরায় ছিল, সেইসব সৈন্য ২৫ শে মার্চের পর নিকটবর্তী একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি এই অবস্থাতে তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দেই, তাদের আরও দক্ষিণে যেয়ে লাকসাম এবং কুমিল্লার মধ্যখানে লালমাই হিলের মধ্যপ্রান্তে টেম্পল পাহাড় নামক এক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়তে হবে। এমর্মে আরও নির্দেশ দিলাম যে, কুমিল্লা থেকে পাকিবাহিনী লাকসাম, নোয়াখালী কিংবা চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হলে শত্রুকে অ্যামবুশ এবং বাধা দিতে হবে। এরমধ্যে খবর পেলাম আখাউড়া, কসবা, বুড়িচংখেলাতে পাকিস্তানি সেনারা ইপিআর পোস্টগুলোতে বাঙালি ইপি আর'দের বিরুদ্ধে এখনও লড়াই করে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে আমি ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে (বর্তমানে মেজর) পাঠাই কিছু লোকজন দিয়ে যাতে বাঙালি ইপি আরদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে এইসব পোস্টগুলো পাঞ্জাবিদের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত হামলা অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের পর পাঞ্জাবিরা এইসব অবস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এইসব খণ্ডযুদ্ধের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কুমিল্লার গোমতী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা আমরা মুক্ত করতে সমর্থ হই এবং কুমিল্লা বিবিরবাজার নামক একটা জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি।

ইতিমধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং সাচ্চু মিয়ার প্রচেষ্টায় আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের কিছু সাড়া পাওয়া যায়। সীমান্তে আমার সঙ্গে আগরতলার জেলা

প্রশাসক মি. সাইগলের সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তখনও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। আমার কাছে বিস্তারিত জানতে পেয়ে তিনি আশ্বাস দিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তাকে আমি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। কয়েকদিন পর আবার সীমান্ত এলাকায় ভারতের সেনাবাহিনীর ৫৭ তম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গানজালভেস-এর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকেও আমি ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেই। তখন পর্যন্ত আমরা কোনো সাহায্য পাইনি।

নির্বাসিত সরকার গঠনের অনুরোধ : ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর আম্রকাননে তাজউদ্দীন মন্ত্রীসভার শপথ

এপ্রিল মাসের ২/৪ তারিখে কুমিল্লার সীমান্তে মতিনগরের নিকট কর্ণেল এম এ জি ওসমানী (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত জেনারেল) যখন ভারত সীমান্তে পৌঁছেন, তখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হন এবং তারপরই আগরতলাতে চলে যান। পরের দিন সন্ধ্যায় আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়াতে কর্ণেল ওসমানী আমাকে, মেজর সফিউল্লাহ্, লে. কর্ণেল রবকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল) নিয়ে একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আমরা যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তাঁকে জ্ঞাত করি। আমি তাঁকে আরও জানাই, আমাদের যে শক্তি আছে তা দিয়ে বেশি দিন পাকিবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অতিসত্বর বন্ধুরাষ্ট্র বা অন্য কোনো জায়গা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া আরো অনুরোধ করা হয়, নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতি শীঘ্র আমাদের বাংলাদেশ সরকার গঠন করা অপরিহার্য। এর ফলে আমরা বহির্জগতের স্বীকৃতি লাভ এবং যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাব। ওসমানী সাহেব আমাদের বক্তব্য বুঝতে পারলেন এবং আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে গেলেন। কিছুদিন পর ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকার করে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।

এই সময়ে বন্ধুরাষ্ট্র থেকে বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে আমাদের হেডকোয়ার্টারে আসেন এবং আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন আমাদের সহায়তা করার। কিন্তু সে সাহায্য ছিল নগণ্য। আমরা চেয়েছিলাম হালকা এবং ভারী স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার, মর্টার। কিন্তু এ সময় আমাদের কিছু ৩০৩ রাইফেল এবং সামান্য গুলি সাহায্য দেয়া হয়। এসব ছিল আমাদের

চাহিদার তুলনায় অনেক নগণ্য। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার পান্ডে আমাদের মেজর জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানান এবং একদিন মেজর জিয়াউর রহমানকে (বর্তমানে বিগ্রেডিয়ার) সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, পাকিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে অতি নগণ্য সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানকে কিছু সৈন্য দেয়ার অনুরোধ করেন মি. পান্ডে। আমি এবং মেজর সফিউল্লাহ্ নিজ নিজ বাহিনী থেকে দুটো শক্তিশালী কোম্পানি গঠন করে মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে পাঠিয়ে দেই।

এদিকে পাকিবাহিনী আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর প্রবল বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। এই আক্রমণ এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, মাঝে মাঝে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা অনবরত স্ট্রাপিং, রকেটিং এবং বোম্বিং হয়। এপ্রিল মাসের শেষে পাকিবাহিনী বিমানবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টার এবং গানবোটের সাহায্যে আমাদের আশুগঞ্জ পজিশনে সৈন্য অবতরণ করায়। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের বিমান বাহিনী এবং ছত্রীদের সম্মিলিত সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে অসহায় হয়ে আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পিছু হটে আসে। বাহ্মণবাড়িয়াতেও শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এপ্রিল মাসের শেষ অবধি আমরা শত্রুসেনাকে ঠেকিয়ে রাখি। শেষ পর্যন্ত শত্রুদের সাঁজোয়া বাহিনী, বিমান বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে আর টিকতে না পেরে আমরা দুই রাস্তায় পিছু হটে গেলাম। আমার সৈন্যরা ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে আখাউড়াতে এসে তিতাস নদীর উপর পুনরায় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। মেজর সফিউল্লাহ্ তাঁর বাহিনী নিয়ে মাধবপুরের দিকে চলে যায়। পাকিবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে আসে এবং আখাউড়া আক্রমণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহত স্বীকার করে শত্রু বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

আমি এই সময়ে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুলের (বর্তমানে উভয়েই ক্যাপ্টেন) নেতৃত্বে আরও কিছু সৈন্য পাঠিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণে ৪ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানিকে জোরদার করি।

কুমিল্লা থেকে এপ্রিল মাসের ১৫/১৬ তারিখে পাকিবাহিনীর বিরাট এক কনভয় প্রায় ৩০টি গাড়িতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাকসামের দিকে যাচ্ছিল। লে. মাহবুবের নেতৃত্বে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানির সৈন্যরা শত্রুসেনার এই দলটিকে দুপুর বারোটায় জাঙ্গালিয়ার নিকটে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে শত্রুসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। সংঘর্ষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। পাকিসেনারা গাড়ি থেকে নেমে অ্যামবুশ পার্টিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা এবং কৌশলের কাছে তারা পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে লে. মাহবুব এবং লে. দিদার যথেষ্ট কৌশল এবং

যুদ্ধ-নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল। লে. মাহবুব তাঁর সৈন্যদের নিয়ে রাস্তার পূর্বপাশে অ্যামবুশ করে ওঁৎ পেতে বসে ছিল। যখন শত্রুদের কনভয় তার অ্যামবুশ-এর মাঝে পড়ে যায়, তখন সে তাদের উপর তাঁর লোকজন দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে একটা গাড়ি রাস্তা থেকে অ্যাকসিডেন্ট করে পড়ে যায়। বাকী গাড়িগুলো থেকে পাকিসেনারা লাফালাফি করে নিচে নামার চেষ্টা করে। এতেও যথেষ্ট হতাহত হয়। যেসব পাকিসেনা গাড়ি থেকে ভালোভাবে নামতে পারে তারা রাস্তার ওপারে [পশ্চিম দিক] গিয়ে একত্রিত হয় এবং লে. মাহবুবের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়।

এদিকে লে. দিদারুল আলম রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য নিয়ে তৈরি ছিল। সে পাকিস্তানিদের উপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এইভাবে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং নিজেদের এত হতাহত দেখে শত্রুসেনাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে যায়। মৃতদেহ ফেলে রেখেই তারা কুমিল্লার দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে লে. মাহবুব এবং লে. দিদারুল আলমের সম্মিলিত দলটি ২টি মেশিনগান ৬টি হালকা মেশিনগান এবং বহু রাইফেল আহত এবং নিহত শত্রুসেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। যে বিধ্বস্ত গাড়িগুলো শত্রুরা ফেলে গিয়েছিল, তা থেকে কয়েক হাজার অ্যামুনিশন উদ্ধার করা হয়। এর তিনদিন পরে স্থানীয় জনসাধারণ আরও ২টা হালকা মেশিনগান, কয়েকটা রাইফেল এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ, যা শত্রুসেনারা পালিয়ে যাবার সময় ধানক্ষেতে ফেলে দিয়েছিল, আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এই অ্যাকশনের ফলে আমার অ্যামুনেশনের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকভাবে মিটে ছিল। এবং পাকিবাহিনী বেশ কিছুদিন কুমিল্লার দক্ষিণে অগ্রসর হবার আর সাহস দেখায়নি।

অন্যদিকে আখাউড়াতে পাকিবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে আবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাদের ২৫ জনের মতো হতাহত হয় এবং তারা আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পশ্চাদপসরণ করে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিবাহিনীর ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কুমিল্লা থেকে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তায় অগ্রসর হয়ে সাইদাবাদ দখল করে নেয়। পরে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে তারা নিয়ামতাবাদ, গঙ্গাসাগর দখল করে। আমি তখন কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকাতে যেখানে পাকিবাহিনী প্রতিদিন আক্রমণ চালাচ্ছিল, সেখানে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলাম। গঙ্গাসাগর, নিয়ামতাবাদ শত্রুকবলিত শুনতে পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে নির্দেশ দেই ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে কসবার উত্তরে চণ্ডিমুড়া উঁচু পাহাড়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ শক্ত করতে। সেই রাত্রেই কুমিল্লার দক্ষিণে অবস্থানরত ৪র্থ বেঙ্গলের আলফা কোম্পানিকে উঠিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাসাগরের নিকটে দুটি কোম্পানিকেই একত্রিত করি। সন্ধ্যায় যখন আমি চণ্ডিমুড়ার নিকটে পৌছি তখনই শত্রুদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বিবরণ ইপিআর'দের কাছ থেকে অবগত হই।

সেই রাত্রেই গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদে শত্রুদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেই। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফার এবং একজন সুবেদারের নেতৃত্বে আলফা, চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে ভোর পাঁচটায় শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করি। এই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল যে, ক্যাপ্টেন গাফ্‌ফার এবং ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পূর্ব দিক থেকে শত্রুদের গঙ্গাসাগর পজিশনের পিছন দিক থেকে ইনফিলট্রেট করে ভিতরে ঢুকে গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালাবে এবং সেই সময়ে সুবেদার শামসুল হক তাঁর আলফা কোম্পানি নিয়ে নিয়ামতাবাদের উপর যে জায়গাতে আমরা শত্রুদের হেডকোয়ার্টার ভেবেছিলাম, যেখানে আক্রমণ চালাবে। এ দুই আক্রমণ এক সঙ্গে চারটায় শুরু হবে। আক্রমণের ঠিক দশ মিনিট আগে সুবেদার শামসুল হকের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গলের মর্টার এই দুই পজিশনের উপর গোলা ছুঁড়বে। রাত বারটায় এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি এই তিন কোম্পানি নিয়ে শত্রুদের ঘাঁটিতে ঢুকে যাই।

সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চতুর্দিকে বেশ পানি জমেছিল। আমাদের হাঁটুপানি ভেঙে ত্রাসের রাস্তায় অগ্রসর হতে হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন ঠিক পথে যাচ্ছি না। এই সময়ে নিকটবর্তী একটা বাড়ির একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সে একজন পুরনো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তি। এই ভদ্রলোক আমাদের শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত খবর দেয়। এর সাহায্যে ভোর পাঁচটায় আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই। আক্রমণ করার সময় নির্দিষ্ট ছিল রাত চারটা। যেহেতু আমরা দেরিতে পৌঁছি সেহেতু পাঁচটায় পরিকল্পনা মতো আক্রমণ শুরু করে দেই। শত্রুসেনারা অকস্মাৎ তাদের অবস্থান এবং পিছনে ভয়ংকর গোলাগুলির শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারা গঙ্গাসাগর এবং নিয়ামতাবাদ ছেড়ে সাইদাবাদে পশ্চাদপসরণ করে। আমরা পরের দিন সকালে গঙ্গাসাগরে আবার প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলি। শত্রুসেনারা গঙ্গাসাগরে পর্যুদস্ত হয়ে কসবার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। তাদের প্রথম আক্রমণ আমরা ব্যর্থ করে দেই কিন্তু পরে গোলন্দাজবাহিনীর সহায়তায় পাকিসেনারা টি, আলীর বাড়ি পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ঘাঁটি গড়ে তোলে। অন্যদিকে আমরা কসবা পুরানা বাজারে আমাদের পজিশন শক্তিশালী করে তুলি এং শত্রুসেনাকে কসবার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেই। টি. আলীর বাড়িতে শত্রুসেনাদের যে ঘাঁটি ছিল সেই ঘাঁটিতে ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল-এর ডেলটা কোম্পানি মর্টারের সহায়তায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন-এর নেতৃত্বে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। এই আক্রমণে শত্রুদের চার-পাঁচটা গাড়িতে আগুন লেগে যায় এবং তাদের ২০-৩০ জন হতাহত হয়। তারা টি, আলীর বাড়ি ছেড়ে আরো পিছনে হটে যায়। ইতোমধ্যে কুমিল্লার বিবিরবাজার পজিশনের উপর পাকিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

পরে কুমিল্লা শহরের সন্নিকটে দেড় মাইল পূর্বদিকে তারণ্যপুর শত্রুরা দখল করতে সমর্থ হয়।

আমি ইপিআর-এর একটি কোম্পানি এবং কিছু সংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সৈন্য দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও শক্তিশালী করে তুলি। তবুও আমাদের এই প্রতিরক্ষা অবস্থানে শত্রুসেনারা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে। এই অবস্থানটির উপর পাকিসেনাদের লক্ষ্য এজন্য ছিল যে, প্রতিরাত্রে এখান থেকে আমার ছোট ছোট কমান্ডো পার্টি গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহর অঞ্চলে পাকিস্তানি অবস্থানের উপর অতর্কিত হামলা চালাতো এবং শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। এখান থেকে আমরা অনেক সময় তাদের অবস্থানের উপর মর্টার হামলাও চালাতাম। এতে প্রায়ই পাকিসেনাদের অনেক লোক হতাহত হতো। অবশেষে পাকিবাহিনী একদিন সন্ধ্যার সময় অতর্কিতে আমাদের এই পজিশনের উপর ৩৯ তম বেলুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাঙ্কের সহায়তায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনা পূর্বদিকে আক্রমণ চালনা করে। এই আক্রমণ বাঙালি সৈন্যরা নস্যাৎ করে দেয় এবং শত্রুদের অনেক লোক নিহত এবং আহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের পজিশনের উপরে ট্যাঙ্ক-এর সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ চার-পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আমাদের গুলিতে শত্রুদের অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ জন নিহত বা আহত হয়। কিন্তু ট্যাঙ্ক এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পিছন দিক থেকে ঘিরে ফেলার আশংকা থাকায় আমাদের বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

এই যুদ্ধে ইপিআর-এর জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেয়। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা। ইনি শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল যে, তাদের নিহতের বিপুল সংখ্যা দেখে এক পর্যায়ে 'জয় বাংলা' হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত তার মাথায় গুলি লাগে এবং সে মারা যায়। এ যুদ্ধে আমার ৬জন সৈন্য শহীদ হয় এবং ৮/১০ জন আহত হয়। এই আহতদের আমরা পিছনে নিয়ে আসি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। এরকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে। ছাত্রটির পেটে গুলি লেগেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।

এদিকে গঙ্গাসাগরে এবং আখাউড়ায় শত্রুসেনারা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং বারবার আখাউড়া আর গঙ্গাসাগরের উপর আক্রমণ চালায়। জুন মাসের প্রথমে পাকিবাহিনীর ১২ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ট্যাঙ্ক, কামান এবং বিমান বাহিনীর সহায়তায় আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং গঙ্গাসাগরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৪র্থ বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি কিছুটা পিছু হটে এবং আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে আধা-মাইল পূর্বে আজমপুরে আবার

প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ কার্যকলাপের ফলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থানগুলোর উপর পাকিবাহিনী বারবার আক্রমণ চালায় এবং প্রতিবারই ৩০-৪০ জন করে সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আক্রমণ থেকে নিরস্ত থাকে।

মে মাসে প্রধান সেনাপতি ওসমানী আমাদের হেডকোয়ার্টার-এ আসেন। ভবিষ্যত যুদ্ধ পরিচালনা কী ভাবে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা বেসিক পেপার তৈরি করতে। মেজর সফিউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটা বেসিক পেপার তৈরি করে ফেলি। এই পরিকল্পনায় আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে দুই ধরনের বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত করার সুপারিশ করি প্রথমত, নিয়মিত বাহিনী, যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং অন্যান্য আর্মস ও সার্ভিসেস-এর নিয়মিত সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হবে। এই সব নিয়মিত বাহিনী দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর একটা ডিভিশন গড়ে উঠবে এবং কিছু সংখ্যক নিয়মিত সৈন্য নিয়ে প্রত্যেক সেক্টরেই কোম্পানি গঠন করা হবে। এই সব কোম্পানি শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কমান্ডো অ্যাকশন চালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর পুরানা এবং নতুন ব্যাটালিয়নগুলো নিয়ে ব্রিগেড গঠন করে সেই সব ব্রিগেড শত্রুদের ঘাঁটির উপর আক্রমণ অব্যহত রাখবে এবং প্রয়োজন হলে দখলীকৃত অবস্থানগুলোতে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবে।

দ্বিতীয়ত, যেসব যুবক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদের ট্রেনিং দিয়ে একটা অনিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই অনিয়মিত বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপ এবং কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে নিজ নিজ এলাকা শত্রুমুক্ত করবে। এসব নিয়মিত বাহিনীর কোম্পানি এবং গ্রুপগুলো যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য তাদের পরিচালনার জন্য নিয়মিত বাহিনী থেকে জেসিও বা এনসিওদের পরিচালনার জন্য পাঠানো হবে। এই পরিকল্পনায় আমরা আরো উল্লেখ করি যে, নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মতোই হবে। কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র হালকা ধরনের হবে এবং এলএমজি'র চেয়ে ভারী অস্ত্র দেয়ার প্রয়োজন হবে না।

ওসমানী সাহেব আমাদের সাথে একমত হন এবং তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন যে, এই পরিকল্পনা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়, তিনি তার চেষ্টা করবেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে অনেক যুবক আমাদের কাছে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি আমার হেডকোয়ার্টারে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে দেই। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং-এর প্রবর্তন করি।

মন্দভাগ-শালদা নদী এলাকায় মুক্তিবাহিনীর পেট্রোল এবং কমান্ডোদের ব্যাপক অ্যাকশন শুরু

এদিকে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার এবং ক্যাপ্টেন সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা মন্দভাগ এবং শালদা নদীতে শত্রুসেনাদের উপর অনবরত আঘাত চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৬ শে মে রাত ৯ টায় সুবেদার ভুঁইয়ার নেতৃত্বে দুটি সেকশন রকেট লাঞ্চার নিয়ে শত্রুর শালদা নদীর পজিশনের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর শত্রুদের ২টা বাংকার তারা রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। শত্রুরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালে পেট্রোল পার্টি হালকা মেশিনগানের সাহায্যে শত্রুসেনাদের বেশ কিছু লোক নিহত করে এবং পিছু হটে আসে। পরে জানতে পারি যে, এই আকস্মিক হামলায় শত্রুদের ১ জন জেসিও এবং ৯ জন সৈন্য মারা যায়।

শালদা নদীর শত্রু অবস্থানটির উপর আমাদের চাপ আরো বাড়াতে থাকে। ২৫ শে মে আমাদের আর একটি ছোট দল অতর্কিত হামলা করে পাকিসেনাদের ১ জন জেসিও এবং ৫ জন সৈন্যকে নিহত করে। তাদের ২টি মর্টারও ধ্বংস হয়। ২৭শে মে শত্রুসেনারা কুটি থেকে সিএন্ডবি রাস্তায় শালদা নদীতে আরো সৈন্য আনার চেষ্টা করে। সকাল ৭টায় মুক্তিবাহিনী পাকিসেনাদের এ দলটিকে অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশ-এর ফলে ১টা জিপ, ১টা ডজ ধ্বংস ও শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয়। শত্রুরা সামনে অগ্রসর হতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

২৮শে মে রাতে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডোরা কুমিল্লার কাছে কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। ওই দিন সকালে পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের কাছে রঘুরামপুরে একটি কোম্পানি নিয়ে আসে। এই কোম্পানিকে আমাদের মুক্তিবাহিনী সকাল সাড়ে ছ'টায় সময় অতর্কিতে অ্যামবুশ করে এবং অ্যামবুশে পাকি সেনাদের অন্তত একজন অফিসারসহ ৩৫ জন লোক হতাহত হয়। পাকি সেনারা প্রচণ্ড মার খেয়ে মরিয়া হয়ে ভবনগর, শালুকমুড়া, খাড়েরা, ফকিরবাজার প্রভৃতি গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়। এ ছাড়াও শত্রুসেনারা তিন ইঞ্চি মর্টার এবং ১০০ এম এম ভারী মর্টারের সাহায্যে যথেষ্টভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর উপর গোলা ছুঁড়তে থাকে।

২৮শে মে নায়েক গিয়াসুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে আর একটি পেট্রোল পার্টি মনোহরপুর নামক গ্রামে শত্রুদের প্রতিক্ষায় একটি অ্যামবুশ পেতে থাকে। পাকি সেনাদের ১টি কোম্পানি জঙ্গলবাড়ির দিকে যাচ্ছিল কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তা দিয়ে। সকাল সাড়ে ৮টায় পাকি সেনাদের কোম্পানিটি নায়েক গিয়াসুদ্দিনের অ্যামবুশ-এর ফাঁদে পড়ে যায় এবং তাদের ২৫ জনের মতো লোক হতাহত হয়। শত্রুসেনারা পিছু হটে এসে পুনরায় কামানের গোলার সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করে। এর মধ্যেই আমাদের অ্যামবুশ পার্টি তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করেছে। শত্রুরা পার্শ্ববর্তী মাগুরা, মনোহরপুর ইত্যাদি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে কামানের সাহায্যে গোলা ছুঁড়তে থাকে।

২৮শে মে সকাল ৬টায় কুমিল্লার দক্ষিণে রাজারমার দিঘির শত্রুদের বাংকারে আমাদের ২ জন সৈনিক গোপনে গিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৪জন সেনাকে নিহত করে এবং তাদের রাইফেলগুলো দখল করে নিয়ে আসে। ঐদিনই সকাল ৯টায় লাকসাম-কুমিল্লা রেল লাইনের উপর আলীশ্বরের কাছে মাইন পুঁতে ১ টা রেলওয়ে ইঞ্জিন ও ২টা বগি লাইনচ্যুত করে। এর আগে ২৬শে মে জগন্নাথদিঘির শত্রু অবস্থানের উপর লে. ইমামুজ্জামানের প্লাটুন রাত ১১ টার সময় অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। জামান এই আক্রমণে ১টি প্লাটুন, ২টি তিন ইঞ্চি মর্টার ও ২টি মিডিয়াম মেশিনগান ব্যবহার করে। আক্রমণের ফলে শত্রুদের ১৯ জন লোক হতাহত হয়। আমাদের অন্য ১টি পেট্রোল পার্টিকে ২৬শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা রোডের উপর উজানিরশা সেতুর কাছে পাকিবাহিনীর পাহারারত সৈনিকদের ক্যাম্প আক্রমণের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের দলটির সঙ্গে কমান্ডো শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোকও ছিল। কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই দুই জায়গাতেই পাকিবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। কেন না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যোগাযোগ এই রাস্তা পাকিস্তানিদের গতিবিধির জন্য বিশেষ জরুরি ছিল। উজানিরশা ব্রিজকে ধ্বংস করে পাকিসেনাদের গতিবিধিকে ব্যাহত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দলটি রাত ১১টায় উজানিরশা ব্রিজটি অকস্মাৎ হামলা করে এবং সফলতার সাথে বিস্ফোরক লাগিয়ে ১টা স্প্যান ধ্বংস করে দেয়। এই অকস্মাৎ হামলায় শত্রুদের ১৩ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি ২৯ শে মে শালদা নদীর পিছনে পশ্চিমে শিবপুর, বাজরা ও সাগরতলাতে শত্রুদের অবস্থানের পিছনে সকাল ৪টায় মেশিনগান এবং ৭৫ এম এম আর আরসহ ঢুকে পড়ে। শত্রুরা তাদের পিছনে হঠাৎ মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশে বেশ হকচকিয়ে যায়। সকাল ৫টা পর্যন্ত আমাদের দলটি শত্রু অবস্থানের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের বেশ কয়েকটা বাঙ্কার ধ্বংস হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রায় ২৭ জন হতাহত হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে, এ আক্রমণে ৩১ তম বেলুচের মেজর দুররানিও নিহত হয়।

৩১শে মে আমাদের ১টা পেট্রোল পার্টি কুটির কাছে শত্রুসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে যায়। তারা দেখতে পায় যে, একটি জিপ-এ ৬জন পাকিস্তানি সৈন্য কুটি গ্রামে প্রবেশ করছে। জিপটি গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে থেকে ৬ জন পাকিসেনা জিপ থেকে বের হয়ে গ্রামের ভিতরে যায়। আমাদের ছোট দলটি সঙ্গে সঙ্গে বোমা ছুঁড়ে ড্রাইভারসহ জিপটি ধ্বংস করে দেয়।

এই একই দিনে আমাদের ৬ জন সৈন্যের একটি দল সুবেদার আবদুল হক ভুঁইয়ার নেতৃত্বে শালদানদী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অনুপ্রবেশ করে। যখন তারা তথ্যানুসন্ধান করছিল, সে সময় পাকিসেনাদের দু'জন ওপি, যারা গাছের উপর

বসে দূরবীন লাগিয়ে আমাদের অবস্থান খুঁজছিল, তাদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে মেরে ফেলে।

এদিকে ৪র্থ বেঙ্গল-এর আলফা কোম্পানি মেজর সালেকের নেতৃত্বে এবং চার্লি কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফ্ফারের নেতৃত্বে শালদা নদী এবং মন্দভাগে পাকিসেনাদের উপর বার বার আঘাত হেনে যাচ্ছিল। শত্রুরা প্রতিদিন কিছু না কিছু হতাহত হচ্ছিল। আমাদের এই দুই কোম্পানির সেনাদল ৩ ইঞ্চি মর্টারের সহায়তায় শিবপুর, বাগরা গৌরঙ্গলা প্রভৃতি জায়গা হয়ে শত্রু- অবস্থানটি প্রায় তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাকিসেনাদের অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের বাংকার থেকে মাথা তোলারও সুযোগ ছিল না। গুলি এবং মর্টারের গোলার সাহায্যে আমাদের সৈনিকরা শত্রুদের অবস্থানে আঁকড়ে থাকাকে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক করে তুলেছিল। এছাড়া কুটি এবং শালদা নদীর রাস্তায় আমাদের অ্যামবুশ পার্টি ২৪ ঘণ্টা অ্যামবুশ পেতে থাকত। এর ফলে রসদ এবং অস্ত্র সরবরাহ করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা রেলওয়ে লাইন ব্যবহারের বার বার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। এরপর শালদা নদী দিয়ে রসদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। সেখানেও তারা আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় তাদের মনোবল সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল।

জুন মাসের পহেলা তারিখে আমাদের চাপের মুখে টিকতে না পেরে তারা মন্দভাগ এবং শালদা নদী অবস্থানগুলো পরিত্যাগ করে নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। সম্মুখ সমরে শালদা নদী থেকে শত্রুসেনাকে জুন মাসের প্রথম দিকে পর্যুদস্ত করে পিছু হটিয়ে দেয়া আমাদের মুক্তিবাহিনীর জন্য ছিল একটা বিরাট সাফল্য ও কৃতিত্ব। এতে আমার সেক্টরের সব সৈনিকের মনোবল পুনরুদ্ধার হয়। মার্চ মাস এবং মে মাসের প্রথম দিকে যখন পাকিবাহিনী অতর্কিতে বিপুল সৈন্য, কামান, বিমান বাহিনীর সহায়তায় আমাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন আমাদের সৈনিকরা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাকিসেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। কিন্তু অবশেষে বেশিরভাগ সময়ে পাকি বাহিনীর বিপুল শক্তি ও সরঞ্জামের সামনে আমাদের বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হয়। শালদা নদী এবং মন্দভাগে প্রায় এক মাস ধরে মরণপণ লড়াই-এর পর আমরা পাকিবাহিনীকে তাদের শক্তিশালী অবস্থান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হলাম। শত্রুসেনা চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন গাফ্ফারকে মন্দভাগে প্রধান অবস্থান গড়ে তোলার এবং শালদানদীতে তাঁর অগ্রবর্তী ঘাঁটি করার নির্দেশ দেই।

পাকিবাহিনী এরপর মাধবপুর থেকে অগ্রসর হয়ে কমলছড়ি চা বাগান দখল করে নেয়। এই চা বাগানে তারা মিলিশিয়ার এক কোম্পানি এবং নিয়মিত বাহিনীর প্লাটুনসহ একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। লে. হারুন বুঝতে পারে

যে, পাকিসেনারা দক্ষিণে আখাউড়া থেকে এবং উত্তরে মাধবপুর থেকে ভায়া কমলছড়ি আমাদের সিঙ্গারবিল পজিশনকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। লে. হারুন পাকিবাহিনীকে পৃথকভাবে উত্তর এবং দক্ষিণে আঘাত হানার পরিকল্পনা নেয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই কমলছড়ি চা বাগান আক্রমণ। জুলাই মাসে কমলছড়ি চা বাগান এবং চা বাগানে পাকি বাহিনীর ঘাঁটি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরাখবর জোগাড় করা হয়। একদিন রাত তিনটার সময় ৪র্থ বেঙ্গল-এর ১টা প্লাটুন এবং ইপিআর-এর ১টা কোম্পানি গোপন পথে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কমলছড়ি পাকিবাহিনীর অবস্থানের ভিতরে সাহসের সাথে ঢুকে পড়ে। এই অকস্মাৎ গোপন আক্রমণ পাকিসেনাদলকে হতভম্ব করে দেয়। তাদের কিছু বুঝাবার বা বাধা দেবার আগেই লে. হারুনের দল পাকি-বাহিনীর অন্তত ছয়টা বাংকার গ্রেনেডের সাহায্যে ধ্বংস করে দেয়। এর পর সমস্ত রাত ধরে পাকি বাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা অকস্মাৎ আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হতচকিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। সে জন্য আক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে যখন লে. হারুনের ছোট ছোট দলগুলো চা বাগানের সরু এবং গোপন রাস্তায় অগ্রসর হয়ে একটার পর একটা বাংকার ধ্বংস করে যাচ্ছিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে পাকি-বাহিনীর সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে এবং এতে তাদের বেশ লোক গুলিতে নিহত হয়। সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কমলছড়ি চা বাগানটি সম্পূর্ণ লে. হারুনের দখলে এসে যায়। এ যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানিদের ৫০ জন নিহত হয় এবং আমাদের হাতে ৪টি মেশিনগান ও ৬টি হালকা মেশিনগান, বেশ কিছু রাইফেল এবং অজস্র গোলাগুলি ও প্রচুর রসদ এবং কাপড়চোপড় হস্তগত হয়।

একটা কথা উল্লেখ করতেই হয় যে, যখন আমি যুদ্ধ চালাচ্ছিলাম এবং যুদ্ধ ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছিল, তখন আমার সেনাদলে আহত এবং নিহতের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। সে সময়ে আমার সৈনিক এবং গণবাহিনীর জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না। শুধু আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার ক্যাপ্টেন আখতার ছিলেন। অফিসারের স্বল্পতায় তাঁকেও আমি একটা কোম্পানি কমান্ডার বানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করেছিলাম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন আখতার ডাক্তার হয়েও একজন যোদ্ধা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার আহতের সংখ্যা যখন বেশ বেড়ে যায় এবং অনেক সময় দ্রুত চিকিৎসার অভাবে অনেক সৈনিক বা গণবাহিনীর ছেলেরা রক্তক্ষয় হয়ে মারা যেতে থাকে, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, অবিলম্বে আমার সেক্টরেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠাই এবং অতি সত্বর আমার হেডকোয়ার্টারের কাছে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করার নির্দেশ দেই। ঢাকা থেকে যেসব ছেলেমেয়ে আমার সেক্টরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে জনা কয়েক মেডিক্যাল ছাত্র ছিল। তারাও আমাকে ১টি হাসপাতাল গড়ার

অন্য অনুরোধ জানায়। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন আখতার আমার হেডকোয়ার্টারের নিকট মতিনগরে কয়েকটি তাঁবুতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম বাংলাদেশ হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। একটা সুন্দর বাগানের ভিতর উঁচু এবং শান্ত পরিবেশে এই হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল। প্রথমে হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে ঔষধপত্র বা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম কিছুই ছিল না।

কিন্তু তবুও আমাদের এই নবীন দলটি ক্যাপ্টেন আখতারের নেতৃত্বে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে তুলতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু এবং লুলু, মেডিক্যাল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা, রেশমা, ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, সবিতা, শামসুদ্দিন প্রমুখ। এসব ছেলেমেয়ের দল দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের এবং গণবাহিনীর ছেলেদের সেবাশুশ্রুষা ও চিকিৎসা করে যাচ্ছিল। এঁরা রেডক্রস ও বন্ধুরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কষ্টে ঔষধপত্র জোগাড় করত। মাঝে মাঝে আমি যতটুকু টাকা-পয়সা সেক্টর ফান্ড থেকে দিতে পারতাম, তা দিয়ে ঔষধপত্র জোগাড় করত। জুন মাসে লন্ডন থেকে ডা. মবিন (প্রবাসী বাঙালি) আমাদের এই হাসপাতালের কথা শুনে এখানে এসে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর ডা. মবিনের আর এক বন্ধু ডা. জাফরুল্লাহ সংবাদ পেয়ে লন্ডন থেকে এসে হাজির হন। এরা দু'জনেই লন্ডনে এফ আর সি এস পড়ছিলেন। দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ শুনে এতে অংশ নেয়ার জন্য আগ্রহী হন। তাদের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলাপ হয় এবং আমরা এ হাসপাতালটি গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা নেই। ডা. মবিন ও ডা. জাফরুল্লাহ আমাকে আশ্বাস দেন, লন্ডনে অবস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা তাদের মাতৃভূমির জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে। আমরা যদি বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আহবান জানাই তবে এ হাসপাতালে সরঞ্জামের ব্যবস্থা তারা করতে পারবে। এ ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডা. মবিন ও ডা. জাফরুল্লাহকে বিস্তারিত সরঞ্জামের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেই। আর সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন আখতারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর একটু দূরে বিশ্রামগঞ্জে সুন্দর জায়গায় পাহাড়ের উপর অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা নিতে নির্দেশ দেই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম, এ, জি ওসমানী [বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল] সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাঁকে আমি আমার সেনাদল ও ছেলেদের চিকিৎসার শোচনীয় অবস্থার কথা জানাই। তিনি আমাকে আমার হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুরি দেন।

এক মাসের মধ্যে বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে আমরা বিশ্রামগঞ্জে ২০০ বেডের হাসপাতাল তৈরি করে ফেলি। ডা. জাফরুল্লাহ লন্ডনে চলে যান হাসপাতালের

জন্য ঔষধপত্র ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। আমাদের হাসপাতাল যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন আহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ডাক্তারেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। এছাড়াও ঔষধের অভাব ছিল আমাদের প্রকট। কিন্তু তবুও এসব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের ছোট হাসপাতালটি আস্তে আস্তে বেশ পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছিল। যদিও এগুলো বাঁশ এবং ছনের ঘর ছিল, তবুও উৎসর্গিত ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় সমস্ত এলাকাটা শান্তিদায়ক হয়ে উঠেছিল। সকালে উঠেই সমস্ত হাসপাতালের বিভিন্ন কাঁচা ওয়ার্ডগুলো তারা নিজ হাতে লেপতো এবং পরিষ্কার করত। হাসপাতালের রোগীদের কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে তাদের রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষা সব কিছুই এরাই করত। এদের সঙ্গে আরো ২০ জনের মতো ছেলেমেয়ে এসে যোগ দেয়। কিছুদিন পর ডা. জাফরুল্লাহ ও ডা. মবিনের প্রচেষ্টায় এবং লন্ডন প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারদের সহায়তায় আমরা এ হাসপাতালটির জন্য আস্ত্রোপচারের সরঞ্জামাদিসহ ঔষধপত্র প্রভৃতি পেয়ে যাই। ৯ মাসের যুদ্ধে এ হাসপাতালটির কয়েক হাজার আহতকে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়।

এ হাসপাতালটির আরও একটি অবদান ছিল। এটি স্থাপনের পর আমার সেনাবাহিনীর ছেলেদের ও গণবাহিনীর মনোবল আরো বেড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয় তবে চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে না। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধান সেনাপতি কর্ণেল ওসমানী হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এটাকে আরো উন্নত করার জন্য উৎসাহ দেন। সেপ্টেম্বর মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আঘাতের পর আঘাত হেনে পাকিবাহিনীকে বিপর্যস্থ করাই ছিল আমাদের রণনীতি

আবার লড়াই-এর কথা। ২৯শে মে বিকাল ৪টায় ৪র্থ বেঙ্গল-এর পাইওনিয়ার পার্টিকে লাকসাম-চাঁদপুর রেলওয়ে লাইনে মাইন পুঁতে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার জন্য পাঠানো হয়। এ দলটি মাইন পুঁতে লাকসাম এবং নোয়াখালীর মাঝে তিনটি রেলওয়ে বগী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। ফেরার পথে পাইওনিয়ার পার্টির ছোট দলটি চৌদ্দগ্রাম- চট্টগ্রাম সড়কের উপর একটি সদ্য মেরামত করা ব্রিজের উপর মাইন পুঁতে দেয়। রাত ৮টায় একটি জিপ ৫ জন পাকিসেনাসহ যখন ব্রিজের উপর পৌঁছে, তখন মাইন বিস্ফোরিত হওয়াতে ব্রিজটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১ জন অফিসারসহ তিনজন পাকিসেনা ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং অন্য ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। একই দিন সন্ধ্যায় ৩ জন গেরিলাকে

হ্যান্ড গ্রেনেডসহ চৌদ্দগ্রাম থানায় পাঠানো হয়। থানার কাছে দিঘির পাড়ে শত্রুদের একটি বাংকার ছিল। গেরিলা দলটি গ্রেনেড ছুঁড়ে বাংকারটি ধ্বংস করে দেয়। ফলে ৩ জন শত্রুসেনা নিহত এবং কিছু স্থানীয় লোকও ... ?

২৯শে মে রাতে আমাদের একটি পেট্রোল পার্টি কুমিল্লার বাটপাড়ায় অ্যামবুশ পেতে বসে থাকে। শত্রুদের ২টা গাড়ি রাত ২টার সময় অ্যামবুশ-এর ফাঁদে পড়ে। অ্যামবুশ পার্টি সাফল্যের ২টা গাড়ি ধ্বংস করে দেয় এবং সেই সঙ্গে ৪ জনকে হত্যা করে। শত্রুদের পিছনের একটি গাড়ি ফাঁদে পড়ার আগেই পালিয়ে যায়। ২৯শে মে রাত ৯টায় ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে ২টি সেকশন কসবার পশ্চিমে টি, আলীর বাড়িতে শত্রুদের অবস্থানে অকস্মাৎ অনুপ্রবেশ করে এবং আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে শত্রুদের ১টি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনজন নিহত ও ২ জন শত্রুসেনা আহত হয়। এরপর আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ শেষ করে নিজ অবস্থানে ফিরে আসে।

৩০শে মে চৌদ্দগ্রামের আধ মাইল উত্তরে চৌদ্দগ্রাম-মিয়াবাজার রোডের উপর ৪র্থ বেঙ্গল-এর 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন পাহারা দেয়ার সময় হঠাৎ শত্রুদের ২৭ জনের একটি দলকে দূরে থেকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি অ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এ অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত গেলেও তারা ত্বরিতগতিতে রাস্তার পশ্চিম পাশে সরে পড়ে। অ্যামবুশের ফলে শুধু তিনজন শত্রুসেনা নিহত হয়। একই দিনে আমাদের গেরিলারা লাকসাম বাংগোড়া কাঁচা রাস্তার উপর 'ফেলনা' গ্রামের কাছে মাইন পুঁতে রাখে। শত্রুদের একটি ৩ টনের গাড়ি এ মাইনের বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ২৯শে মে ৪র্থ বেঙ্গল-এর 'ব্রাভো' কোম্পানির একটি প্লাটুন ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার উপর মর্টারের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ফলে মর্টারের গোলার আঘাতে এবং হালকা মেশিনগানের আক্রমণে শত্রুদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

৩০শে মে সন্ধ্যা ৭টায় আমাদের ১টি ছোট গেরিলা দল ইকবালের (বাচ্চু) নেতৃত্বে বিবিরবাজারে শত্রুসেনাদের অবস্থানে আঘাত হানার জন্য পাঠানো হয়। পাকিসেনারা তখন তাদের অবস্থানের উপর বসে সান্ধ্যভোজনে ব্যস্ত ছিল। এ সময়টি সম্বন্ধে খবর আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল। পাকিসেনারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল, সে সময় আমাদের গেরিলা দলটি তাদের উপর হঠাৎ গোমতী বাঁধের উপর থেকে গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ১০ জন হতাহত হয়। এদিনে সাড়ে ৬ টার সময় আমাদের মর্টার প্লাটুন সিঙ্গারবিল শত্রু অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণ করে। এর ফলে শত্রুদের ৬ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। ২৯শে মে চৌদ্দগ্রাম বাবুর্চি রোডে হরিসর্দার বাজারের কাছে রাস্তার ব্রিজ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়।

৩১শে মে রাত তিনটায় লে. মাহবুবের নেতৃত্বে একটি প্লাটুন কুমিল্লার দক্ষিণে জগমোহনপুর নামক স্থানে শত্রুঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায় এবং

শত্রুসেনাদের ১২ জনকে হতাহত করে। এদিকে পাকিসেনারা যখন কসবার দিকে তাদের চাপ বাড়াতে থাকে, তখন আমি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরকে একটি কোম্পানিসহ কসবার উত্তরে লাটুমুড়ায় অবস্থান নেয়ার নির্দেশ প্রদান করি। '

জুন মাসের ৪ তারিখে রাত দুটোর সময় ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির ২টি প্লাটুন মর্টার নিয়ে শত্রুদের অবস্থানে গোপন পথে প্রবেশ করে শালদা নদীর দক্ষিণে বাগড়া বাজার নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ভোরবেলায় পাকিসেনারা যখন তাদের বাংকারের উপর অসতর্কভাবে ঘোরাফেরা করছিল, ঠিক সেসময় আমাদের সৈন্যরা তাদের উপর অতর্কিত মর্টার এবং মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের ১৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। আমাদের একজন সৈন্য বুকে গুলি লেগে গুরুতরভাবে আহত হয়। এ আক্রমণের তিন ঘণ্টা পরে শত্রুরা যখন ভেবেছিল আমাদের সৈন্যরা অবস্থান পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের আহতদের পিছনে নিয়ে যাবার যখন ব্যবস্থা করছিল, ঠিক সেই সময় আমাদের সৈন্যরা আবার দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুদের আরও ৫জন নিহত হয়। এরপর আমাদের পার্টি অবস্থান ত্যাগ করে চলে আছে। ঐ দিনই সকাল সাতটার সময় আমাদের আর একটি পার্টি শত্রুদের রাজাপুর অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শত্রুকে নিহত করে এবং তিনজনকে আহত করে। আমাদের আরেকটি দল রাত ১টার সময় কুমিল্লার দক্ষিণে সুয়াগাজীতে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের একটা সেতু উড়িয়ে দেয় এবং বাগমারার রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করে।

৬ই জুন একটি ডেমোলিশন পার্টিকে লাকসামের দক্ষিণে পাঠানো হয়। এই দলটি 'খিলাতে' লাকসাম- নোয়াখালী মহাসড়কের উপর ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখে। সকাল ৫টায় কুমিল্লা থেকে শত্রুর ২টি জিপ ও একটি ট্রাক নোয়াখালী যাবার পথে মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ৪জন পাকি অফিসার এবং ৭জন সৈন্য নিহত হয়। এসময় পাকিসেনাদের ২টি কোম্পানি কুমিল্লা থেকে শালদানদীর উত্তরে আসে এবং রেলওয়ে লাইন বরাবর নয়নপুর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। ভোর ৬টায় ৪র্থ বেঙ্গল-এর 'এ' কোম্পানি শত্রুদের এ অগ্রগতিকে বাধা দেয় শালদা নদীর পূর্বদিকে থেকে। শত্রুরা বাধা পাবার ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের গুলির মুখে পাকিসেনাদের ২৫ জন লোক হতাহত হয়। অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে পাকিসেনাদের আর একটি দল কুমিল্লা থেকে ট্রেনে নয়নপুর এবং শালদা নদীর দিকে আসছিল। এ ট্রেনটি নয়নপুর ও শিবপুরের দক্ষিণে আমাদের অবস্থানরত সৈন্যদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের গোলাগুলির সামনে শত্রুরা টিকতে না পেরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পর রাজাপুরে পশ্চাদপসরণ করে। অবশ্য এর ঘণ্টা পাঁচেক পরে শত্রুরা কামানের গোলার সহায়তায় আবার নয়নপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। কিন্তু নয়নপুর স্টেশনে যখন তারা বাংকার তৈরিতে ব্যস্ত, সে

সময় আমাদের মর্টার তাদের উপর ভীষণ গোলাগুলি চালায় এবং শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শত্রুরা কিছুটা পিছু হটে নয়নপুর গ্রামের ভিতর অবস্থান নিয়ে তাদের বাংকার তৈরি করতে শুরু করে।

৬ই জুন এই এলাকায় পাকিসেনাদের সঙ্গে আরও কয়েক দফা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এই দিন শত্রুদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে অগ্রসর হলে, আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানির একটি প্লাটুন অতর্কিত অ্যামবুশ করে। পাকি সেনারা এ অ্যামবুশ-এর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের অন্ততপক্ষে ২০ জন লোক হতাহত হয়। শত্রুদের দলটি আমাদের অ্যামবুশ পার্টির তাড়া খেয়ে আড়াইবাড়ির দিকে পালিয়ে যায়। আমাদের একটি দল কুমিল্লার দক্ষিণে ধানপুর বিওপির কাছে পাকিসেনাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে থাকে। সকাল ৯টায় পাকিসেনারা দালালদের মারফতে এ খবর পায়। কুমিল্লা থেকে পাকিসেনাদের একজন অফিসারসহ একটি প্লাটুন গ্রামের ভিতর দিয়ে এসে আমাদের অ্যামবুশ পার্টিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। অ্যামবুশ পার্ট তৎক্ষণাৎ কিছুটা পিছু হটে গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ-যুদ্ধ ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়। ইতোমধ্যে আমাদের ধানপুরের কোম্পানি খবর পায়। লে. মাহবুব ও লে. কবিরের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ অ্যামবুশ পার্টিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে আসে এবং তাঁরা পাকিসেনাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে। পাকিসেনারা দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের ভিতর লুকিয়ে পড়ে এবং দালালদের সাহায্যে এই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কিন্তু পিছনে পড়ে ৫ জন পাকিসেনার লাশ।

এদিন বিকেল তিনটায় পচুয়াতে আমাদের আর একটি অ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে শত্রুদের ১০ সৈন্য হতাহত হয়। ৪ ও ৫ই জুন রাতে লাকসাম-চাঁদপুর রেল লাইনের মাঝে মধু রোডস্ স্টেশনের নিকটে কাছে রেলওয়ে সেতুটি সুবেদার পাটোয়ারীর একটি দল উড়িয়ে দেয়। রাতে আমাদের আর একটি দল চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের মহামায়া বাজারের কাছে একটি পুল ধ্বংস করে দেয়।

এর দুইদিন পরে ৭ই জুন চাঁদপুরের বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফর্মারটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। এর ফলে সমস্ত চাঁদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল হয়ে পড়ে। কলকারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পরে শত্রুরা এসে পাশের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটতরাজ ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে।

আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানির একটি প্লাটুন ১১ই জুন সকাল ৬টায় কসবার উত্তরে চার্নল নামক জায়গায় অ্যামবুশ পেতে রাখে। শত্রুদের একটি কোম্পানি দুপুর ১২ টার সময়ে আমাদের অ্যামবুশ-এর মধ্যে পড়ে। আমাদের গুলিতে পাকিস্তানিদের ১২ জন সৈন্য নিহত হয়। এতে আমাদের একজন আহত হয় এবং পরে মারা যায়। পাকিসেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ইয়াকুবপুরের দিকে পলায়ন করে। কিন্তু আমাদের আর একটি অ্যামবুশ পার্টি ইয়াকুবপুরের কাছে সুবিধাজনক স্থানে তাড়াতাড়ি অ্যামবুশ পাতে। শত্রুরা এ অ্যামবুশ-এর ফাঁদেও পড়ে যায় এবং

সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই অ্যামবুশে শত্রুদের আট জন লোক নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়। এ দুটি অ্যামবুশ-এর ফলে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয়। উপরন্তু শত্রুরা এ এলাকা থেকে চলে যায়।

এই সময়ে শালদানদীর দক্ষিণে রেলওয়ে ব্রিজ, কুটির রাস্তায় 'বাসারা' গ্রামের সেতু এবং মন্দভাগ গ্রামের সেতু সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়। আঘাতের পর আঘাত হেনে শত্রুকে বিপর্যস্ত করাই ছিল আমাদের রণনীতি। তাই আমরা কোনো সময়েই পাকিস্তানি সৈন্যদের নিশ্চিন্ত হতে দেইনি।

এমনি এক সময়ে আমাদের হেডকোয়ার্টারে এ খবর আসে যে, পাকিসেনারা তলুয়াপাড়া ফেরিঘাট তাদের যাতায়াতের জন্য সাধারণ ব্যবহার করছে। এ সংবাদ পেয়ে আমাদের একটি প্লাটুনকে ৯ই জুন রাত্রে তলুয়াপাড়াতে পাঠানো হয়। এ প্লাটুনটি তলুয়াপাড়া ফেরিঘাটের কাছে শত্রুদের জন্য অ্যামবুশ পাতে। ১০ই জুন রাত ১১টার সময় শত্রুদের একটি দল সেই ফেরিঘাটে আসে এবং নৌকাযোগে পার হতে থাকে। শত্রুরা যখন নদীর মাঝপথে, অ্যামবুশ দলটি সে সময় তাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। এর ফলে নৌকাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিসেনাদের ২০ জন হতাহত হয়।

আমাদের আর একটি প্লাটুন লে. মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ই জুন রাত্রে মিয়ার বাজারের দক্ষিণে রাজারমার দিঘি ও জগমোহনপুর কাচারীর শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। পাকিসেনারা এই সাহসী আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে হতবাক হয়। আমাদের সৈন্যরা পাকিসেনাদের বাংকারে গ্রেনেড ছুঁড়ে ৮ জন পাকিসেনাকে নিহত ও ৫ জনকে আহত করে। পাকিসেনারা বাধ্য হয়ে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে। এরপর আমাদের সৈন্যরা অবস্থানটি দখল করে অবশিষ্ট বাংকারগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে।

এবার খোদ কুমিল্লায় আক্রমণ। আমাদের ৩টি গেরিলা দল কুমিল্লা ও লাকসামে পাঠানো হলো। ১১ই জুন কুমিল্লাতে গেরিলা দলটি শত্রুদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর দশটি গ্রেনেড ছোঁড়ে। এতে পাকিসেনাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সমস্ত কুমিল্লা শহর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একই দিন চারজন গেরিলার ডেমোলিশন পার্টি জাঙ্গালিয়ার কাছে রেল লাইনে মাইন পুঁতে একটি ডিজেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত করে।

লাকসামে যে গেরিলা দলটি পাঠানো হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল আবদুল মান্নান। এঁরা প্রথমে পাকিসেনাদের একটি গাড়ির উপর গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং এতে ৫জন নিহত হয়। এ দলটি লালমাই-এর কাছে পাকিসেনারা যে ঘরে থাকত, তার ভিতর ২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে পাকিসেনাদের যথেষ্ট সংখ্যক হতাহত হয়। এ ধরনের গেরিলা হামলার মোকাবেলায় পাকিস্তানি সৈন্যরা লাকসামে ৭২ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন জারি করে এবং অনেক নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার চালায়। এদিকে আমাদের দুটি অ্যামবুশ পার্টি ফুলতলি এবং মিয়ার বাজারের

কাছে অ্যামবুশ পেতে রাখে। পাকিসেনাদের দুটি গাড়ি রাত সাড়ে চারটার সময় ফুলতলিতে অ্যামবুশ এর মধ্যে পড়ে যায়। অ্যামবুশ পার্টি একটি গাড়িকে ধ্বংস করে দেয় এবং অন্য একটি গাড়ির ক্ষতি সাধন করে। শেষের গাড়িটির ভিতর অ্যামবুশ পার্টি দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে শত্রুদের ৬ জন লোক নিহত হয়। মিয়ার বাজারের অ্যামবুশেও পাকিসেনাদের ৫জন লোক নিহত হয় এবং আমাদের অ্যামবুশ পাটি একটি মর্টার দখল করে নেয়।

খোদ ঢাকায় গেরিলা হামলা : জিন্নাহ্ অ্যাভেন্যু পল্টন ইন্টারকন হোটেলে দুঃসাহসিক অভিযান

সীমান্ত থেকে শুরু করে কুমিল্লা শহর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় একটার পর একটা সাফল্যজনক গেরিলা হামলায় আমাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আমার মনে তখন একটাই চিন্তা, তা হচ্ছে খোদ রাজধানী ঢাকায় গেরিলা অ্যাকশন করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

এমনি এক সময়ে আমাদের কাছে সংবাদ এল, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম জুন মাসে ঢাকাতে আসছে বাংলাদেশের বর্তমানে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরেজমিনে অবগত হওয়ার জন্য। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের প্রচার যন্ত্রগুলো সমস্ত আন্তর্জাতিক মহলকে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বাংলাদেশের বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এ খবর পাওয়া মাত্র আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমের 'অভ্যর্থনার' ব্যবস্থা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যদি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেই আর্থিক সাহায্যে পাকিস্তানের সমরাস্ত্র কেনার ও যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। তাই যে ভাবেই হোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিমকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই পাকিবাহিনীর আয়ত্তাধীনে নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি গেরিলার একটি দলকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো এবং পাকিস্তানিদের হালাক করার জন্য পাঠিয়ে দেই। এই দলটি ৪ঠা জুন গোপন পথে ঢাকা রওয়ানা হয়ে পরদিন সকালে পৌঁছে যায়। এই দলেরই ২ জন ছেলে ৮ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় জিন্নাহ অ্যাভেনুর কলেজ সু স্টোরের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। আর একটি গ্রেনেড ছোঁড়ে পুরানা পল্টনে সন্ধে আটটায়। এদিন আর একটি ছোট দল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর একজন পাকিস্তানি অফিসারের বাড়ির ভিতরে দুপুর দুটোর সময় গ্রেনেড ছোঁড়ে। এতে অফিসারের গাড়ির ক্ষতি সাধিত হয় এবং একজন আহত হয়।

পরের দিন সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ (বর্তমান দৈনিক বাংলা) অফিসের ভিতর গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। এতে কয়েকজন পাকিস্তানি দালাল নিহত হয়। ইতোমধ্যে

দলটি খবরাখবর নেয় যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। এ খবর পাবার পর ২ জন গেরিলা ৯ই জুন সন্ধ্যা ৮-১৫ মিনিটে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রবেশ করে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম এর হোটেলে ফেরার প্রতীক্ষায় থাকে। টিমের সদস্যরা যখন গাড়ি নিচে রেখে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করেন, সে সময় গেরিলা দলটি গাড়ি লক্ষ্য করে ৩টি গ্রেনেড ছোঁড়ে। এর ফলে গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং পাহারারত একজন পাঞ্জাবি সেনাও নিহত হয়।

এই ঘটনায় বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অতি সহজেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিস্ফোরণের তাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) অবস্থা স্বাভাবিক নয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টিম দেশে ফিরে গিয়ে তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ঘটনাবলী তুলে ধরেন। বিশ্ব ব্যাংক টিম তাঁদের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য না দেয়ার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এক বিরাট পরাজয়।

আবার দুই নম্বর সেক্টরের লড়াই-এর ময়দানের আরও কিছু রক্তাক্ত ইতিহাস। রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট পাঁচড়া গ্রামে শত্রুদের একটি অবস্থান ছিল। এই অবস্থানটি শত্রুদের নয়ানপুর এবং রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিছন থেকে সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। মতিনগর থেকে আমাদের একটি রেইডিং পার্টিকে পাঁচড়া গ্রামে শত্রু অবস্থানের উপর অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হলো। ১৩ই জুন রাত ন'টার সময় এ দলটি গ্রামের গোপন পথে শত্রু অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের দলটি বেশ কিছু পাকিসেনাকে হতাহত করে শত্রু অবস্থান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু এর পরেও পাকিস্তানিরা রাতের অন্ধকারে প্রায় ২ ঘন্টা পর্যন্ত গুলি চালনা অব্যাহত রাখে। পাকিসেনাদের অয়ারলেস ম্যাসেজ আমাদের অয়ারলেসে ধরা পড়ে। এতে শোনা যায় পাকিসেনারা তাদের উর্ধ্বতন হেডকোয়ার্টারকে জানাচ্ছে, "মুক্তিবাহিনী আমাদের উপর ভয়ংকর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের নির্দেশ দিন আমরা এখন কী করব।" এছাড়াও শত্রু অবস্থান থেকে বার বার স্লোগান শোনা যায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজীজ ভাট্টি জিন্দাবাদ, ১৭তম পাঞ্জাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ তখনও চলতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের দলটি সরে আসার পরও পাকিবাহিনী নিজেদের মধ্যে কয়েক ঘন্টা গোলাগুলি করে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এ সংঘর্ষে পাকিসেনাদের ১১ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। বেশকিছু সংখ্যক সৈন্য তাদের নিজেদের গুলিতেই হতাহত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানিরা সীমান্তের নিকটবর্তী থানাগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ এবং মিলিশিয়া নিয়োগ করতে শুরু করে। এ সব থানাগুলোতে তারা বাঙ্কার তৈরি করে অবস্থানকে শক্তিশালী করতে থাকে। কুমিল্লার উত্তরে সবগুলো থানাকেই তারা এভাবে শক্তিশালী করে। আমি এসব থানাগুলোকে আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের শাসনযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার একটা পরিকল্পনা করি।

আমার অবস্থানের নিকটবর্তী বুড়িচং থানা আমার জন্যে একটা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা বুড়িচংএর ভিতর দিয়েই আমার গেরিলারা গোপন পথে ঢাকা, কুমিল্লা এবং ফরিদপুরে যাতায়াত করত। এই থানাটির অবস্থানের গোপন পথগুলো মোটেই নিরাপদ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশরা পাকিসেনাদের খবরাখবর পাঠাত। আমি বুড়িচং থানা আক্রমণ করার জন্য ১৬ জনের একটি দলকে পাঠাই। ১৪ই জুন রাত একটায় এ দলটি অতর্কিত বুড়িচং থানার উপর আক্রমণ চালায়। থানায় প্রহরারত ইপকাফ এবং পুলিশ যথেষ্ট বাধা দেয়। কিন্তু শেষ অবধি আমাদের রেইডিং পার্টির হাতে পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে শত্রুদের ৮ জন নিহত হয়। আমাদের এক জন গুরুতরভাবে আহত এবং একজন নিখোঁজ হয়। এর ফলে বুড়িচং থানা শত্রুমুক্ত হয় এবং ঢাকা, কুমিল্লা যাবার গোপন পথ নিরাপদ হয়।

অন্যদিকে ঢাকাতে ৪ঠা জুন যে দলটিকে পাঠানো হয়েছিল, সেই দলটি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে যাতে স্বাভাবিক পরিবেশ পাকিস্তানিরা ফিরিয়ে আনতে না পারে। ঢাকার প্রশাসন ব্যবস্থা যাতে পাকিস্তানিদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসে তার জন্য এই গেরিলা দল তৎপর ছিল। দলটি ১০ই জুন দুপুর ২টার সময় নিউমার্কেটের প্রধান চত্বরে তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে সমস্ত লোকজন নিউ মার্কেট থেকে পালিয়ে যায় এবং দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এর পরদিন বিকেল ৪টায় যখন অফিস শেষ হচ্ছিল, ঠিক সে সময় ওয়াপদা বিল্ডিং-এর সামনে ২টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে ওয়াপদা ভবনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

আক্রমণ এবং পাল্টা-আক্রমণের পাশাপাশি জুন মাসেই পাকিসেনারা কুমিল্লা শহরে শাসনকার্য পুনরায় স্বাভাবিক করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেয়। সরকারি অফিস ভালোভাবে চলার জন্য তারা সরকারি কর্মচারীদের বাধ্য করে। উপরন্তু শহরের দোকান ও যানবাহন চালু করার বন্দোবস্ত করা হয়। পাকিস্তানিদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য চার জন গেরিলার একটি দলকে ৬ই জুন কুমিল্লার উত্তরে। গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহরে পাঠানো হয়। এ দলটি গ্রেনেড ও স্টেনগান সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনদিন পর্যন্ত শহরের ভিতর একটি গুপ্ত অবস্থানে দলটি নিজেদের ঘাঁটি গড়ে। কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাকিসেনাদের টহলদার দলগুলো সম্বন্ধে তারা বিস্তারিত খবরাখবর জোগাড় করে। ১০ই জুন সন্ধ্যায় এরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে স্থানীয় কমার্স ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,

জজকোর্ট প্রভৃতি স্থানে পর পর পাকিসেনাদের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর ফলে একজন পাকিসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়। ওই দিনই সাত জন রেঞ্জারের একটি দলকে তারা আক্রমণ করে। এতে দু'জন মিলিশিয়া নিহত হয় এবং তাদের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এদিকে নয়নপুর রেল স্টেশনের নিকট একটি গোডাউনের ভিতর শত্রুদের কিছুসংখ্যক সৈন্য তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এই সংবাদ ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি জানতে পারে। মেজর সালেক একটি প্লাটুনের সঙ্গে আর- আর রাইফেল ও মর্টার দিয়ে এই ঘাঁটি আক্রমণের জন্য পাঠায়। সন্ধে সাড়ে ৬টায় এ দলটি শত্রুদের অবস্থানে দক্ষিণ দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিতে ঐ গোডাউনটির উপর আক্রমণ চালায়। আর-আর এবং মর্টারের গোলা গোডাউনটির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে এবং কয়েকটি আর-আর -এর গোলা গোডাউনের ভিতরে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এদিন রাতেই হাবিলদার সালামের নেতৃত্বে নয়নপুরের রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আশাবাড়ি থেকে রাত দেড়টার সময় শত্রু অবস্থানের উপর আর-আর রাইফেল ও মর্টারের সাহায্যে আবার আক্রমণ চালানো হয়। শত্রুরা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ আশা করেনি। এ আক্রমণের ফলেও শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ সময়ে শত্রুদের অবস্থান যেখানে সেখানে ছিল, যে সব অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাকিসেনাদের চলাচলের রাস্তার উপর মাইন পুঁতে রাখা হয়েছিল। ১৪ই জুন ফকিরাহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৭০০/৮০০ গজ উত্তরে বখশিমাইল গ্রামে শত্রুর একটি দল দুপুরে পেট্রোলিং-এর জন্য এসে হাজির। আর একটি দল গাজীপুরের নিকট আমরা যে কাঠের পুল জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, সেটি মেরামত করছিল। বখশিমাইল গ্রাম থেকে সন্ধ্যার সময় পাকিসেনাদের দলটি ফকিরাহাটে নিজেদের অবস্থানে ফেরার পথে আমাদের পুঁতে রাখা মাইনের মধ্যে পড়ে যায় এবং মাইনগুলো তাদের পায়ের চাপে ফাটতে থাকে। এতে তাদের অনেক লোক হতাহত হয় এবং তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। মাইনগুলো ফাটার শব্দ নিকটবর্তী অবস্থান থেকে পাকিসেনারাও শুনতে পায়। রাতের অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারছিল না এ বিস্ফোরণের সঠিক কারণ কী? মুক্তিবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভেবে পাকিসেনারা প্রচণ্ডভাবে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে। এই গোলাগুলি রাত ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত চলতে থাকে। শত্রুরা নিজেদের লোকের উপর মর্টার এবং কামানের শত শত গোলা ছুঁড়তে থাকে। দূরে অবস্থিত আমাদের পেট্রোল পার্টি 'ইয়া আলী, ইয়া আলী, বাঁচাও বাঁচাও" প্রভৃতি ধ্বনি শুনতে পায়। পরে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকমুখে শুনতে পাই যে, আমাদের মাইনে এবং পাকিসেনাদের নিজেদের গোলাগুলিতে অন্ততপক্ষে ৪০/৫০ জন পাকিসেনা হতাহত হয়েছে। পরদিন সকালে কুমিল্লা থেকে পাকিসেনাদের একজন ব্রিগেডিয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসে।

পাকিসেনারা এই দুর্ঘটনার পর রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকে এবং ফকিরহাট পর্যন্ত তাদের পেট্রোলিং আরো জোরদার করে। মতিনগরে অবস্থিত আমাদের কোম্পানি শত্রুদের এই কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ১৬ই জুন সকালে আমাদের একটি প্লাটুন পাকিসেনাদের পেট্রোলিং পথের উপর অ্যামবুশ পাতে। সকাল ৯টায় পাকিসেনাদের একটি দল রাজাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়। এই দলটি আমাদের অ্যামবুশ-এর মধ্যে পড়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা অতর্কিতে পাকিসেনাদের উপর হালকা মেশিন গান ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে গোলাগুলি চালায়। এই আক্রমণে শত্রুদের ৮ জন নিহত ও একজন আহত হয়। এছাড়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, টেলিফোন সেট, ড্রাইসেল ব্যাটারি ও অন্যান্য জিনিস আমাদের হস্তগত হয়।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমার কাছে খবর এল, শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটারি (দল) কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিএন্ডবি রোড তাদের কামানের অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে। পাকিবাহিনীর নয়নপুর, শালদানদী, টি, আলীর বাড়ি [কসবায়] প্রভৃতি অবস্থানের জন্য এই কামানগুলো থেকে সাহায্যকারী গোলা নিক্ষেপ করছিল। এই কামানগুলোর জন্য পাকিবাহিনীর উপরোক্ত অবস্থানগুলোর উপর আমাদের আক্রমণ বেশ কয়েকবার কার্যকর হয়নি। এই কামানগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ১৫০ জন পাকিসেনা নিয়োজিত ছিল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি লে. হুমায়ুন কবিরকে এই সব কামানের অবস্থানটি আক্রমণ করে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিই। ৪০ জনের একটি দল [৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কম্পানি] লে. হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বে ১৬ই জুন রাত সাড়ে ১০টায় শত্রু অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সমস্ত রাত চলার পর দলটি ভোর বেলায় কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তার পশ্চিমে সাইদাবাদের চার মাইল উত্তরে পৌঁছে এবং নিজেদের একটি গোপন অবস্থান তৈরি করে। ১৭ই জুন সমস্ত দিন এবং রাত পাকিসেনাদের সাইদাবাদ অবস্থানটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করতে অতিবাহিত হয়। এই অবস্থানটি পাহারার কী কী ব্যবস্থা আছে, কারা পাহারাদার এবং কী কী অস্ত্রের সাহায্যে পাহারা দেয়, অবস্থানটিতে পৌঁছার জন্য গোপন পথ কী, কামানগুলো রাতে কোনস্থানে রাখে, কোনসময়ে পাকিসেনারা বেশি সজাগ এবং তাদের বাংকারগুলোর অবস্থান কোথায় প্রভৃতি খবরাখবর সংগ্রহ করতে হয়। এরপর লে. হুমায়ুন কবির সকাল হবার আগেই তাঁর গোপন ঘাঁটিতে ফেরত আসে। ১৮ই জুন সমস্ত দিন সে তাঁর দলের সদস্যদের পাকিসেনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করার পর পাকি ঘাঁটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং তা কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়। সমস্ত দিন দলটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

১৮ই জুন ভোর চারটায় লে. হুমায়ুনের নেতৃত্বে আমাদের সৈন্যরা পাকিসেনাদের কামান ঘাঁটির উপর পিছন দিক থেকে অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে

আক্রমণ চালায়। পাকিসেনারা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ছিল। তারা এ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেদিনই কুমিল্লা থেকে পাকিসেনাদের অন্য দু'টি কোম্পানি ফ্রন্ট-এ যাওয়ার পথে রাতে এখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমাদের দলের অতর্কিত আক্রমণে পাকিসেনাদের ঘাঁটিতে ভীষণ বিশৃংখলার সৃষ্টির হয় এবং অনেক শত্রুসেনা আমাদের গুলিতে প্রাণ হারাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরা কয়েকটি জিপ ও ৩ টনের ট্রাকে গ্রেনেড ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকিসেনারা এত বেশি ভীত হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের হেডকোয়ার্টারে জঙ্গি বিমানের সাহায্যের প্রার্থনা জানায়। যুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ভয়ংকরভাবে চলে এবং আমাদের সৈন্যরা কামান, গাড়ি ইত্যাদি অনেক সরঞ্জাম ধ্বংস করে। কিন্তু ইতোমধ্যে সকাল হয়ে যায় এবং শত্রুদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে থাকে। উপরন্তু তাদের আবেদনে তিনটি জঙ্গি বিমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমাদের রেইডিং পার্টির উপর আক্রমণ চালায়। লে. হুমায়ুনের দলটি তখন আটকা পড়ে যাবার ভয়ে আক্রমণ শেষ করে গ্রামের গোপন পথে মেঘনার দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই পশ্চাদপসরণের সময় আমাদের বাহিনী বার বার পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবুও সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তারা সাফল্যের সাথে শত্রুর আঁওতার বাইরে চলে আসে। একদিন পর তারা অন্য পথে আবার কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রধান সড়কের উপর আসে। এবং মতুরা সড়কের সেতুটি উড়িয়ে দিয়ে নিজ ঘাঁটিতে নিরাপদে ফিরে আসে।

এ আক্রমণের ফলে যদিও লে. হুমায়ুনের দলটি পাকিসেনাদের কামান দখল করে আনতে পারেনি কিন্তু তবুও এ আক্রমণের ফলাফল পাকিসেনাদের জন্য ছিল ভয়াবহ। অন্ততপক্ষে ৫০/৬০ জন পাকিসেনা এই আক্রমণে হতাহত হয়। মৃতদেহগুলো পাকিসেনারা ২টি বেসামরিক বাসে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে কুমিল্লার দিকে নিয়ে যায়। এ খবর স্থানীয় লোকেরা জানায়। তাছাড়া, গাড়ি, যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং এই অবস্থানে রাখা কামানের গোলা যেগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল তাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। আসার পথে আমাদের দলটি যে সেতু উড়িয়ে দিয়ে আসে, এতেও তাদের গতিবিধির যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়। এ হামলার পর শত্রুসেনারা ২/৩ সপ্তাহ সমস্ত সেক্টরে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। পাকিসেনারা এরপর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচ্যার চালায় এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৬ই জুন আমাদের কসবা অবস্থান থেকে একটি ছোট দল বগাবাড়ি নামক জায়গায় অ্যামবুশ তৈরি করে। সকাল ৬টায় পাকিসেনাদের একটি পেট্রোল পার্টি কসবার দিকে টহল দেয়ার সময় অসতর্কভাবে হঠাৎ আমাদের অ্যামবুশ পার্টির বাঙ্কারের কাছে চলে আসে। আমাদের অ্যামবুশ দলটি এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের অতর্কিত আক্রমণে প্রায় ১০ জন পাকিসেনা নিহত ও ৫ জন আহত হয়। শুধু ২ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

একদিনে 'কৈখোলা' দু'বার হাত বদল : কুমিল্লা বিমানবন্দরে আচমকা গেরিলা অপারেশন

১৮ই জুন পাকিসেনারা আমাদের অবস্থান 'কৈখোলার' উপর গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমাদের প্লাটুনটি 'কৈখোলা' ত্যাগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিসেনাদের একটি দল কৈখোলা দখল করে নেয়। কিন্তু মাত্র ঘণ্টা কয়েক পরে সেই রাতেই মেজর সালেক চৌধুরীর নেতৃত্বে আমাদের 'এ' কোম্পানি কৈখোলায় অবস্থানরত শত্রুদের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। হাবিলদার সালামের প্লাটুন শিবপুরের দিক থেকে এবং সুবেদার আবদুল হক ভুঁয়ার প্লাটুন দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুসেনাদের অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে। হাবিলদার সালামের প্লাটুনের আক্রমণে পাকিসেনাদের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অবস্থানটি পরিত্যাগ করে পিছনে হটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাকিসেনাদের ভিতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং শত্রুরা সমগ্র কৈখোলা এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে পাকিসেনারা অবস্থানটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। এ যুদ্ধের ফলে পাকিসেনাদের একজন জেসিওসহ ৩১ জন সিপাই হতাহত হয় এবং অবস্থানটি থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম দখল করা হয়।

১৯শে জুন লে. হুমায়ুন কবিরের হেডকোয়ার্টারে খবর আসে যে, পাকিসেনাদের একটি প্লাটুন আগরতলার ভিতর পেট্রলিং করা অবস্থায় যেতে দেখা গেছে। লে. হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ একটি প্লাটুন নিয়ে মন্দভাগের কাছে দ্রুত অ্যামবুশ সৃষ্টি করে। সন্ধ্যা ৭টায় পাকিসেনারা ফেরার পথে তাদের দলটির শেষ অংশকে লে. হুমায়ুন অ্যামবুশ করে। অ্যামবুশে পাকিসেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয় এবং বাকী পাকিসেনারা মন্দভাগ গ্রামের দিকে পালিয়ে জীবন বাঁচায়।

অন্যদিকে জুন মাসের মাঝামাঝি লে. মাহবুব ৪র্থ বেঙ্গলের 'বি' কোম্পানি থেকে একটি প্লাটুনকে পাকিসেনাদের যাতায়াতের রাস্তা ধ্বংস করার জন্য কুমিল্লার দক্ষিণে পাঠান। এ দলটি ১৮ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় কুমিল্লা-লাকসামের বিজয়পুর রেলওয়ে ব্রিজ এবং কুমিল্লা-বাগমারা রোডের সেতু উড়িয়ে দেয়। এই সেতুগুলোর ধ্বংসের ফলে কুমিল্লার দক্ষিণে সড়ক এবং রেলওয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

ওই দিন দলটি বিজয়পুর এবং মিয়াবাজারের নিকট কয়েকটি ইলেকট্রিক পাইলন উড়িয়ে কাপ্তাই থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখার জন্য পাকিসেনাদের একটি প্লাটুন সন্ধ্যার সময় 'চৌরা'র কাছে পেট্রোলিং-এ আসে। এই দলটিকে অ্যামবুশ করলে ২ জন পাকিসেনা নিহত হয়। পাকিসেনারা পরে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয় এবং অত্যাচার চালায়। এসময় আমাদের পেট্রোল পার্টি খবর আনে যে, পাকিস্তানিদের

প্রায় এক কোম্পানি সৈন্য মিয়াবাজারের উত্তরে একটি গোডাউনের মধ্যে অবস্থান করছে। পেট্রোলটি এই গোডাউনটিতে পৌঁছাবার গোপন রাস্তা, পাকিসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিস্তারিত খবরও নিয়ে আসে। এ সংবাদ পেয়ে লে. মাহবুব ৩৩ জনের একটি কমান্ডো প্লাটুন ব্লাকসাইড ও মর্টারসহ রাত ৯টায় গুদামটি আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই কমান্ডো দলটি রাত ১২টার সময় শত্রু অবস্থানের নিকটে পৌঁছে যায়। তারা একটি ছোট দল পাঠিয়ে অবস্থানটির সর্বশেষ খবর নেয় এবং জানতে পারে পাকিসেনারা অবস্থানটিতে বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। রাত একটায় আমাদের কমান্ডো প্লাটুনটি অতর্কিতে পাকিসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিসেনাদের উপর হালকা অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালাতে থাকে। পাকিসেনারা অনেকেই গুলিতে হতাহত হয়। তারা আমাদের কমান্ডো প্লাটুনের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৮ই জুন রাত ৯টায় মিয়াবাজারের দক্ষিণে আমাদের আরেকটি প্লাটুন পাকিসেনাদের ২টি বাংকারের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ৭ জন পাকিসেনা নিহত হয়। পাকিসেনারা এরপর সমস্ত রাত অবিরাম মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকে। আমাদের এই দলটি 'খিলা' রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কয়েকটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইন রাস্তার পুঁতে রাখে। পাকিসেনাদের একটি জিপ রাতে ঔই রাস্তার যাওয়ার পথে মাইনের উপর পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। পাঁচ জন পাকিসেনাও নিহত হয়।

২১শে জুন সকালে একটি আর-আর রাইফেল আমাদের সৈন্যরা কুমিল্লা শহরের নিকটে বয়ে নিয়ে যায় এবং কুমিল্লা বিমানবন্দরের ও শহরের উপকণ্ঠের উপর গোলাগুলি করে, ভীত পাকিস্তানিরা এতে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। এসব কার্যকলাপের ফলে কুমিল্লা শহর ও তার নিকটবর্তী এলাকার জনসাধারণ আবার তাদের সাহস ফিরে পায়। অনেকেই শহর থেকে বাইরে চলে যায়। এসব আক্রমণের ফলে পাকিস্তানিদের শাসন ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়।

এদিকে শালদা নদীতে পাকিসেনারা জুন মাসে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিল। পাকিসেনাদের কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদের ব্যস্ত রাখার লক্ষ্যে মেজর সালেক ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানির একটি প্লাটুন মর্টারসহ শালদা নদীর পশ্চিম দিকে পাঠিয়ে দেয়। এই প্লাটুনটি রাত ৩টায় পাকিসেনাদের অবস্থানটি ঘুরে পিছনে যেতে সক্ষম হয়। সকাল সাড়ে ৫টার সময় পূর্বনির্ধারিত স্থানে তারা নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে। এরপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র এবং মর্টারের সাহায্যে শত্রু অবস্থানের ওপর খুবই নিকট থেকে হামলা চালায়। পাকিসেনারা

দিনের বেলায় তাদের অবস্থানের পিছনে এত নিকট থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এহেন আক্রমণের ফলে তাদের অন্ততপক্ষে এক জন জেসিওসহ ৩২ জন হতাহত হয়।

কিন্তু আমাদের প্লাটুনও বিপদের সম্মুখীন হলো। পাকিসেনাদের একটি শক্তিশালী দল রাতে শালদা নদী অবস্থান থেকে কসবাতে টহলের জন্য গিয়েছিল। এই সংবাদটি আমাদের জানা ছিল না। পাকিসেনাদের সঙ্গে আমাদের প্লাটুনটি যখন ভয়ংকর সংঘর্ষ করছিল, সে সময় পাকিসেনাদের টহলদার দলটি কসবা থেকে ফেরার পথে আমাদের প্লাটুনটির পিছনে অবস্থান নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমাদের প্লাটুনটি সঙ্গে সঙ্গে অতিকষ্টে পাকিসেনাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। আসার সময় আমাদের একজন লোক আহত হয়। পাকিসেনারা এরপর শালদা নদী অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তোলে।

ইতোমধ্যে আমরা খবর পাই যে, পাকিবাহিনী প্রায়ই হোমনা থানার কাঁঠালিয়া নদী এবং গোমতী নদীতে লঞ্চে পেট্রোলিং করছে। এ খবর শুনে আমি হেডকোয়ার্টার থেকে একটি প্লাটুন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের নেতৃত্বে হোমনা থানাতে প্রেরণ করি। এই দলটি অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দাউদকান্দির আট মাইল উত্তরে এবং গৌরীপুর থেকে সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে চরকমারী গ্রামের কাছে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন চরকমারী গ্রামের পাশে পাকিসেনাদের লঞ্চকে অ্যামবুশ করার জন্য তার দল নিয়ে নদীর পাড়ে একটি অবস্থান গড়ে তোলে। পাকিসেনারা নিত্যনৈমিত্তিক টহলে সকালে পশ্চিম হতে কাঁঠালিয়া নদী দিয়ে লঞ্চে অগ্রসর হয়। লঞ্চটি যখন ৫০ গজের ভিতর চলে আসে, তখন হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের পার্টি মেশিনগান, হালকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে অতর্কিতে গোলাগুলি চালাতে থাকে। পাকিসেনারা অনেকেই হতাহত হয়। লঞ্চটির সারেং লঞ্চটিকে একটা চরের দিকে ভিড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর অনেক পাকিস্তানি সৈন্য লঞ্চ থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও তারা রক্ষা পায়নি। লঞ্চটিও আমাদের মেশিনগানের গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে যায় এবং বেশিরভাগ পাকিসেনা পানিতে পড়ে যায়। শুধু কয়েকজন সাঁতরিয়ে অন্য পাড়ে উঠে পালাতে সক্ষম হয়। এই লঞ্চে পাকিসেনাদের অন্তত ৭০/৮০ জন সৈন্য এবং তিনজন বেসামরিক লোক ছিল। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিনের লোকেরা লঞ্চ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার করে। সেদিনই বিকেল ৫টার সময় পাকিবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাদের এই লঞ্চটি এবং লোকজনের খবরাখবর নেয়ার জন্য ওই এলাকার উপর অনেক ঘোরাফিরা করে। কিন্তু কোনো খোঁজখবর না পেয়ে হেলিকপ্টারটি ফেরত চলে যায়। এই অ্যাকশন সকালে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা চলে এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার স্থানীয় লোকেরা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করে। পাকিবাহিনীকে

শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে তাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আরো আস্থাশীল হয়। হাবিলদার গিয়াসুদ্দিন এখনও এই এলাকার লোকের কাছে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে বিরাজ করছেন।

সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর অধীনে যে কোম্পানিটি লাকসামের দক্ষিণে নেয়াখালীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল, সে কোম্পানিটিও এ অঞ্চলে পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অ্যাকশন অব্যাহত রাখে। চাঁদপুর থেকে পাকিবাহিনী নোয়াখালী যাবার জন্য যে রাস্তা ব্যবহার করত, সে রাস্তায় লক্ষ্মীপুরের কাছে ৯০ ফুটের একটি সড়ক সেতু এঁরা বিধ্বস্ত করে দেয়। এর কিছুদিন পর পাকিবাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে সুবেদার আলী আকবরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রায়পুর থানা আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে দালাল পুলিশরা থানা থেকে পালিয়ে যায়। পাকিবাহিনীরা মাঝে মাঝে এ থানাতে এসে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করত এবং দালাল পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় লোকদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত। এ থানা দখল করে নেয়ার ফলে সমস্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

১৬ই জুন আমাদের ২টি গেরিলা পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়। ছয় জনের একটি পার্টিকে কুমিল্লার দক্ষিণে ইলেকট্রিক পাইলন উড়ানোর জন্য এবং আরও ৬ জনের একটি পার্টিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তিতাস গ্যাস লাইন কাটার জন্য। ২১ শে জুন প্রথম পার্টিটি ২ টি ইলেকট্রিক পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে নোয়াখালীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে তালশহরে ২৪শে জুন সন্ধ্যায় তিতাস গ্যাসের ৪ ফুট পাইপ উড়িয়ে দেয়। এর ফলে তিতাস গ্যাস ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনগুলোতে সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

মতিনগর থেকে একটি প্লাটুন রাজাপুরের পাকি অবস্থানের উপর হামলা করার জন্য পাঠানো হয়। এই প্লাটুনটি ২২শে জুন আমাদের ঘাঁটি থেকে রাজাপুরের দিকে অগ্রসর হয়। সন্ধ্যায় রাজাপুর শত্রু অবস্থানটি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেকি করে। তারা জানতে পারে যে, পাকিসেনারা বেশ অসতর্কভাবেই তাদের অবস্থানে আছে। ২২শে জুন ভোর ৪টায় আমাদের দলটি অতর্কিতে গোপনপথে শত্রু অবস্থানের ভিতর প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিসেনারা সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। ফলে প্রায় ১৫ জন পাকিস্তানি হতাহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়। আক্রমণ প্রায় এক ঘন্টা চলার পর আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে আসে।

এসময় আমাদের রেকি পার্টি খবর আনে যে, পাকিসেনারা কসবার উত্তরে চন্দ্রপুর এবং লাটুমুড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাবার পর লে. হুমায়ূন কবির পাকিসেনাদের চতুর্দিক থেকে অ্যামবুশ করার জন্য ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানির তিনটি প্লাটুন ইয়াকুবপুর, কুয়াপাইনা এবং খৈনলে পাঠিয়ে দেয়। এই

তিনটি প্লাটুন নিজ নিজ জায়গায় ২৩শে জুন সকাল ৬টার মধ্যে অবস্থান নেয়। পাকিসেনারা সমস্ত রাত অগ্রসর হওয়ার পর সকাল নাগাদ আমাদের অবস্থানের সামনে উপস্থিত হয়। পাকিসেনারা আমাদের অবস্থানের ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে এসে পড়লে তিনদিক থেকে আমাদের সৈন্যরা পাকিসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিস্তানিদের আট জন নিহত এবং তিনজন আহত হয়। পাকিসেনারা একটু পিছু হটে যেয়ে আবার আক্রমণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর সমস্তদিন উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় পাকিসেনারা পিছু হটে যায়। কিন্তু ওদের জন্য নতুন বিপদ। আমাদের ইয়াকুবপুরের প্লাটুন তাদের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে বেশ ক্ষতি সাধন করে। ফলে পিছু হটে গিয়ে পাকিস্তানিরা লাটুমুড়ার উত্তরে অবস্থান নেয় এবং প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করতে থাকে। ২৪শে জুন পাকিসেনারা যখন লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল, সকাল পাঁচটায় কুয়াপইনা ও খৈনল এলাকা থেকে শত্রুদের বামে এবং দক্ষিণে আমাদের ৩টি প্লাটুন আবার অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে পাকি সেনাদের ৯ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের একজন আহত হয়।

নোয়াখালী-ফেনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য : বোগদিয়া-বজরাতে ১২ জন পাকিসেনা নিহত

এবার নোয়াখালী ও ফেনীর কিছু লড়াই-এর খবর। নোয়াখালীর উত্তরে পাকিবাহিনী ফেনী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ট্রাকে টহল দিত। এ খবর আমাদের নোয়াখালীর গেরিলা হেডকোয়ার্টার-এ পৌঁছে। সেখান থেকে আমাদের ২টি অ্যামবুশ পার্টি বোগাদিয়া এবং বজরাতে পাঠানো হয়। ২১ শে জুন এরা উপরোক্ত দুটি স্থানে অ্যামবুশ পাতে। তারা রাস্তাতে একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ও অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পুঁতে রাখে। সন্ধ্যায় পাকিসেনাদের দুটি ট্রাক ফেনীর দিকে যাচ্ছিল। এই ট্রাক দুটি অ্যামবুশ-স্থানে পৌঁছালে প্রথম ট্রাকটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরের ট্রাকটি পিছু হটে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অ্যামবুশ পার্টি তাদের উপর গুলি চালাতে থাকে। পাকিসেনারা উপায়ন্তর না দেখে ট্রাক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। পলায়নপর শত্রুদের কিছুসংখ্যক গুলিতে মারা যায়, আর কিছু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই অ্যামবুশ-এ পাকিসেনাদের ২টি ট্রাক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২ জন নিহত হয়। আমাদের পার্টি অনেক অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে এবং বজরার অ্যামবুশ পার্টিও শত্রুদের একটি টহলদার দলকে আক্রমণ করে দু'জনকে নিহত এবং দু'জনকে আহত করে। আর একটি পার্টি ২৩শে জুন পাকিসেনাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট

করে দেয়ার জন্য নোয়াখালীর শাহেবজাদা ব্রিজ, চন্দ্রগঞ্জ এবং রামগঞ্জ জেলা কাউন্সিল ব্রিজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা লাটুমুড়াতে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখলেও ৪র্থ বেঙ্গলের 'ডি' কোম্পানি লে. হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে তাদেরকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখে।

অন্যদিকে পাকিসেনারা তাদের শালদা নদী অবস্থান থেকে অবিরামভাবে আক্রমণ করে মন্দভাগ দখল করে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। আমাদের ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশন এবং জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা পর্যন্ত নিজেদের দখলে রেখে শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়েছিল। এ অবস্থানটির অন্য পাকিবাহিনী চট্টগ্রাম-ঢাকা রেলওয়ে লাইন চালু করতে পারছিল না। সে জন্য সবসময় তাদের চেষ্টা ছিল মন্দভাগ থেকে আমাদের বিতাড়িত করা। এ ছাড়া এ অবস্থানটির জন্য তারা শালদা নদী ছিটমহল যেখানে আমাদের মূল ঘাঁটি ছিল, তা দখলে আনতে পারছিল না। অনেকবার চেষ্টা করেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৪শে জুন বিকেল ৩টা শালদা নদী অবস্থান থেকে পাকিসেনাদের একটি কোম্পানি এবং কসবায় টি, আলীর বাড়ি থেকে আর একটি– এই দুই কোম্পানি দু'দিক থেকে এসে কায়েমপুরের কাছে একত্রিত হয়। এরপর মর্টার, মেশিনগান এবং কামানের সাহায্যে আমাদের মন্দভাগ অবস্থানে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড গোলার সহায়তায় পাকিসেনাদের এই শক্তিশালী দলটি মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা বোর্ড সড়ক পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আমাদের সৈনিকরাও তাদের বাঙ্কার থেকে মেশিনগান এবং হালকা মেশিনগানের গুলিতে পাকিসেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকে। দু'ঘণ্টা চেষ্টার পর পাকিসেনারা যখন অগ্রসর হতে পারছিল না, তখন আক্রমণ বন্ধ করে তারা পিছু হটে চলে যায়। এ আক্রমণের সময় পাকিসেনাদের ২৪ জন হতাহত হয়। ভীত অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের কায়েমপুরের অবস্থানও তুলে নিয়ে শালদা নদীর মূল ঘাঁটিতে চলে যায়।

আবার ঢাকায় গেরিলা অ্যাকশন-এর আরও কিছু বিবরণ। ঢাকায় আমাদের গেরিলারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে স্বাভাবিকভাবে না চলে সে জন্য তারা ২৯শে জুন বিকেল পাঁচটা সিদ্ধিরগঞ্জ এবং খিলগাঁও পাওয়ার লাইনের একটি পাইলন ধ্বংস করে দেয়। এই বিধ্বস্ত পাইলনটি অন্য দুটি পাইলনের তার নিয়ে ছিঁড়ে পড়ে যায়। এর ফলে কমলাপুর এবং তেজগাঁওয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকাংশে কমে যায়। বিস্ফোরণের ঠিক পর পরই পাকিসেনাদের একটি হেলিকপ্টার তৎক্ষণাৎ উক্ত এলাকায় গেরিলাদের অনেক খোঁজাখুঁজি করে। আমাদের গেরিলারা নিরাপদে ফিরে আসে। আর একটি গেরিলা দল সিদ্ধিরগঞ্জের মাটির তলার পাওয়া লাইন মাতুয়াইলে উড়িয়ে দেয়। পাকিসেনারা নিকটবর্তী ঘাঁটি

হতে জিপে করে এসে দলটিকে ধরার চেষ্টা করে এবং এদের উপর গোলাগুলি করে, কিন্তু গেরিলা দলটি নিরাপদে গোপন আশ্রয়ে ফিরে আসে।

স্থানীয় লোকমুখে আমরা সংবাদ পাই যে, পাকিসেনাদের একটি টহলদার দল জিপে প্রায়ই সাইদাবাদ থেকে কর্নালবাজার পর্যন্ত আসে। এ সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে অ্যামবুশ লাগায়। ২৭শে জুন সন্ধ্যার সময় পাকিসেনাদের টহলদার দল খোলাপাড়ায় এবং তুলাইশমলে একটি করে প্লাটুনের সাহায্যে অ্যামবুশ লাগায়। ২৭শে জুন সন্ধ্যার সময় পাকিসেনাদের টহলদার দল খোলাপাড়ায় আমাদের অ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে পাকিসেনাদের ৮জন নিহত হয় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এর পরদিন ২৮শে জুন সন্ধ্যা ৭টায় পাকিসেনাদের একটি জিপ তুলাইশলে আমাদের অ্যামবুশে পড়ে। অ্যামবুশ পার্টির গুলিতে জিপটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রাস্তা থেকে পড়ে যায়। জিপে পাঁচ জন পাকিসেনা ছিল। তারাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। আমাদের পার্টি অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা কুমিল্লা শহরের পূর্বে বিবিরবাজার এলাকায় যে ঘাঁটি গড়েছিল, আমরা প্রায়ই আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতাম। লে. মাহবুব খবর পায় যে, পাকিসেনারা সন্ধ্যার পর আর তাদের বাংকার থেকে বাইরে আসে না। রাতে যে সব পাহারাদার থাকে তারাও বাংকারের মধ্যে বসে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে লে. মাহবুব দুটি প্লাটুনকে ২৪শে জুন রাতে শত্রুদের বিবিরবাজার ঘাঁটির কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লার দক্ষিণ থেকে পাঠিয়ে দেয়। এ দলটি অরণ্যপুর হয়ে শত্রুদের বিবিরবাজার অবস্থানের পিছনে পৌঁছে এবং রাত তিনটায় অবস্থানের ভিতর অনুপ্রবেশ করে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। প্রথমেই তারা তাদের সামনের একটি বাংকারে গ্রেনেড ছোঁড়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আরও ২/১টি বাংকার ধ্বংস করে তারা সকাল হবার আগেই শত্রু-অবস্থান ত্যাগ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে পাকিসেনাদের ২১ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়।

এদিকে বিজয়পুরের যে রাস্তার সেতুটি আমাদের কমান্ডো পার্টি উড়িয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানিরা সেটি সাময়িকভাবে মেরামত করে ফেলে এবং সে রাস্তায় আবার তারা চলাফেরা শুরু করে। লে. মাহবুব আবার একটি কমান্ডো প্লাটুন পাঠায় এবং এই প্লাটুনটি ২১শে জুন বিজয়পুর ব্রিজের কাছে অ্যামবুশ পেতে পাকিসেনাদের অপেক্ষায় থাকে। রাত ২টার সময় পাকিসেনাদের দুটি গাড়ি কুমিল্লা থেকে ওই রাস্তায় আসে। গাড়িগুলো যখন ব্রিজের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে, ঠিক তখনই আমাদের পার্টি তাদের উপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে যায়। এতে দুটি গাড়িই বিনষ্ট হয় এবং আট জন পাকিসেনা নিহত হয়।

৬০ জন কমান্ডোকে মাদারীপুরে প্রেরণ : ভয়াবহ অ্যাকশনে পাকিসেনা ও বঙ্গ দালাল নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী এবং ঢাকার পাশাপাশি এসময় আমরা গেরিলা এলাকা ফরিদপুর-মাদারীপুর এলাকায় সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেই। জুন মাসে প্রথম সপ্তাহে আমার হেডকোয়ার্টার থেকে গেরিলাদের ৬০ জনের একটি দলকে ফরিদপুরে পাঠাই। মাদারীপুর, পালং, রাজৌর, নড়িয়া প্রভৃতি থানায় গেরিলাদের বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছিল। এই দলগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গড়ে তোলে। তারা প্রথমেই কিছু সংখ্যক পাকিস্তানি দালালকে হত্যা করে। এরপর তারা নিজ নিজ এলাকার থানাগুলো যেখান থেকে দালাল পুলিশরা পাকিস্তানিদের খবরাখবর যোগাত, সেই থানাগুলো ভালোভাবে রেকি করে। প্রথমে তারা শিবচর অয়ারলেস স্টেশনটি ধ্বংস করে দেয়। গেরিলা কমান্ডার খলিলের নেতৃত্বে পালং থানার উপর ২৭শে জুন রাত ১১ টার সময় আক্রমণ চালানো হয়। এ আক্রমণে একজন দালাল সাবইন্সপেক্টর এবং দু'জন পুলিশ নিহত হয়। গেরিলারা ৯টা রাইফেল দখল করে। তারা থানার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়। নড়িয়ার গেরিলা দল খবর পায় যে, মাদারীপুরের ডিআইবি ইন্সপেক্টর ও দালাল সি, আই, পুলিশ একটি স্থানীয় দালালের বাড়িতে গুপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত। এ সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তারপরে নড়িয়ার অয়ারলেস স্টেশনটিও ধ্বংস করে দেয়।

রাজৈর থানার টেকেরহাটে এসে তারা অবস্থান নেয়। গেরিলা দলটি পাকিসেনাদের অবস্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর নেয়। ২৮শে জুন রাত ১১টার সময় ২০ জনের একটি গেরিলা দল টেকেরহাটে পাকিসেনাদের অবস্থানের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ফলে পাকিসেনাদের ১০ জন নিহত হয় এবং তারা টেকেরহাটে অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

এমনি এক সময়ে পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে ২৮শে জুন সন্ধ্যায় জেনারেল মোঃ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আমি ইয়াহিয়া খানের ভাষণকে 'সংবর্ধনা' জানানোর জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

এ সম্বন্ধে আমি আমার সাব-সেক্টর কমান্ডারদের হেডকোয়ার্টার-এ ডেকে পাঠাই এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ভাষণের সময় পাকিস্তানিরা সর্বক্ষেত্রেই রেডিও শোনার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে একত্রিত হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হবে। এ সময় তাদের এই অসতর্কতা আমাদের জন্য আনবে এক সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়া আমাদের অ্যাকশনও হবে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমুচিত জবাব। এ জন্য আমি সমস্ত সাব-সেক্টর কমান্ডারকে নির্দেশ দিলাম, তারা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার

পর থেকে, যখন ইয়াহিয়ার ভাষণ আরম্ভ হবে, ঠিক সে সময়ে আমার সেক্টরের সব এলাকায় এক যোগে পাকিসেনাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবে।

এ নির্দেশ অনুযায়ী ৪র্থ বেঙ্গলের 'এ' কোম্পানি নয়ানপুরের পাকিসেনাদের অবস্থানের উপর তিন দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ভাষণ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই পাকিসেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকিসেনারা এ অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে যায়। এর সাথে সাথে আমাদের মর্টারের গোলা তাদের উপর পড়তে থাকে। পাকিসেনারা তাদের অবস্থানের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি এবং চিৎকার করে বাংকারের দিকে যাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেশিনগানের গুলিতে তাদের অনেকেই মারা যায়। আধ ঘণ্টা এভাবে গুলি চালানোর পর আমাদের সৈন্যরা শত্রু অবস্থান পরিত্যাগ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে ১৮ জন পাকিস্তানি নিহত এবং বহু আহত হয়।

এই দিন লে. হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে ঠিক একই সময় আমাদের একটি কোম্পানি মর্টারসহ লাটুমুড়াতে শত্রু অবস্থানের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে বেশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন তারা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনছিল। এ-আক্রমণের ফলে পাকিসেনাদের ৫ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। আমাদের কোম্পানি শত্রুদের উপর আড়াই ঘণ্টা আক্রমণ চালিয়ে নিরাপদে পিছু হটে আসে।

ঢাকাতে এই বিশেষ সময়টিকে উদযাপন করার জন্য আমি ৫০ জন গেরিলার একটি দলকে পাঠিয়ে দেই। এই দলটি ২৭শে জুন ঢাকায় পৌঁছে। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরের প্রধান স্থানগুলোতে যেমন জিন্নাহ এভিনিউ, মতিঝিল, শাহবাগ, পুরানাপল্টন, সদরঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে একযোগে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং মোটর গাড়িতে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পাকিসেনারা চতুর্দিকে ছোটাছুটি করে এবং সমস্ত ঢাকায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ বিস্ফোরণগুলোর ফলে ঢাকায় আমাদের বাঙালিরা তাদের মনোবল আরো ফিরে পায় এবং তারা ইয়াহিয়ার ভাষণের সমুচিত জবাবে আনন্দিত হয়।

মতিনগর থেকে ২টি মর্টার দিয়ে একটি ছোট দলকে গোমতীর উত্তর পাড় দিয়ে কুমিল্লা শহরের দিকে পাঠানো হয়। এ দলটি কুমিল্লা শহরের নিকট গিয়ে ঠিক ভাষণের সময়ে কুমিল্লা সার্কিট হাউসের উপর মর্টার দ্বারা গোলাবর্ষণ করে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে পাকিসেনাদের 'মার্শাল ল'র প্রধান অফিস ছিল। মর্টারের গোলা এসে অফিসে পড়ার পর, সেখানেও পাকিসেনারা ছোটাছুটি করতে থাকে। কুমিল্লা শহরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে নীরবতা নেমে আসে।

২৮শে জুন কুমিল্লা থেকে পাকিস্তানিদের একটি জিপ ও একটি ৩টনের গাড়ি দক্ষিণে যাচ্ছিল। লে. মাহবুবের একটি অ্যামবুশ পার্টি এই দলটিকে সন্ধ্যার সময় ফুলতলীতে আক্রমণ করে। এতে জিপটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এই

অ্যামবুশে পাকিস্তানিদের ২৪ জন সৈন্যসহ ৩ জন অফিসার নিহত হয় এবং এক জন অফিসারসহ ৪ জন আহত হয়। অফিসারটি লে. কর্ণেল পদের।

লে. মাহবুবের আর একটি প্লাটুন ঠিক একই সময়ে বিবিরবাজার শত্রু অবস্থানের ভিতর অতর্কিতে অনুপ্রবেশ করে একটি মেশিনগানসহ কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করে দেয়। পাকি-সেনাদের ১১ জন এতে নিহত হয়।

এছাড়া মিয়াবাজার, ফেনী, বিলোনিয়া, লাকসাম, শালদা নদী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানেও মর্টার ও গ্রেনেডের সাহায্যে একযোগে আক্রমণ চালানো হয়।

ইয়াহিয়া খান মনে করেছিল যে, তাঁর ভাষণ দিয়ে তিনি বাঙালিদের শান্ত করবেন। আবার তাঁর মিথ্যা আশ্বাসে বাঙালিরা তাদের অত্যাচারকে ভুলে যাবে। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমাদের সবগুলো অ্যাকশনে তিনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলেন যে, বাঙালিরা তার জবাব কী দিয়েছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট : লে. কর্ণেল শাফায়াত জামিল

১৯৭১ সনের ১লা মার্চ তারিখে আমি আমার চতুর্থ বেঙ্গলের এক কোম্পানির সৈন্য নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসি। আমার সাথে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর একটি কোম্পানি ছিল। যার কমান্ডার ছিল একজন পশ্চিম পাকিস্তানি সিনিয়র মেজর। আমাদের পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করা। এখানে বলে রাখা দরকার যে, চতুর্থ বেঙ্গলে আমিই বাঙালিদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট ছিলাম। আমরা চলে আসার পর কুমিল্লা সেনানিবাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের আরো দুই কোম্পানি সৈন্য থেকে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের বাকি দুই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতাম। এ ব্যাপারে আমি সুবেদার আবদুল ওহাবকে ব্যবহার করতাম।

মার্চের এক তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত কুমিল্লা সেনানিবাসের অস্বাভাবিক ঘটনাবলী নিম্নরূপ:

১। আমাদের ইউনিট লাইনের চারিদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার এবং জেসিওদের, বিশেষ করে আর্টিলারি বাহিনীর লোকদের অস্বাভাবিক গতিবিধি বা চলাফেরা।

২। রাতের বেলায় মেশিনগান আমাদের ইউনিট লাইন, অফিসারদের বাসস্থান, অস্ত্রাগার এবং কোয়ার্টার গার্ডের দিকে পজিশন। এবং দিনের বেলায় সেনানিবাসের বাহিরের দিকে পজিশন করে রাখা। তা ছাড়াও আমাদের ইউনিট লাইনের চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে পাকিসেনাদের পরিখা খনন। জিজ্ঞেস করলে বলত "আমরা ট্রেনিং করছি।"

৩। ইউনিট লাইনে বিগ্রেড কমান্ডার ও ব্রিগেডের অন্যান্য অফিসারদের অপ্রত্যাশিত পরিদর্শন।

৪। আমাদের খেলার মাঠে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসার ও জেসিওদের সাথে ব্রিগ্রেডের অফিসার ও জেসিওদের দৈনিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতা (যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছয় মাসে একবার, দুইবার আয়োজিত হতো)। খেলার মাঠ রক্ষার জন্য অন্য রেজিমেন্টের প্রটেকশন পার্টিকে অস্ত্রশস্ত্রসহ নিয়োগ করা।

৫। যদিও সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের জন্য আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পাঠানো হয়, তথাপি অস্বাভাবিকভাবে আমাদের উপর ছুটির ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয় নাই। বরং অবাঙালি চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ও ব্রিগেড কমান্ডার জওয়ানদেরকে বলেন, যার যার ইচ্ছানুযায়ী ছুটি নেয়া যেতে পারে।

৬। মার্চ মাসের ১৮/১৯ তারিখে ইউনিট লাইনে রাত প্রায় বারোটায় সময় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন বাঙালি এসে খবর দেয় যে, সেনানিবাসে আজ রাতে চতুর্থ বেঙ্গলের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা হামলা চালাবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই ক্যাপ্টেন গাফফ্‌ার, লেফ্‌টেন্যান্ট মাহবুব, লেফ্‌টেন্যান্ট কবীর, এ মর্মে বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুইটি কোম্পানিকে (যারা সেনানিবাসের ভিতরে ছিল) নির্দেশ দেয় যে, সব জওয়ান যেন নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে কাছে রাখে। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈন্যদের দেখাদেখি সেনানিবাসের অন্যান্য পাকিস্তানি ইউনিটও অস্ত্রশস্ত্র সহকারে তৈরি থাকে। সে রাতে কোনো হামলা হয়নি। ২০শে মার্চ ভোরে সবাই আবার অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দেয়। রাতে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র বের করার জন্য কারো কাছে কোনো কৈফিয়তও চাওয়া হয়নি। চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার এসব অনিয়ম নিজে জেনেও উপরোল্লিখিত অফিসারদের কাছে কোনো কৈফিয়ত চাননি।

৭। ব্রিগেড কমান্ডার, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সপ্তাহে একবার সৈন্যদের উদ্দেশে উপদেশ দিতে শুরু করে। এটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

৮। ১০ই মার্চ, (১৯৭১) ১৭টি গাড়ি (রসদপত্র, তেল বোঝাই) কুমিল্লা থেকে সিলেটে পাঠানো হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের একজন সুবেদার সামসুল হক এবং দশজন (বাঙালি) সৈন্যকে এই কনভয়ের প্রটেকশনে পাঠানো হয়। এই রসদপত্র ৩১, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেটের খাদিমনগরের উদ্দেশে পাঠানো হয়। এই কনভয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল। দুই দিনে এই কনভয় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে। রাস্তায় ব্যারিকেড ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এই কনভয়কে নিয়ে সিলেটের খাদিমনগরে পৌঁছাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড অতিক্রম করে খাদিমনগরে পৌঁছতে আমার তিন দিন লাগে। ১৫ই মার্চ আমি

খাদিমনগর পৌঁছি ও নির্দেশ মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফেরার প্রস্তুতি নেই। কিন্তু বলা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাকে ৩১ পাঞ্জাবের সাথে থাকতে হবে। এ খবর পাবার পর আমি কুমিল্লায় টেলিফোন করলাম। বাঙালি অফিসারদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন গাফ্ফার, লেফটেন্যান্ট কবীর, লেফটেন্যান্ট মাহবুব এবং জেসিওরা কমান্ডিং অফিসারকে অস্বাভাবিক অবস্থার কথা জানালাম। বললাম অবিলম্বে আমাকে খাদিমনগর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হোক। ১৭/১৮ তারিখে আমি ও আমার চতুর্থ বেঙ্গলের অন্য সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমার কোম্পানিতে ফিরে আসি।

উপরোল্লিখিত ঘটনাবলীতে আমি বেশ সন্দিহান হয়ে পড়ি। আমি সুবেদার ওহাবের মাধ্যমে কুমিল্লা সেনানিবাসে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিওদের কাছে খবর পাঠাতাম যে, কোনো পরিস্থিতিতেই তারা যেন আত্মসমর্পণ না করে। যদি প্রয়োজন হয় অস্ত্র নিয়ে তাঁরা যেন বেরিয়ে আসে।

এ ধরনের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হবার পর আমার কোম্পানি এবং মেজর সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে নিয়ে আসা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমরা ওয়াপদা কলোনি সংলগ্ন স্থানে তাঁবুতে দুই কোম্পানি অবস্থান করি। আমার আশংকা ছিল, এই দু'টি কোম্পানি সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করবে। এই সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমি আমার কোম্পানির এবং সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির জেসিওদের নির্দেশ দিই, তারা যেন আত্মরক্ষার জন্য আমাদের ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করে রাখে। আর প্রয়োজন হলে তবে ঐসব পরিখা থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

আমাকে এই সমস্ত কাজ খুব সাবধানে ও হুঁশিয়ারের সাথে করতে হয়। কেননা, মেজর সাদেক নেওয়াজ সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখতো। সে প্রায়ই আমাকে এ-মর্মে জিজ্ঞেস করত যে, পরিখা খনন করা, পজিশন নেয়া- এগুলোর উদ্দেশ্য কী? আমি বলতাম, ডিগিং প্র্যাকটিস এবং পজিশন নেয়ার প্রশিক্ষণ রিভাইজ করা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন জেসিওদের সাথে যোগাযোগ, প্রভাবান্বিত এবং সতর্ক করার কাজে লেফটেন্যান্ট হারুন আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। সে এসব কাজে উৎসাহী ছিল এবং অন্যান্য লোককে প্রেরণা যোগাতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কুমিল্লার সাথে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগ ছিল একমাত্র টেলিফোনের মাধ্যমে। এই একটি সিগন্যাল সেট যেটা অস্বাভাবিকভাবে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ রাখত। এ সময় আমি খুব অস্বস্তিকর পরিবেশে ছিলাম। আমি সব সময় চিন্তা করতাম যে,

কুমিল্লাতে অবস্থিত জুনিয়র অফিসাররা যদি সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, তাহলে হয়ত ব্যাটালিয়নের অর্ধেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সৈনিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় আমরা দেখতে পেলাম কুমিল্লার দিক থেকে ৮টা গাড়ির আলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের ক্যাম্পের প্রটেকশন পার্টি পরিখাতে অবস্থান নেয়। গাড়ি কাছাকাছি আসার পর বুঝতে পারি, মেজর খালেদ মোশাররফ তার কোম্পানি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১২০ মাইল দূরে সমশেরনগরে নকশালপন্থী এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মেজর খালেদ মোশাররফ যিনি আমার থেকে বাঙালিদের মধ্যে সিনিয়র; সেদিনই ব্যাটালিয়নে ঢাকা থেকে এসে যোগদান করেন এবং একই দিনে তাঁকে কুমিল্লা থেকে ১৭০ মাইল দূরে সমশেরনগরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর চতুর্থ বেঙ্গলের শুধু একটি রাইফেল কোম্পানি এবং হেডকোয়ার্টার-কোম্পানি কুমিল্লা থেকে যায়।

সেই রাতে মেজর খালেদ মোশররফ, লে. মাহবুবকে সঙ্গে নিয়ে আবার আসেন এবং তাঁর কোম্পানি আমাদের ক্যাম্পে থাকে। মেজর সাদেক নেওয়াজের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির জন্য আমরা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করতে পারি নাই। শুধু আভাষে-ইঙ্গিতে এটুকু বুঝাতে সক্ষম হই, যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আমরা প্রস্তুত। সত্যি কথা বলতে কি, সে দিন আমি আর লেফটেন্যান্ট হারুন খুবই খুশি হই এই ভেবে যে, আমাদের পরিচালনার জন্য একজন পুরোনো অভিজ্ঞ অফিসার মেজর খালেদ চতুর্থ বেঙ্গলে যোগ দিয়ে কুমিল্লা থেকে আরো একটি কোম্পানিকে মরণ ফাঁদ থেকে কনফ্রনটেশনের আগেই বের করে নিয়ে এসেছেন।

এসবের মধ্যে বিশেষ করে পাকিবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার জন্য ডেমোলিশন ট্রেনিং অন্যতম। এই ট্রেনিং-এর ভার ক্যাপ্টেন হায়দার (বর্তমানে মেজর) এবং হাবিলদার মুনিরের উপর ন্যস্ত করি। অতি সত্বরই আমার বেশ কিছু ডেমোলিশন টিম ট্রেইন্ড হয়ে যায়। প্রথমেই আমি এসব টিমগুলোকে ঢাকা, কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রেললাইন ও পাকা সড়কে পাঠিয়ে দেই। তাদের দায়িত্ব যতটুকু সম্ভব পুল এবং রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করে দেয়া। এসব কাজে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয় ডেমোলিশন-এর সরঞ্জামাদির অভাবে। এসব অসুবিধার মধ্যেও আমরা প্রত্যেকটি রেল এবং রাস্তাতে বেশ কিছুসংখ্যক পুল ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হই। যার ফলে ঢাকার সঙ্গে পাকিস্তানিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষকে বিমান ও জলপথের সাহায্য নিতে হয়। যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল।

ট্রেনিং ক্যাম্পে মারাত্মক অসুবিধা : তবু শিক্ষার্থীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা

আমি আমার হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া থেকে সরিয়ে কুমিল্লার কাছে মতিনগর নামক স্থানে স্থাপন করি। এখান থেকে কুমিল্লা এবং ঢাকা কাছে হওয়াতে আমার পক্ষে এসব জায়গাতে গেরিলা তৎপরতা চালানো অনেক সুবিধাজনক হয়। আমার ট্রেনিং ক্যাম্প এ সময় অনেক বড় হয়ে যায় এবং হাজার হাজার ছেলেকে আমি ট্রেনিং দিতে শুরু করি। এসব ছেলের মধ্যে অনেককেই আমি নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করি এবং অনেককে অনিয়মিত বাহিনীর জন্য শিক্ষা প্রদান করি। প্রথম অবস্থায় সৈন্যদের এবং অনিয়মিত বাহিনীর লোকদের থাকা-খাওয়ার ও চিকিৎসার অত্যন্ত অসুবিধা হতো। আমাদের কাছে না ছিল রসদ, না ছিল টাকা-পয়সা, না ছিল বাসস্থান। অনেক সময় এই হাজার হাজার লোককে খাওয়ানোর জন্য আমাকে বাংলাদেশের ভিতর বিভিন্ন রেশন ডিপো (এল এস ডি) থেকে রসদ জোরপূর্বক আনতে হয়েছিল। কোনো কোনো সময়ে রসদের ব্যবস্থা হলেও হাজার হাজার লোকের খাবার তৈরির হাঁড়ি-পাতিল বাসনপত্র ছিল না। তেলের ড্রাম কেটে আমরা পাত্র তৈরি করেছি। এমনও দিন গিয়েছে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ক্যাম্পের লোক খেতে পেয়েছে- শুধু আধাসেদ্ধ ভাত, কোনো সময় ডাল ছাড়াই। থাকার জন্য কোনো আশ্রয় না থাকায় অধিকাংশ লোকজনকে বৃষ্টিতে ভিজতে হতো। বিশুদ্ধ পানি ছিল না, নালার পানি পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছে।

তবুও এত কষ্টের ভিতরে আমি ক্যাম্পে লোকজনের মুখে সব সময় হাসি এবং উৎফুল্ল ভাব দেখতাম। এরা সবাই নিয়মিত এবং গণবাহিনী মিলেমিশে সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ভারত সরকার ইউথ ক্যাম্প তৈরি করার জন্য সাহায্য দেয়। আমি আগরতলার রিলিফ ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ইউথ ক্যাম্পের অনুমোদন করিয়ে নেই। তাদের কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করি। এসময় আমার লোকদের প্রচেষ্টায় আমরা মেলাঘর নামক স্থানে একটা ক্যাম্প গঠন করি। এ জায়গাটা পাহাড়ের উপর এবং জঙ্গলের ভিতর। এর অবস্থান ছিল বেশ সুবিধাজনক। পাকিস্তানি হামলার আশঙ্কা থেকেও বিপদমুক্ত ছিল। এখানেই আমি আমার স্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। এ ক্যাম্পটিতে বেশি জায়গা ছিল বলে আমি তিন-চার হাজার লোককে একত্রে থাকা-খাওয়া এবং ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হই। এ ক্যাম্পে আমি নিয়মিত ও গণবাহিনীর দুই ধরনের মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং শুরু করি।

এ সময় কুমিল্লার দক্ষিণে আমার যে সব সেনাদল ছিল তাদেরকে নিয়ে একটা সাবসেক্টর গঠন করি। এ সাবসেক্টর হেডকোয়ার্টার আমি নির্ভয়পুরে স্থাপন করি। ক্যাপ্টেন আকবর (বর্তমান মেজর), লে. মাহবুব এবং লে. কবির এই

সাবসেক্টর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে একটি কোম্পানি সুবেদার আলি আকবর পাটোয়ারীর অধীনে লাকসামের পশ্চিমবর্তী এলাকায় তাদের গোপন ঘাঁটি স্থাপন করে এবং সেখান থেকে নোয়াখালী, লাকসাম, কুমিল্লা, চাঁদপুরের রাস্তায় শত্রুসেনাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

জুলাই মাসে শত্রুদের একটি শক্তিশালী দল এলাকাকে মুক্তিসেনাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লঞ্চযোগে চাঁদপুর থেকে ডাকাতিয়া নদী দিয়ে অগ্রসর হয়। সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী আগে থেকে এ সম্বন্ধে খবর পেয়েছিল। সে ছাতুরার কাছে একটি সুপারি বাগানে শত্রুসেনাকে অ্যামবুশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। নদীর দু'পাশে হালকা মেশিনগান লাগিয়ে শত্রুদলের অপেক্ষায় ছিল। সকাল ১১টায় শত্রুরা লঞ্চযোগে অ্যামবুশ অবস্থানের মধ্যে পৌঁছায় এবং নদীর দুই তীর থেকে আমাদের কোম্পানির লোকেরা শত্রুসেনার উপর অতর্কিত গোলাগুলি চালায়। এতে লঞ্চের মধ্যে অনেক শত্রুসেনা হতাহত হয়। উভয়পক্ষের এ সংঘর্ষে শত্রুসেনারা পর্যুদস্ত হয়। উপায়ন্তর না দেখে শত্রুসেনারা পিছু হটে যায় এবং লঞ্চ থেকে নেমে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও তারা পরাস্ত হয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়। আমাদের এই কোম্পানি পরে চাঁদপুর থেকে কুমিল্লার বেশ কয়েকটি সেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করে দেয়। পাকিবাহিনী পরবর্তী পর্যায়ে অনেক বার আমাদের এই মুক্ত এলাকাকে দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে নির্ভয়পুর থেকে আমাদের সৈন্যরা এবং গেরিলাবাহিনী লাকসাম-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইনের লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে রেলসেতু এবং রাস্তার সেতু ধ্বংস করে দেয়। এতে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়।

উত্তরাঞ্চলে কসবা, মন্দভাগ, আখাউড়া, শালদা নদী প্রভৃতি অঞ্চলে যখন আমার সেনাদলের সাথে পাকিবাহিনীর প্রতিদিনই সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল, সে সময়ে কুমিল্লার দক্ষিণাঞ্চলে মিয়ার বাজার এবং চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলেও ক্রমশ পাকিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আমার ৪র্থ বেঙ্গল-এর 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন এবং ইপিআর ও মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত সম্মিলিত দলটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মিয়ার বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর প্রতিরক্ষা অবস্থান গঠন করে দ্রুত আরো শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাকিবাহিনীর মধ্যে এ অবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মিয়ার বাজারের কাছে যে রাস্তায় সেতুটি ছিল, সেটা ভেঙে দেয়া হয়। এছাড়া কুমিল্লার ৬ মাইল দক্ষিণে বাগমারাতে যে রেলওয়ে সেতুটি ছিল, সেটাও উড়িয়ে দেয়া হয়।

পাকিবাহিনী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পুনরায় খোলার জন্য ৩০শে মে সকাল ছ'টায় দু'কোম্পানি সৈন্য নিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। বেলা ১১টার সময় আমাদের একটি অ্যামবুশ দল মিয়ার বাজারের উত্তরে পাকিসেনাদের উপরে

অতর্কিত হামলা চালায়। শত্রুসেনারা মিয়ার বাজারে এত আগে এধরনের হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কুমিল্লার দিকে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে শত্রুদের প্রায় ৫০ জন হতাহত এবং আমাদের সেনাদল দু'টি তিন টনের গাড়ি গোলাবারুদসহ ধ্বংস করে দেয় এবং একটি গাড়ি দখল করে নেয়। আমাদের পক্ষের দু'জন সৈন্য নিহত এবং একজন আহত হয়। এরপর শত্রুরা কুমিল্লা বিমানবন্দর অবস্থান থেকে আমাদের মিয়ার বাজারের প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ভীষণভাবে ভারী কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করতে থাকে এবং পুনরায় আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়। শত্রুদের একটি শক্তিশালী পেট্রোল পার্টি 'চেওরা' হয়ে মিয়ার বাজারের পূর্বদিক দিয়ে আমাদের অবস্থানের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু লে. কবিরের নেতৃত্বে আমাদের একটা ছোট দল পাকিবাহিনীর পেট্রোল পার্টিকে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে পাকিবাহিনীর ১০ জন নিহত হয়। লে. কবির পাকিবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

মিয়ার বাজারের অবস্থানটির উপর পাকিসেনাদের চাপ বাড়তে থাকে। কামানের গোলা-বর্ষণ আমাদের অবস্থানের উপর তীব্র হতে থাকে। অবস্থানটি বেশি দিন আর টিকানো যাবে না ভেবে আমি লে. ইমামুজ্জামানকে একটু পিছু হটে চৌদ্দগ্রাম থানার বাজারের কাছে নতুন করে অবস্থান তৈরির নির্দেশ দিই। লে. ইমামুজ্জামান তাঁর দলকে নিয়ে চৌদ্দগ্রামে আবার এক নতুন প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ প্রতিরক্ষাব্যূহ তিন দিকে মুখ করে গড়ে তোলা হয়। ৪র্থ বেঙ্গলের প্লাটুনটি মিয়ার বাজারে কুমিল্লার দিকে মুখ করে পজিশন নেয়। কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তায় মিয়ার বাজারে যে সেতুটি ছিল, সে সেতুটির দক্ষিণে অবস্থানটি গড়ে তোলে। এদের উপর দায়িত্ব ছিল কুমিল্লা থেকে পাকিবাহিনীকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরে বাধা দেয়া।

আরেকটি প্লাটুনকে পশ্চিম দিকে মুখ করে বাগমারা থেকে যে কাঁচা রাস্তা মিয়ার বাজারের দিকে চলে গেছে তার উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ করার নির্দেশ দিই।

মুজাহিদ কোম্পানির দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ দিকে মুখ করে মিয়ার বাজার থেকে আধা মাইল দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা মহাসড়কের উপর অবস্থান গড়ে তোলা এবং দক্ষিণ থেকে শত্রুসেনার অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া। কিছু কিছু মাইন এবং সরু বাঁশ কেটে আমরা এ অবস্থানটির চতুর্দিকে পুঁতে দিই। এতে আমাদের অবস্থানটি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ অবস্থানটির হেডকোয়ার্টার চৌদ্দগ্রাম থানায় স্থাপন করি। দুসপ্তাহ পরে শত্রুসেনারা কুমিল্লার দিক থেকে এ অবস্থানটির উপর দুটি কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শত্রুদের বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পরে তারা পশ্চাদপসরণ করে। শত্রুরা আমাদের অবস্থানের উপর তাদের কামানের গোলা চালিয়ে যায়।

মে মাসে যখন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে সম্মুখ সমর চলছিল, তখন আমার মুক্তিযোদ্ধারা শত্রু বাহিনীর পিছনে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ২১শে মে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা জামাল এবং খোকন একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন পুঁতে শত্রুবাহী একটি ট্রাককে কুমিল্লার নিকট উড়িয়ে দেয়। গেরিলাদের আর একটি পার্টি দেবীদ্বার থানা আক্রমণ করে ছ'জন দালাল পুলিশকে নিহত করে। গেরিলাদের হাতে হাজিগঞ্জ থানার একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও দু'জন দালাল পুলিশ নিহত হয়। এ পুলিশদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে পাকিবাহিনীর একটি ছোট দল (দশ জনের মতো) হাজীগঞ্জ থানা পাহারায় নিযুক্ত হয়। গেরিলারা একদিন আক্রমণ চালিয়ে তাদের চারজনকে নিহত করে।

এসময়ে ঢাকাতে আমাদের কমান্ডো ছেলেরা নয়টি সরকারি অফিসে আক্রমণ চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেগুলো ছিল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, হাবির ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদরঘাট টার্মিনাল, পাকিস্তান অবজারভার অফিস প্রভৃতি। এসব আক্রমণে চারজন পাকিস্তানি অফিসার এবং দু'জন সৈনিক নিহত হয়।

কুমিল্লার দক্ষিণে গৌরীপুর নামক স্থানে আমাদের কমান্ডোরা পাকিসেনাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণেও পাকিসেনাদের ৯ জন নিহত হয়।

পাকিসেনারা ইতিমধ্যে শালদা নদী এরিয়াতে বিশেষভাবে তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তাদের ১টা রেলওয়ে ট্রলি, যা শত্রুদের জন্য রেশন এবং অ্যামুনিশন নিয়ে যাচ্ছিল- ২১শে মে আমাদের একটা ছোট অ্যামবুশ দলের হাতে ধরা পড়ে। এর ফলে আমাদের হস্তগত হয় এম জি, আই এ ৩, ৭৫ এম-এম এবং ১০৬ আর-আর-এর শেল।

২২শে মে তারিখে মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের নেতৃত্বে একটি গেরিলা দল শালদা নদী এলাকায় অবস্থানরত শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণ শত্রুদের পিছন থেকে পরিচালিত করা হয়। শত্রুরা এরকম আক্রমণের জন্য একদম প্রস্তুত ছিল না। মুজাহিদ ক্যাপ্টেন আবদুল হকের প্লাটুন শত্রুদের অবস্থানটি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। শত্রুরা তাদের অবস্থানের ভিতর এ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে যায়। এ আক্রমণের ফলে পরে আমরা জানতে পারি যে, শত্রুদের প্রায় ১৫ জন হতাহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪ জন মারা যায়।

২৫শে মে রাত আড়াইটার সময় আমাদের অ্যামবুশ পার্টি বাটপাড়া জোড়কাননের নিকটে শত্রুদের ১টা ট্রাক এবং ১টা আর-আর রাইফেল-এর জিপ অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে শত্রুদের প্রায় ২০ জন সৈনিক ট্রাক এবং জিপসহ ধ্বংস হয়ে যায়। ২৯শে মে সকাল সাড়ে ৬টায় একটা অ্যামবুশ পার্টি সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন লোক নিয়ে কুমিল্লার উত্তরে রঘুরামপুর নামক স্থানে অ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুদের একটা পেট্রোল পার্টি ১ জন অফিসার

ও ২৫ জন সৈন্য নিয়ে আমাদের অ্যামবুশের ফাঁদে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ২৭শে মে মন্দভাগ থেকে ১টি প্লাটুন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কুট শালদা নদীর সিএন্ডবি রাস্তার উপর শত্রুদের অ্যামবুশ করে। এ অ্যামবুশের ফলে শত্রুদের ৯ জন লোক নিহত হয়। এবং ১টা জিপ ও ১টা ডজ ধ্বংস হয়ে যায়। শত্রুরা তাদের মৃতদেহগুলো রেখেই পলায়ন করে। পেট্রোল পার্টি ২ জন পাকিসেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে সক্ষম হয়। মে মাসের মাঝামাঝি ফেনী এবং লাকসামের মাঝে রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়। রেলওয়ে ব্রিজের উপর পাকিসেনাদের ১০জন পাহারারত ছিল। তাদের মেরে ফেলা হয়।

২৬শে মে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী দল কসবার উত্তরে ইমামবাড়ির নিকট ১৫০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস করে দেয়। এরপর এ দলটি শত্রুদের জন্য অ্যামবুশ করে বসে থাকে। শত্রুরা ব্রিজের দিকে অগ্রসর হয়। শব্দ শুনে আমাদের দল তৈরি হয়। ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই পাকি সেনারা অ্যামবুশ-এর ভয়ে সেখান থেকে ফেরত চলে যায়। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন পরে তার দলটিকে নিয়ে কনার্ল বাজারে শত্রু অবস্থানের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের সময় ৭৫ এম-এম আর-আর-এর সাহায্যে শত্রুদের কয়েকটি বাঙ্কার ধ্বংস করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩ ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যেও গোলাবর্ষণ করে। এতে শত্রুদের ৮ জন সেনা নিহত এবং কয়েকটি বাঙ্কার ধ্বংস হয়।

আখাউড়া থেকে আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করার পর আমি আমার দলকে আখাউড়ার উত্তরে আজমপুর গ্রামে সিঙ্গারবিলে পজিশন নেয়ার নির্দেশ দেই। লে. হারুনের নেতৃত্বে একটি ইপিআর কোম্পানি এবং ৪র্থ বেঙ্গল-এর একটি প্লাটুন আজমপুর রেলওয়ে কলোনির পিছনে মাধবপুর সড়ক এবং রেল লাইনের উপর প্রতিরক্ষাব্যূহ গঠন করে। এ জায়গাটা ছিল একটু উঁচু এবং এর ডান দিকে তিতাস নদীর জন্য এ অবস্থানটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিসেনারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে আমরা এ জায়গাতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছি। শত্রুদল আখাউড়া দখল করার পর ভেবেছিল যে এবার তারা সিলেট-আখাউড়া লাইনে ট্রেন যোগাযোগ পুনরায় চালু করবে। এজন্য শত্রুরা ১টি লাইট ইঞ্জিন এবং কয়েকটি বগি মাধবপুর থেকে দক্ষিণে পাঠায়। এদিকে সিঙ্গারবিল স্টেশনের কিছু উত্তরে পুলের কাছে লে. হারুন কয়েকটি অ্যান্টি-ট্রাক মাইন রেল লাইনের নিচে আগেই পুঁতে রেখেছিল। এ ট্রেনটি লাইনের উপর দিয়ে আসার সময় মাইনের আঘাতে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পরে পাকিস্তান বাহিনীর কিছু সৈনিক এবং রেলওয়ে কর্মচারী ক্রেন নিয়ে আসে এ ট্রেনটি তোলার জন্য। কিন্তু পাকিসেনাদের এ দলটি লে. হারুনের পূর্ব পরিকল্পিত অ্যামবুশে পড়ে যায়। এর ফলে প্রায় ২০ জন পাকিসেনা নিহত হয় এবং বাকীরা (রেলওয়ে কর্মচারীসহ) সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস :
৯ মাস ঢাকা-সিলেট রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

এর কিছুদিন পর লে. হারুন সিঙ্গারবিল রেলওয়ে ব্রিজ ১৪০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে উড়িয়ে দেয়। পাকিবাহিনী এ সেতুটি মেরামত করার জন্য রেলওয়ে কর্মচারী ও আরো সরঞ্জাম সিঙ্গারবিল রেলওয়ে স্টেশনে জমা করে। এরপর সে সব সরঞ্জাম তারা রেলওয়ে সেতুটির নিকট নিজেদের তত্ত্বাবধানে এবং পাহারাধীনে আনে। লে. হারুনের মর্টার প্লাটুন সুবেদার শামসুল হক (বর্তমানে সুবেদার মেজর) এ সময়েরই অপেক্ষা ছিল। পাকিবাহিনী কয়েক দিন পর সকালে যখন তাদের সেতু মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছে, ঠিক সে সময় সুবেদার শামসুল হকের মর্টার তাদের লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লে. হারুনও তার সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ চালায়। পাকিবাহিনী এ আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তাদের সমস্ত সরঞ্জাম ফেলে সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সেই সঙ্গে সিলেট-চট্টগ্রাম রেলওয়ে লাইন তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ সংঘর্ষে পাকি বাহিনীর দশজন লোক নিহত হয়।

কিছুদিন পর পাকিবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর কামান দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আজমপুর থেকে আমাদের অবস্থানটিকে দখল করতে না পারলে সিলেট-ঢাকা রেলওয়ে লাইন তারা কখনও খুলতে পারবে না। ২৯শে মে কিছু পেট্রোল তারা আজমপুর পজিশনের পশ্চিমে তিতাস নদী বরাবর পাঠায় আমাদের পজিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য। কিন্তু এসব পাকিস্তানিদল আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। অন্যদিকে আমরাও পাকিসেনা বাহিনীর আখাউড়া অবস্থানে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। আমরা জানতে পারি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ট্রলি বা লাইট ইঞ্জিনের মাধ্যমে পাক বাহিনী তাদের রসদ এবং সরঞ্জাম আখাউড়াতে পাঠায়। এ সরবরাহ বন্ধের লক্ষ্যে আমাদের একটি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২ মাইল দক্ষিণে রেললাইনের নিচে মাইন পুঁতে দেয়। কিন্তু পাকিবাহিনী স্থানীয় দালালদের সহায়তায় এসব মাইন সম্বন্ধে জানতে পারে এবং সেগুলো উঠিয়ে নেয়। পাকিবাহিনী এ সময়ে রেল লাইনের নিকটবর্তী গ্রামের লোকদেরকে কঠোর সতর্ক করে দেয় যে, কোনো গ্রামের কাছে মুক্তিবাহিনী যদি পাকিবাহিনীর কোনো ক্ষতিসাধন করে, তবে সেই গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হবে। এ সতর্কতার ঘোষণায় প্রতিদিন রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর লোকজন রেলওয়ে লাইন এবং সড়ক পাহারা দিতে শুরু করে। এর ফলে পাকিবাহিনীর গতিবিধির উপর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

এ রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন আমরা আরো অনেক জায়গাতে হয়েছি। এ ধরনের বিরূপ অবস্থার মোকাবেলায় আমাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যে সব

জায়গায় আমার লক্ষ্যস্থল ছিল, সেখানে আমার সেনাদলগুলোকে সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করার নির্দেশ দেই। এই নির্দেশ বহুলাংশে সফল হয়। গ্রামবাসীদের পাকিবাহিনীকে সহযোগিতা করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তারা ভয়ে এসব বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করত। আমাদের সান্ধ্য আইনের ঘোষণার অনেক ফল হয় এবং গ্রামবাসীরা আর বাধা সৃষ্টি করে নাই। এরপর আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়ার মাঝে ২টি রেলসেতু উড়িয়ে দিই। এর ফলে আখাউড়ায় পাকিসেনাদের অবস্থানটির জন্য রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। ফলে পাকিস্তানিরা আখাউড়াতে হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য হয়।

দিন কয়েকের মধ্যে পাকিবাহিনী আমাদের আজমপুর পজিশনের উপর তাদের চাপ বাড়াতে থাকে। তাদের ২টা কোম্পানি একদিন সকালে আজমপুরের আধা মাইল দক্ষিণে দরগার কাছে আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলে। আমাদের সৈন্যরাও পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩০ জন শত্রুসেনা হতাহত হলে ওরা আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে আবার পশ্চাদপসরণ করে।

১৪ই জুন সকাল ৬টার সময় পাকিসেনারা নয়া বাজার হয়ে চৌদ্দগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারা আমাদের একটা অ্যামবুশ পার্টির ফাঁদে পড়ে যায়। নয়া বাজারের কাছে শত্রুদের প্রায় ৩০ জন হতাহত হয় এবং পিছু হটে যায়। ১৯শে জুন সকাল ৬টায় পাকিসেনারা অন্ততপক্ষে ২টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে দু'দিক থেকে (লাকসাম এবং ফেনীর দিক থেকে) প্রবল আক্রমণ শুরু করে। তীব্র কামানের গোলার মুখে আমাদের সম্মুখবর্তী সৈনিকরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। পাকিসেনাদের আক্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ পাকিসেনাদের আক্রমণে আমাদের চৌদ্দগ্রামের অবস্থানটি সংকটময় হয়ে পড়ে। আর বেশিক্ষণ এ অবস্থানটিতে থাকলে রাতের অন্ধকারে শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার আশংকা ছিল। পাকিসেনাদের সমস্ত দিনের যুদ্ধে অন্তত ২০০ জন হতাহত হয়েছিল এবং আমাদের পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল ২ জন নিহত এবং ৪ জন আহত। চৌদ্দগ্রাম অবস্থানটি শত্রুদের প্রবল আক্রমণের মুখ থেকে আর রক্ষা করা যাবে না বলে সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমাদের সেনাদল অবস্থানটি পরিত্যাগ করে।

জুন মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার মাধবপুরের রাস্তা এবং রেললাইনের উপর আমার পজিশনের দিকে অগ্রসর হয়। এবার পাকিসেনাদের ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স আমাদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের অগ্রবর্তী দরগা পজিশন থেকে এ আক্রমণকে বেশ কয়েক দিন বিফল করে দেয়া হয়। কিন্তু জুন মাসের শেষের দিকে আক্রমণ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাকিবাহিনী আখাউড়াতে ১২০ এম এম ভারী মর্টার এবং ১০৫ এম এম তোপ নিয়ে আসে।

এসব কামানের গোলার আঘাতে এবং ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর প্রবল চাপে আমাদের অগ্রবর্তী পজিশন সংকটময় হয়ে ওঠে এবং শত্রুদের অন্তত ৫০ জন হতাহতের পর আমাদের পজিশন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়।

এর কিছু দিন পর জুলাই মাসে পাকিবাহিনী আবার আজমপুরের দিকে আমাদের মূল অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এবারও তারা মাধবপুরের সড়ক ও রেল লাইনের উপর ১২ নং ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং মিলিশিয়াসহ আক্রমণ চালায়। আক্রমণের পূর্বে প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে থাকে। আমরা এ আক্রমণের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন পাকিসেনারা সারিবদ্ধ লাইনে আমাদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আমাদের মর্টার এবং মেশিনগান তাদের অন্তত পক্ষে ১০০/১২০ জনের মতো লোককে হতাহত করে। তারা আমাদের অবস্থানের কোনো কোনো জায়গায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে আমরা পাকিসেনাদের হটিয়ে দেই। এ সংঘর্ষ প্রায় দু'দিন চলে। আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যেকোনো অবস্থাতেই আমরা আমাদের ঘাঁটি ছাড়বো না। শত্রুসেনাদের যথেষ্ট হতাহত হচ্ছিল প্রতিদিনই, কিন্তু তারাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমাদের এ অবস্থানটি দখল করার জন্য। তাদের কামানের গোলায় আমাদের পজিশনটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু তবুও আমাদের সৈনিকরা আত্মবিশ্বাস হারায়নি। আমাদের অবস্থানটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আগরতলা বিমানবন্দরের বেশ নিকটেই ছিল। এর ফলে পাকি বাহিনীর কামানের গোলার ইসপ্লিনটার মাঝে মাঝে বিমানবন্দরের গিয়ে পড়ছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আমাদের এ অবস্থানটি থেকে যুদ্ধ আরো চালিয়ে যাওয়ার আপত্তি করে। তাদের বিমান বন্দরের ক্ষতি হওয়ার আশংকায় এ আপত্তি করে। আমরা নিরুপায় হয়ে দীর্ঘ দেড় মাস যুদ্ধ চালানোর পর আজমপুর অবস্থান পরিত্যাগ করে সিঙ্গারবিলে নতুন অবস্থান গড়ে তুলি।

মেজর খালেদ মোশার্‌রফের কাছে একটা সিগনাল সেট ব্রিগেড-হেডকোয়ার্টার থেকে দিয়েছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, আমার সেট এবং খালেদ মোশার্‌রফের সেট যেন একই ফ্রিকুয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। ২৪/২৫ তারিখ সকালে তিনি তার কোম্পানি নিয়ে শমশেরনগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কুমিল্লা থেকে নির্দেশ এল যে, আরো লোক আসছে। তাদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করলাম কিন্তু আমরা জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার সময় দেখলাম যে, লে. কর্ণেল মালিক খিজির হায়াত খান কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানিগুলো নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন, যুদ্ধ আসন্ন। সেজন্য ব্রিগেড কমান্ডার তাকে কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গলের প্রায় সব লোক নিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

খিজির হায়াত খানের আসার পর চতুর্থ বেঙ্গলের অবস্থান নিম্নরূপ ছিল :

(ক) এক কোম্পানি শমশেরনগরে- যার কমান্ডার মেজর খালেদ মোশার্‌রফ।

(খ) তিন কোম্পানি-হেডকোয়ার্টার কোম্পানির আর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে।

(গ) ৭০৮০ জন লোক কুমিল্লায় ইউনিট লাইন-এর প্রহরায় নিয়োজিত।

(ঘ) এক প্লাটুন কুমিল্লার জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ গ্রিড স্টেশনের প্রহরায়। এর কমান্ডার ছিল নায়েব সুবেদার এম, এ, জলিল।

খিজির হায়াত খান ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেই ২৫শে মার্চ রাত এগারটায় আমাকে হুকুম দিলেন, আমি যেন আমার কোম্পানির সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১৩ মাইল দূরে শাহবাজপুর পুলের কাছে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করি। ফলে রাত দুটার সময় রওনা হয়ে আমরা তিনটায় শাহবাজপুরে পৌঁছি।

সকাল ছটার সময় (২৬শে মার্চ) আবার খবর আসল, কোম্পানি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফেরত যেতে হবে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

সকাল সাতটায় রওনা হয়ে দশটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছি। ফেরার সময় দশ মাইল আসতে তিন ঘণ্টা লাগে; কেন না জনসাধারণ বড় বড় গাছ রাস্তার উপর ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সেখানে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার সাথে সাথে খিজির হায়াত খান আমাকে পুলিশ লাইনে গিয়ে পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, নিরস্ত্র করতে গেলে খামাখা গণ্ডগোল গোলাগুলি হবে। তার চেয়ে আমি নিজেই গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার অঙ্গীকার করলাম।

খিজির হায়াত খান প্রথমত চেয়েছিলেন যে, মেজর সাদেক নেওয়াজ গিয়ে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে পুলিশদের নিরস্ত্র করুক। আমি অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য খিজির হায়াত খানের কাছে মিথ্যা অঙ্গীকার করলাম যে, আমি নিজে গিয়ে পরদিন ওদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসব। তিনি আমার কথায় রাজি হলেন।

২৬শে মার্চ বেলা বারটার সময় চতুর্থ বেঙ্গলের সিগনাল জেসিও নায়েব সুবেদার জহীর আমাকে বললেন যে, তিনি অয়ারলেস ইন্টারসেপ্ট করে দুটো স্টেশনের মধ্যে এই কথোপকথন শুনেছেন। তাকে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

ইন্টারসেপ্টেড মেসেজগুলো ছিল : (1) Send tank ammunition (2) Send helicopter to evacuate casualities (3) 50 boys of east bengal Regimental Centre have deserted.... some with weapon and some without weapon.

এ সমস্ত মেসেজ পেয়ে আমার জুনিয়র অফিসাররা যথাক্রমে লে. হারুন, লে. কবীর, লে. আখতার খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন আমি সিগনাল সেটে গিয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগ করি এবং অল্প চেষ্টায় তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ হয়ে যায়। আমি তাঁকে চোস্ত ঢাকাইয়া বাংলায় ওই মেসেজগুলো শোনাই এবং তাঁর মতামত জানতে চাই। তাঁকে আরও বলি যে, আমরা তৈরি এবং তাঁকে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোম্পানি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। আমার সাথে যখন খালেদ মোশাররফের কথোপকথন হচ্ছিল তখন সাদেক নেওয়াজ, লে. আমজাদ সাইদ এবং খিজির হায়াত খান আমাকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই জন্য খুব বেশি কথাবার্তা চালানো সম্ভব হয়নি এবং খালেদও শমশেরনগর থেকে বেশি কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে, তিনি রাতের অপেক্ষায় আছেন।

তারপর থেকেই আমার জুনিয়র অফিসাররা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল। আমি ব্যাটালিয়নের অন্যান্য কয়েকজন জুনিয়র অফিসারের মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম। কেন না, সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত এবং তা' সময়োপযোগী না হলে সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে এবং নিজেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হতাহত হবে। আমি অন্তত একজন অফিসার এবং একজন জেসিওকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সারারাত সময় দেই। সন্ধ্যার সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সৈনিকদের ক্যাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে দেখা মাত্রই বেশ কয়েকজন সৈনিক যাদের মধ্যে কয়েকজন এনসিও ছিলেন, আমাকে ঘিরে ধরেন এবং বলেন যে, "স্যার দেশের মধ্যে যে কী হচ্ছে তা আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন। আমরা অফিসারদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আপনাদের যে কোনো নির্দেশ আমরা জীবন দিয়ে পালন করতে প্রস্তুত। আপনারা যদি বেশি দেরি করেন, তবে হয়ত আমাদের কাউকে পাবেন না। আমরা আগামীকালের পরেই যে যার বাড়ির দিকে রওনা হব। কিন্তু সঙ্গে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাব।"

সৈন্যদের এই মনোবল ও সাহস দেখে আমি খুব গর্বিত এবং আশান্বিত হলাম। ফলে দু'একজন অফিসার ও জেসিও'র দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাকে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা থেকে বিরত করতে পারে নাই। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এরপর চেষ্টা সত্ত্বেও দুপুরের পরে খালেদ মোশাররফের সাথে আমি কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি।

২৬শে মার্চ সন্ধ্যার পরে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনে আমার বাঙালি জুনিয়র অফিসাররা আরো উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওরা আমাকে তক্ষুণি অস্ত্র হাতে তুলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি রাতে আমার তাঁবুতে অবস্থান করলাম। সারারাত সাদেক নেওয়াজ এবং লে. আমজাদ আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গজ দূর থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমার অজ্ঞাতেই তিন-চারজন এনসিও (শহীদ হাবিলদার বেলায়েত হোসেন, শহীদ হাবিলদার মইনুল,

হাবিলদার শহীদ মিয়া এবং হাবিলদার ইউনুস) সারারাত আমাকে পাহারা দেয়– যাতে ওই দু'জন পাঞ্জাবি অফিসার আমার উপর কোনো হামলা করতে না পারে। পাঞ্জাবি অফিসাররাও সারারাত সজাগ ছিল।

২৭শে মার্চ সকাল সাতটায় লে. আখতারকে আমি সাদেক নেওয়াজের কক্ষে পাঠাই। আখতারকে বলা হয়, যখন সাদেক নেওয়াজ মেসে আমাদের সাথে নাস্তা করতে আসবে সেই ফাঁকে যেন তার স্টেনগান এবং ৮ ম্যাগাজিন গুলি অন্যত্র সরিয়ে রাখে। আমার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপাতহীন একটা অ্যাকশন পরিচালনা করা। কিছুক্ষণ পর আমি, লে. হারুন আর লে. কবীর দুই জন এনসিও সাথে করে অফিসার মেসের দিকে যাই। অফিসার মেসে পাঞ্জাবি অফিসারদের সাথে আমরা ব্রেকফাস্টে মিলিত হই। এনসিওদের নির্দেশ দিই যে, আমাদের রক্তপাতহীন অ্যাকশনের সময় যদি কোনো বাঙালি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকেও যেন গুলি করে হত্যা করা হয়।

আমরা সকাল ৭-২০ মিনিটে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছি। এমন সময় একজন জেসিও খিজির হায়াত খানকে বলল যে, সাদেক নেওয়াজের কোম্পানিতে একটু মনোমালিন্য হয়েছে সুতরাং খিজির হায়াতকে সাদেক নেওয়াজের কোম্পানিতে এক্ষুণি যেতে হবে। একথা শোনা মাত্র খিজির হায়াত খান তক্ষুণি সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির কাছে যেতে উদ্যত হলো। আমি তাকে বাধা দিলাম এবং বললাম যে, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। চলুন প্রথমে আমরা অফিসে যাই। ওখানে আলাপ-আলোচনার পর আমরা সবাই একসঙ্গে সাদেক নেওয়াজের কোম্পানিতে যাব। খিজির হায়াত এতে রাজি হলেন। সাদেক নেওয়াজ তখন তার স্টেনগান আনার জন্য তার কক্ষে যেতে উদ্যত হয়। আমি আবার বাধা দেই এবং বলি যে আমার স্টেনগানটা সে যদি চায় তবে সে সঙ্গে নিতে পারে। এতে সে আশ্বস্ত হয় এবং আমরা সবাই অফিসে যাই। একটা তাঁবুতে অফিস করা হয়েছিল। এই তিনজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার তাঁবুতে ঢোকা মাত্রই লে. কবীর আর লে. হারুন তাঁবুর দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এসময় আমি আমাদের সকলের আনুগত্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ঘোষণা করি এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাদের পাকিস্তানি অফিসারদের বলি যে তারা আমাদের বন্দি। তাদের জীবনের দায়িত্ব আমাদের এবং তারা যেন কেউ কোনো বাঙালি অফিসার, জে সি ও, এন সি ও- এর সাথে কোনো কথা না বলে। বলাবাহুল্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানি ১২/১৫ জন সৈনিক যারা চতুর্থ বেঙ্গল-এর সাথে ছিল আমার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই প্রায় একই সময়ে বাঙালি সৈন্যরা তাদের বন্দি করে এক জায়গায় রাখে। বিনা রক্তপাতে আমাদের অ্যাকশন সম্পন্ন হয় এবং চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় সব কটা কোম্পানি তার সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন, রসদপত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২৭শে মার্চ সকাল দশটার দিকে প্রায় ১০/১৫ হাজার উল্লসিত জনতা আমাদের ক্যাম্পে চলে আসে এবং 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানায়। অস্ত্রধারণ করার পর দেখতে পেলাম আমার বেশ কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনের দরুণ কয়েক জনের ১০২ থেকে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর পর্যন্ত হয়েছিল। কয়েক জন আবোল-তাবোল বকছিল। দুই জন অফিসারকে বেশ কয়েকদিন আর চোখে পড়েনি। আমি নিজেও একটু অস্থির প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলাম।

সকাল ১১টার দিকে আমি সব কোম্পানিকে নির্দেশ দিলাম, তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের চারপাশের গ্রামগুলোতে যেন অবস্থান নেয়, যাতে করে পাকিস্তানি বিমান হামলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে আমাদের ব্যাটালিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারিপার্শ্বের গ্রামে গোপনে অবস্থান নেয়। বেলা আড়াইটার সময় মেজর খালেদ মোশর্‌রফ তাঁর কোম্পানি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড অতিক্রম করে আসার ফল তাঁর দেরি হয়েছিল। তিনি আসা মাত্রই আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্ত এলাকা তাঁর কাছে হস্তান্তর করি। এরপর থেকে তাঁর নির্দেশে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

কুমিল্লা সেনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোক ছিল তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদেরকে ২৭শে মার্চ বলতে পারিনি যে, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যা হোক, কর্ণেল খালেদ মোশার্‌রফ ২৯শে মার্চ জাঙ্গালিয়াতে আমাদের বিচ্ছিন্ন প্লাটুনের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং তাঁদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জানান এবং নির্দেশ দেন, জাঙ্গালিয়া থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাটালিয়নে যোগদান করতে।

আমরা পরে জানতে পেরেছি যে, কুমিল্লা সেনানিবাসে আমাদের যে সমস্ত লোকজন ছিল তাঁরা ২৯শে মার্চ আমাদের সংগ্রামের কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে তাঁরা কোনো অ্যাকশন নিতে পারেনি। ৩১শে মার্চ বিকাল চারটার সময় সেনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭০/৮০ জন সৈনিকের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা চারিদিক থেকে হামলা করে এবং প্রায় ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর আমাদের চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিট লাইন দখল করে। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের ৮/১০ জন জওয়ান শহীদ হন। এই যুদ্ধে নায়েব সুবেদার এম, এ, সালাম অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জাঙ্গালিয়াতে যে প্লাটুন ছিল সেটা ২৯শে মার্চ বের হয়ে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেয় এবং কুমিল্লা-লাকসাম রোডে নায়েব সুবেদার এম, এ, জলিলের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সাফল্যজনক অ্যামবুশ করে।

কুমিল্লা-নোয়াখালীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ : মেজর গাফ্‌ফার

আমি মনে করছিলাম কুমিল্লা ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ইকবাল মো. শফি আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে দিয়ে ধ্বংস করে দেবে। সেহেতু ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি কোম্পানিকে বাইরে পাঠিয়ে সিলেটে অবস্থানরত ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দিয়ে এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন দিয়ে আক্রমণ ও ঘেরাও করিয়ে অবশিষ্টদের ধ্বংস করা হবে। ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট খুবই শক্তিশালী থাকায় এদের বিভক্ত করে দিয়ে ধ্বংস করাই তারা শ্রেয় ভেবেছিল। তারা এ কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করার আয়োজন করেছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাদের পরিকল্পনা সফল হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে অন্যান্য কোম্পানির সাথে যোগ দেয়া শ্রেয় মনে করি। আমি ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম কমান্ড অবাঙালি লে. কর্ণেল খিজির হায়াতকে বুঝাতে থাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে অন্যান্য কোম্পানির সাথে মিলিত হবার জন্য। তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন এবং আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। তিনি আমার কথায় কনভিন্সড হন এবং নির্দেশ নেবার জন্য ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে যান। ফলে ব্রিগেড কমান্ডার তাঁকে তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার নির্দেশ দেন। লে. কর্ণেল খিজির হায়াত ফোনে আমাকে ২৩শে মার্চের ১টার মধ্যে বাকী কোম্পানি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। আমি দ্রুততার সঙ্গে ৩০টি ৩ টনের গাড়িতে বেশি পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হই। আমি একটি প্লাটুন জাঙ্গালিয়াতে রেখে যাই এবং আরেকটা প্লাটুনকে ভিতরে রেখে যাই ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত বাঙালি অফিসারদের পরিবার-পরিজনের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য। আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে পারিনি। কেননা এটা করলে আমাদের উপর তাদের সন্দেহ হতো এবং আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত। যাবার আগে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের (বর্তমানে মেজর) সাথে কথা বলি এবং তাকে অনুরোধ করি আমাদের পরিবারগুলোর প্রতি খেয়াল রাখার জন্য এবং সম্ভব হলে নিরাপদ জায়গায় যেন সরিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনকে এসময় চট্টগ্রামে নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলী করা হয়েছিল। আমরা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে যাই। ২৮শে মার্চ ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের সাথে এসে যোগ দেন।

৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জড়ো করার জন্য আমি লে. কর্ণেল খিজির হায়াতকে নির্দেশ দেবার অনুরোধ করি। তিনি আমার কথামতো সবাইকে

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আসার নির্দেশ দেন। একমাত্র শমশেরনগরে অবস্থিত মেজর খালেদ মোশাররফের বাহিনী ছাড়া সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসে।

২৪শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম সি এ জনাব লুৎফুল হাই আমার সঙ্গে দেখা করে জানতে চান আমরা কী করব। আমি তাকে বলি, ঠিক সময়ে আমরা আমাদের কর্তব্য সাধন করব। তিনি চলে যাবার পর আমাদের ব্যাটালিয়নের পাঞ্জাবি অফিসাররা এসে জিজ্ঞেস করে লুৎফুল হাই কেন এসেছিল। আমি তাদের বলি, সে আমার আত্মীয় এবং আমার সাথে এমনি দেখা করতে এসেছে। মিথ্যা বলে তাদের সন্দেহ দূর করি। আমি মেজর শাফায়াত জামিলকে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলি। সেভাবেই তিনি সমস্ত বাঙালি অফিসার, জেসিও এবং এনসিওদের নিয়ে একটা সভা ডেকে বলেন, পরিস্থিতি খুব খারাপ- সেহেতু সবাইকে সজাগ এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। ২৫শে মার্চ রাতে আমি মেজর খালেদ মোশার্‌রফের সাথে অয়ারলেসে কথা বলি এবং সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানাই। তিনি বলেন, "আমরা শমশেরনগর থেকে আজ রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পথে অগ্রসর হবো এবং তোমরা যদি পার পাঞ্জাবি অফিসারদের গ্রেফতার করো।"

রাত ২টার সময় লে. কর্ণেল খিজির হায়াত খান, মেজর সাদেক নেওয়াজ, লে. আমজাদ সাইদ এবং অন্যান্য অবাঙালি সৈনিকদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা নিই। সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কেননা মেজর সাদেক নেওয়াজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিএন্ডবি রেস্ট হাউসে আমার রুমে আমার পাশে ভর্তি করা একটা চাইনিজ স্টেনগান নিয়ে সদা প্রস্তুত হয়ে বসেছিল।

২৬শে মার্চ সাড়ে ৯টার সময় সভাকক্ষে সমস্ত অফিসারদের একটি সভা ডাকা হয়। কিন্তু এর আগে ভোর সাড়ে চারটার সময় আমি অয়ারলেস সেটটি ধ্বংস করে দেই। কেননা এ অয়ারলেসের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কুমিল্লা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের কথাবার্তা হতো। সমস্ত টেলিফোন যোগাযোগও নষ্ট করে দিলাম। আমাকে এটা করতে হয়েছিল। কেননা অয়ারলেস অপারেটরদের তিন জনের মধ্যে দুই জনই পাঞ্জাবি ছিল। অয়ারলেসের মাধ্যমে শেষ যোগাযোগ করি মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে। তাঁকে অনুরোধ করি অতি সত্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য।

আমরা সবাই তাঁবুতে এসে জড়ো হই। সকাল সাড়ে ৯টার সময় মেজর শাফায়াত, লে. কবির, লে. হারুন, আমি ও জেসিও'রা তাঁবু ঘিরে ফেলি। আমরা বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করি এবং মেজর শাফায়াত জামিল তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা আর পাকিস্তানি সৈন্য নই, আমরা এখন বাংলাদেশ সরকারের সৈনিক। আপনারা আমাদের বন্দি। পালাবার চেষ্টা করবেন না, করলে মারা যাবেন।" মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ঘটে যায়। ৭২ জন পাকিসেনাকে হত্যা এবং তিন জন পাকিস্তানি সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করে ২৬শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করি।

মেজর খালেদ মোশার্‌রফ এবং লে. মাহবুব ২৬শে মার্চ রাত সাড়ে ১১টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছেন। মেজর খালেদ মোশাররফের হাতে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দেয়া হয়। এরপর মেজর খালেদ আমাদের সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারপাশে অবস্থান নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ার নির্দেশ দেন। কেননা, শত্রুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণ করে আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের হেডকোয়ার্টার করা হয়।

আমাকে ১৮ জন সৈন্য নিয়ে গোকনঘাটে পাঠানো হয়। ঢাকা থেকে ভীতসন্ত্রস্ত জনতা পালিয়ে আসতে থাকে। আমি দুই দিনের মধ্যে ২৫০ জন পলায়নপর পুলিশ এবং ইপিআর নিয়ে একটা কোম্পানি তৈরি করে ফেলি। তৃতীয় দিনে পাকি বিমানবাহিনী ৪টা স্যাবর জেটের সাহায্যে আমার এলাকায় স্ট্রাফিং করতে থাকে। এতে আমার বাহিনীর এক জন শহীদ ও এক জন আহত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্থলপথে কোনো আক্রমণ তখনও শুরু হয়নি।

২৭শে মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানিরা আমাদের পরিবারের সমস্ত সদস্যদের গ্রেফতার করে এবং অমানুষিক অত্যাচার চালায়। উল্লেখ্য যে, সুদীর্ঘ ৯ মাস পর ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর আগমনে এঁরা মুক্তি লাভ করে।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার কোম্পানিকে ৩০৩ রাইফেলের দ্বারা সজ্জিত করে ফেলি। ৫ই এপ্রিলে মেজর খালেদ মোশার্‌রফ আমাকে আমার বাহিনী ক্যাপ্টেন মাহবুবের (পরে শহীদ হন) হাতে দিতে বলেন। তিনি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তাঁর হাতে দায়িত্ব দিয়ে আমি ৫ই এপ্রিল সকাল ৯টার সময় অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে মেজর মোশার্‌রফের কাছে যাই।

মেজর খালেদ মোশার্‌রফ আমাকে বলেন, ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেট থেকে নদীপথে ভৈরব হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছে। সেজন্য ৪র্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানি নিয়ে আজবপুর ঘাটে পজিশন নিয়ে শত্রুদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা ঢাকা যাবার পথে বাধা দিতে হবে। সেইমতো আমি তাড়াতাড়ি আজবপুর ঘাটে যাই এবং সন্ধ্যার মধ্যেই পজিশন নিয়ে নেই। এখানে এসে আমি ২য় বেঙ্গল-এর ক্যাপ্টেন নাসিমের (বর্তমানে লে. কর্ণেল) সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আশুগঞ্জ এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর কাজী মো. শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ময়মনসিংহ হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে তিনি আমাদের সাথে যোগ দেন। আমরা সে সময় বিরাট এলাকা কোম্পানিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটের খোয়াই নদী পর্যন্ত শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন রেখেছিলাম।

৭ই এপ্রিলে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম, শত্রুরা বড় নৌকা ও লঞ্চের সাহায্যে পালাবার চেষ্টা করবে। সেহেতু আমি সমস্ত নৌকা তল্লাশি করার নির্দেশ দেই। অতি প্রত্যুষে একটা মোটর লঞ্চ আশুগঞ্জের দিকে

যাচ্ছিল। আমি তাদের থামতে বলি। লঞ্চটি না থেমে বরঞ্চ আরও দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। ওর ভিতর পাঞ্জাবি সৈন্য আছে ধরে নিয়ে আমরা এম-এম-জি ও ৭৫এম-এম আর আর-এর সাহায্যে গুলি ছুঁড়তে থাকি। লঞ্চটি থেমে যায় এবং আশ্চর্যের ব্যাপার লঞ্চটি বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা ভর্তি দেখলাম। একজন এতে আহত হয়। তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে সারেংকে সাবধান করে ছেড়ে দেই। ঠিক এমনি সময় পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান আমাদের উপর অকস্মাৎ হামলা শুরু করে।

৩/৪ দিন পর ক্যাপ্টেন মতিন (বর্তমানে মেজর) একটি কোম্পানি নিয়ে এসে আমাদের অব্যাহতি দেন। আমি আমার বাহিনী নিয়ে তেলিয়াপাড়া যাই পরবর্তী নির্দেশের জন্য। পরের দিন সকালে একটি কোম্পানি নিয়ে আমাকে বিবিরবাজার যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। দুইদিন বিবিরবাজারে অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে ৪র্থ বেঙ্গলের 'সি' কোম্পানিকে নিয়ে মনতলি যাবার নির্দেশ দেন মেজর খালেদ মোশার্‌রফ।

১৪ই এপ্রিল প্রথম সাফল্যজনক আক্রমণ চালাই শত্রুর বিরুদ্ধে। এদিন রাতে গঙ্গাসাগরে ৪টা প্লাটুন ও একটা তিন ইঞ্চি মর্টার সেকশনের সাহায্যে শত্রু অবস্থানকে ঘিরে আক্রমণ চালাই। মেজর খালেদ মোশার্‌রফ মর্টার সেকশনে নিজে থেকে নেতৃত্ব দেন। তার উপস্থিতি আমার সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। রাত ২টার সময় শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ৩১জন শত্রু সৈন্য ও ১৫/২০ জনকে আহত করি। আমরা সবাই নিরাপদে ফিরে আসি। দুই জন সামান্য আহত হয়।

চারদিন সেখানে অবস্থানের পর আমাকে কসবা শালদা নদী এলাকায় যেতে বলা হয়। ১৮ই এপ্রিল আমি কসবার পথে রওনা হই এবং সেখানে ঘাঁটি গড়ে তুলি। গঙ্গাসাগরে শত্রুদের মার দেবার পর কসবা-শালদা নদীর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়। এর আগেই শত্রুরা কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশনে ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। আমি আমার ক্যাম্প ইয়াকুবপুর-জাতমুড়া এলাকায় স্থাপন করি। আমি রেকি করে বুঝতে পারি আমার অবস্থান খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। ভারতে আশ্রয় না নিয়ে নিজ অবস্থানে থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকি। পাকিসেনারা কসবা এসে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চালাতে থাকে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার লোক পাকিসেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাচ্ছিল।

১৮ই এপ্রিলের রাতেই আমি কসবা বাজার ও কসবা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করার পরিকল্পনা করি। তিন ইঞ্চি মর্টারের সাহায্যে হঠাৎ করে শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করে দেই। শত্রুরা যেহেতু প্রস্তুত ছিল না, সেহেতু তারা এ আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ে। এ প্রত্যাশিত যুদ্ধ দেড় ঘণ্টা ধরে চলে এবং এর

সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল। শত্রুরা তখন পর্যন্ত কোনো বাংকার তৈরি করেনি। ফলে তারা গাড়ি বোঝাই অস্ত্র ফেলে রেখে বাজারের কুঁড়েঘর এবং দোকানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

রাত সাড়ে চারটায় আবার আক্রমণ করার সময় হিসাবে বেছে নেই। আমি একটা লম্বা গাছের উপরে উঠে শত্রুদের অবস্থান দেখে নেই এবং আমার সৈন্যদের প্লাটুনে ভাগ করে তিনদিক দিয়ে ঘিরে ফেলি। একটি মাত্র পথ শত্রুদের খোলা থাকে। এরপর রকেট লাঞ্চার এবং ছোট অস্ত্র ও মর্টারের সাহায্যে শত্রুদের উপর গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকি। এই গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুদের ৭টা গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ৪৫/৫০ জন নিহত এবং ৭০/৮০ জন পাকিসেনা আহত হয়। শত্রুরা এ আকস্মিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে কসবা ছেড়ে আড়াইবাড়ি কুটির দিকে পালিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে অবস্থান নেয়। যাবার সময় তারা বিধ্বস্ত গাড়ি ও অনেক মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

এ যুদ্ধ জয়ের ফলে আমার সৈন্যদের মনোবল বেড়ে যায়। কসবা নতুন বাজার দখল করার পর আমার হেডকোয়ার্টার কসবাতেই স্থাপন করি। অবশ্য আমি জানতাম, শত্রুরা কসবা দখল করার জন্য আবার বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

জুন মাসে মেজর খালেদের নির্দেশে মুন্সিরহাট, ফেনী, নোয়াখালী এলাকায় যাই। যাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা কসবা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যাপক বিপর্যয়ের পর শত্রুসেনারা স্থানীয় দালালদের সহযোগিতা ছাড়া বাংকার থেকে বের হতো না।

সাক্ষাৎকার : ২১-৮-১৯৭৩

কুমিল্লার সশস্ত্র প্রতিরোধ :
মেজর আইনউদ্দিন

একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত ১২টার দিকে কুমিল্লা পুলিশ ক্যাম্প পাঞ্জাবিরা আক্রমণ করে এবং গণহত্যা সংগঠিত করে। ২৫শে মার্চ রাতে তারা এসপি ও ডিসি'কে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে। সে সময় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম। ২৬শে মার্চ সকালে আমি যখন আমার বাসার বারান্দায় বসেছিলাম, তখন গাড়িতে করে কিছু সাদা পোশাক পরা লোককে ধরে আনতে দেখি। ওই দিন আমাকে মেজর জামিল (অবাঙালি) নির্দেশ দিয়েছিলেন 'তোমাকে রাতে অয়ারলেসে ডিউটি করতে হবে'। আমি রাত ১১টার দিকে যখন ডিউটিতে ছিলাম তখন সিলেট থেকে বেলুচ রেজিমেন্ট-এর পাঞ্জাবি সি-ও অয়ারলেসে কথা বলে। সে সময় আমি বুদ্ধি করে নিজের নাম ও পদ গোপন করে একজন

পাঞ্জাবির নাম করে অয়ারলেসে কথা বলি। বেলুচ রেজিমেন্টের সি-ও-র কথায় বুঝতে পারলাম যে, শ্রীমঙ্গলে যে সমস্ত বাঙালি সৈন্য ছিল (খালেদ মোশার্‌রফ সাহেব তখন শ্রীমঙ্গলে ছিলেন) তাদের আক্রমণ করবে, তার জন্য বেলুচরা রেকি করেছে। আমি কী ভাবে এ সংবাদ শ্রীমঙ্গল পাঠাবো তার চেষ্টা করি। কিন্তু ইতিপূর্বে বাঙালিরা টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়ায় এই জরুরি সংবাদটি শ্রীমঙ্গল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খালেদ মোশার্‌রফ সাহেব খবর না পেলে শ্রীমঙ্গল থেকে তাঁর দলসহ সরে পড়েছিলেন।

২৭ তারিখে আমি সাধারণ পোশাক পরে আমার সৈন্যদের এ মর্মে নির্দেশ দেই যে, যদি আমি রাত ১২টার ভিতর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ফিরে না আসি, তবে যেন তাঁরা হাতিয়ার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে একটি জায়গায় অপেক্ষা করে। নির্দিষ্ট জায়গাটি আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম। এরপর আমি ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করি।

আমি সাধারণ পোশাক পরে একখানা সাইকেলে চড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হই। দুপুর একটার দিকে পথে দেখলাম পাঞ্জাবি সৈন্যরা ট্রেঞ্চ কাটছে। কিন্তু তারা আমাকে চিনতে পারেনি। এরপর পথিমধ্যে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তায় কংশনগর বাজারে কিছু বাঙালি আমাকে আটক করে। আমি আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাদের বুঝাই যে, আমি বাঙালি একজন ক্যাপ্টেন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাচ্ছি। অনেক তথ্য-প্রমাণ দেয়ার পর তারা আমাকে মোটর সাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পৌঁছিয়ে দেয়। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাত দেড়টার সময় পৌঁছাই। আমি পৌঁছে দেখি সমস্ত পাঞ্জাবি সৈন্যকে বাঙালিরা গ্রেপ্তার করে ফেলেছে এবং ছোটখাট সৈন্যদের বাঙালি সৈন্যরা মেরে ফেলেছে।

আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাই তখন করোলা ব্রিজের কাছ দিয়ে একটি জিপ যেতে দেখি। জিপটিকে আমি থামালাম। ওই জিপে কয়েকজন বাঙালি সৈন্য এবং একজন ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসান (পাঞ্জাবি) ছিল। আমি দূর থেকে বাঙালি সৈন্যদের ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসানকে গ্রেপ্তার করতে বলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালি সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ক্যাপ্টেন কৌশলে গাড়ি ব্যাক করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ২৮ তারিখে ওই ক্যাপ্টেন যখন বিকালে পুনরায় কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আসছিল তখন করোলা ব্রিজের কাছে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। গাড়িতে তিনজন সৈন্য ছিল। তার ভিতর একজন বাঙালি সৈন্য মারা যায় ও দু'জন আহত হয়। ওই ক্যাপ্টেন মুসলমান ছিল বলে বাঙালিরা দয়া পরবশ হয়ে তার মৃতদেহ মুসলমান কায়দায় রাত আড়াইটায় কবর দেয়। এ ধরনের কবর দেয়া ছিল প্রথম ও শেষ। তারপরে আর কোথাও মৃতদেহকে মুসলিম কায়দায় কবর দেয়া হয়নি। (শত্রুদের আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়া নাকি জেনেভা কনভেনশনে আছে।)

২৮ তারিখে আমি চার জন অফিসারসহ অন্যান্য সৈন্য নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডিফেন্স নেই। ২৭ তারিখে রওনা হয়ে খালেদ মোশাররফ সাহেব শ্রীমঙ্গল থেকে পুরা কোম্পানি নিয়ে ২৮ তারিখ সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছান। পৌঁছেই আমাকে এমর্মে নির্দেশ দেন, যদি কোনো এম এন এ বা কোনো বুদ্ধিজীবী আসেন, তাহলে তাদের আমার (খালেদ মোশাররফ) সাথে যোগাযোগ করার জন্য যেন সিলেট তেলিয়াপাড়া টি-এস্টেটে পাঠিয়ে দেয়া হয়। খালেদ মোশাররফ সাহেব ২৮ তারিখেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট-এর তেলিয়াপাড়া টি এস্টেটে চলে যান। তেলিয়াপাড়ায় খালেদ মোশাররফ সাহেব ক্যাম্প খোলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল এবং স্থানীয় প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলে। ওই সময় এস ডি ও ছিলেন রকিব উদ্দীন আহমদ। তিনি তখন স্থানীয় প্রশাসক নিযুক্ত হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে রক্ষা করার জন্য গোকনঘাটে ক্যাপ্টেন আবদুল গাফ্ফার, ক্যাপ্টেন শহীদ ও মাহবুবুর রাহমানকে ওই ঘাট দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। কারণ ওই নদীপথে পাক সৈন্যরা জাহাজে করে সৈন্য আনতে পারত। গোকনঘাট ছিল একটি লঞ্চঘাট। সৈন্যরা করোলা নদীর আশেপাশে ডিফেন্স নিয়েছিল। তাঁদের তত্ত্বাবধান করেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুনর রশীদ।

২৯ তারিখে বিকাল ৪টার দিকে পাকিবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান থেকে দেড়-দু'ঘণ্টা ধরে বোমাবর্ষণ করে। এর ফলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈন্য শহীদ হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে তেমন কোনো অস্ত্র না থাকায় শুধু ট্রেঞ্চের ভিতর বসে থাকতে হয়।

৩১ তারিখে আখাউড়া থেকে তৎকালীন ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর) নায়েক সুবেদার গোলাম আম্বিয়া আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি আখাউড়াতে ডিফেন্স নিয়েছিলেন। আখাউড়াতে ইপিআর-এর সৈন্যরা পাঞ্জাবিদের ঘেরাও করে রাখে। তারপর ৩১ তারিখে সারাদিন গোলাগুলি হওয়ার পর কিছু পাঞ্জাবি সৈন্য মারা যায়। অবশ্য ৭ জন পাঞ্জাবি সৈন্য পালিয়ে গেলে পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরা এদের হত্যা করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে সমস্ত পাঞ্জাবি অফিসার ধরা পড়ে তারা হলো :

১. লে. কর্ণেল খিজির হায়াত খান

২. মেজর সাদেক নেওয়াজ

৩. লেফটেন্যান্ট আমজাদ সাইদ

এদেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নবীনগর, শাহবাজপুর, সরাইল হয়ে তেলিয়াপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ভারতীয় সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এদের বাঙালিরা হত্যা করতে পারত। কিন্তু এই পাঞ্জাবি অফিসাররা কোনোদিন বাঙালিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি বা বেঈমানি করেনি।

১লা এপ্রিল ’৭১ আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আখাউড়া যাই। ইপিআর সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা বললেন যে, আমার সাথে (মানে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে) একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে। ওরা আমার কাছে কিছু অস্ত্র চাইলে, আমি অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি হই। এরপর ইপিআর- এর সৈন্যরা আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ও উজানীসাহা ব্রিজের আশেপাশে ডিফেন্স নেয়। আমি আগরতলায় বিএসএফ-এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করি এবং তাদের কাছে কিছু অস্ত্র চাই। তারা সম্মত হন। রাতে লে. কর্ণেল দাসের সাথে ফোনে যোগাযোগ করি।

১/২ তারিখে আমি আখাউড়ার আওয়ামী লীগের সহসভাপতিকে সঙ্গে করে আগরতলা যাই। তাঁর সাথে আগরতলায় বিএসএফ-এর লে. কর্ণেল দাসের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। মি. দাস ১০ হাজার গুলি ও একশত ৩০৩ রাইফেল ও কিছু এক্সপ্লোসিভ দিতে অঙ্গীকার করেন এবং পরে তিনি তা সরবরাহ করেন। এ অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে যে কন্ট্রাক্ট হয়, সে কন্ট্রাক্ট করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম এন এ আলী আজম সাহেব। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম এন এ আলী আজম ও লুৎফুল হাই সাচ্চু সাহেব বেঙ্গল রেজিমেন্টের খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি ইত্যাদি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়। জনাব আলী আজম ৩০ তারিখের পূর্বেই আগরতলা গিয়ে অস্ত্রের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মেজর হাবিবুল্লাহ বাহার (যিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন), ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার—কমান্ডিং অফিসার (তিনি কুমিল্লা থেকে পালিয়ে আসেন) এবং ক্যাপ্টেন সায়গলকে (যে পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে) তেলিয়াপাড়া ক্যাম্পে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমি যখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা দেই, তখন যে প্রায় একশত বাঙালি সৈন্য রেখে আসি, তাঁরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বেপরোয়া হয়ে পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে প্রায় ৩/৪ শত পাঞ্জাবি সৈন্য মারা যায়। কিছু বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য শহীদ হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি ১৫/২০ জন এম পি এ কে ভারতে পাঠিয়ে দেই। এপ্রিল মাসে আমি জানতে পারি যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ভৈরব এসেছেন। সৈয়দ সাহেবকে এমর্মে জানাই যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে আছে। আমি সৈয়দ সাহেবকে আনার জন্য স্পিডবোট পাঠাতে চাইলে তিনি আসতে রাজি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আসেননি। এ সময়ের মধ্যে আমি বিভিন্ন জেলায় অয়ারলেসের মাধ্যমে খবর নিতে লাগলাম যে, কোথায় কোথায় বাঙালিরা রিভোল্ট করল। আমি জানতে পারলাম ময়মনসিংহে মেজর সফিউল্লাহ আছেন ও নরসিংদিতে একটি কোম্পানি আছে মেজর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে। মেজর সফিউল্লাহ্ একটি পরিকল্পনা

করেন যে, মেজর মতিউর রহমানের বাহিনী ও তার কোম্পানি মিলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবে এবং দখল করবে। এ সংবাদ আমি মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবকে জানাই। তিনি এ খবর পেয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে আসেন এবং মেজর সফিউল্লাহকে ফোনে বলেন যে, তারা যেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন। এখানে একত্র হয়ে তারা সবাই মিলে যুক্তি করে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। পরে সফিউল্লাহ সাহেব পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে চলে আসেন এবং মেজর মতিউর রহমান সাহেব ভৈরব ব্রিজের কাছে ডিফেন্স নিয়ে থাকেন।

এদিকে মেজর নাসিম এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আশুগঞ্জে ডিফেন্স নেন ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ছিলাম আমি, ভৈরবে ছিলেন মেজর মতিউর রহমান এবং আশুগঞ্জে ছিলেন মেজর নাসিম। বাকি সবাই তেলিয়াপাড়া চলে যান।

মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একত্রিত হলেন তখন তারা সিদ্ধান্ত আসতে চাইলেন যে, তারা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করবেন। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বিপুল সংখ্যক পাকিসৈন্য রয়ে গেছে। এসব পাকিসৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে পারা যাবে না। উপরন্তু অনেক সৈন্য মারা যাবে। শেষ পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিসেনাদের গেরিলা পদ্ধতিতে ঘায়েল করতে হবে।

১৩ এপ্রিল গঙ্গাসাগরের এক পাড়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অপর পাড়ে পাকিবাহিনী অবস্থান করছিল। ওই দিন বিকাল ৪টা থেকে পাকিবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনী আধ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ করে থেমে যায়।

বিকাল ৬টা থেকে পাকিবাহিনী আবার গোলা ছুঁড়তে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে এবং বহু পাকিসেনাকে খতম করে শেষে পাকিসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে পিছনের দিকে চলে আসে। বাকি ছিল মাত্র সিপাই মোস্তাফা কামাল, সে আর ফিরে আসেনি। তার হাতে ছিল একখানা এল এম জি ও ৮ হাজার গুলি। তার সাথে যে ২ জন সৈন্য ছিল তারাও চলে গেল। কামাল ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে যুদ্ধ করতে থাকে। তার গুলিতে পাকিবাহিনীর তিনজন অফিসার নিহত ও দুই জন আহত হয়। সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিনশ সৈন্য খতম হয়। কামালের গুলি যখন ফুরিয়ে যায়, তখন শত্রুসেনারা মাত্র ৫০ গজ দূরে ছিল; তবু সে পিছনে ফিরে আসেনি।

দূর থেকে পাকিসেনারা চিৎকার করে কামালকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু কামাল তা করে নাই। পরে যখন পাকিসেনারা ক্রলিং করে কামালের ট্রেঞ্চের

কাছে আসে, কামাল তার শেষ সম্বল দু'খানা গ্রেনেড দিয়ে কিছু পাকিসেনাকে খতম করে। তারপর ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে এল-এম জির নাল দিয়ে কিছু পাকিসেনাকে আহত করে। শেষ পর্যন্ত কামাল পাকিসেনাদের কাছে ধরা পড়ে। পাকিসেনারা তাকে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। এ সংবাদ যখন পাকিসেনারা অয়ারলেসে তাদের হেড অফিসে প্রেরণ করছিল তখন বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অয়ারলেসের মাধ্যমে সঠিকভাবে জানতে পারল যে, বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিবাহিনীর সাড়ে তিনশ' সৈন্যকে হত্যা করেছে। এত সৈন্য মরার পর পাকিবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। ফলে পরবর্তী ২/৩ মাস এরা আর আক্রমণ করে নাই।

১৪ এপ্রিল আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্যাংক থেকে (ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক) ম্যানেজারকে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে ব্যাঙ্ক খুলে ২ কোটি টাকা নিয়ে যাই। টাকা ওই দিনই তেলিয়াপাড়ায় মেজর সফিউল্লাহ সাহেবের কাছে জমা দেই। ১৪ তারিখ সারাদিন বিমান আক্রমণ হচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও আমি বীরত্বের সাথে এ কাজ সমাধান করি। আমি বিকালেই তেলিয়াপাড়া থেকে ফিরে এসে দেখি আমার বাহিনী আখাউড়া চলে এসেছে। আমি দু'খানা মূল্যবান অয়ারলেস সেট নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সড়ক পথে তেলিয়াপাড়া হয়ে আখাউড়া চলে আসি।

১৪ তারিখে পাকিসৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান থেকে গুলি করে; ফলে পাবলিকসহ কিছু বাঙালি সৈন্য মারা যায়। এ সংবাদ খালেদ মোশার্‌রফ সাহেব পেয়ে জানালেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে যেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট আখাউড়া চলে আসে। এদিনে পাকিসৈন্য প্যারাট্রুপার ফেলে আশুগঞ্জের পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে মেজর নাসিম সাহেবের কিছু সৈন্য শহীদ হয়। ১৪ তারিখ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বিমান আক্রমণ চলে। এর ফলে আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কোনো রকম টেলিযোগাযোগ বা কোনোরকম যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

১৫ই এপ্রিল মেজর খালেদ মোশার্‌রফ বললেন, তোমাকে আখাউড়ায় সৈন্যদের দেখাশোনা করতে হবে। আখাউড়াতে ৩০/৪০ জন সৈন্য ছিল। আমি ১৫ তারিখে আমার বাহিনীকে বিকালে গঙ্গাসাগরের দিকে মুখ করে ডিফেন্স নেবার কলাকৌশল দেখিয়ে দেই। ১৫ তারিখ রাতে কুমিল্লা থেকে রেলযোগে পাকিসৈন্য গঙ্গাসাগর আসে এবং গঙ্গাসাগরের ব্রিজের দক্ষিণ পাড়ে বাজারের দিকে ডিফেন্স নেয়। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রিজের উত্তর দিকে অর্থাৎ আখাউড়ার দিকে ডিফেন্স নেয়। ১৬ই এপ্রিল সকালে যেখানে ব্রিজের কাছে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ডিফেন্স নিয়েছিল, সেখানে অবস্থানরত সৈন্যদের সাথে দেখা করার জন্য আমি ক্রলিং করে যাচ্ছিলাম। পাকিসৈন্যরা আমাকে দেখে ফেলে এবং অবিরাম

গুলিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু আমি ঝুঁকি নিয়ে ট্রেঞ্চে গিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দেই। পাকিবাহিনীকে হত্যা করে যখন তাদের সংখ্যা কমে আসবে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ট্রেঞ্চের কাছে চলে আসবে, ঠিক তার অল্প কিছুক্ষণ আগে যেন তারা বিওপিতে চলে আসে।

এরপর আমার বাহিনী আখাউড়া বি ও পিতে ডিফেন্স নেয়। আমার অধীনে দু'জন লেফটেন্যান্ট নিয়োগ করা হয়। একজন ক্যাডেট অফিসার হুমায়ুন কবির। তার এলাকা ছিল কসবা। তিনি কসবাতে সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। আর একজন লেফটেন্যান্ট হারুনর রশীদ। তিনি নসিঙ্গরে সাবসেক্টর কমান্ডার। হারুন ও কবীরের কাছে এক কোম্পানি করে দুই কোম্পানি ও আমার কাছে দুই কোম্পানি সৈন্য ছিল। একথা গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে, কোনো সময়ই কসবা রেলস্টেশন ও কসবা নতুনবাজার পাকিবাহিনী দখল করতে পারেনি। নসিঙ্গরের কালাছড়া টি এস্টেট প্রায় সব সময় মুক্তিবাহিনীর অধীনে ছিল। আমি প্রত্যেক দিন একবার করে তিনটি ক্যাম্প পরিদর্শন করতাম।

এবার অ্যাকশনের আরও কিছু ঘটনার কথা। ১৭ই এপ্রিল রাত ১১-৩০ মিনিটে মেজর শাফায়াত জামিল আমাদের পাঁচজন অফিসার ও ৬০ জন সৈন্য নিয়ে আখাউড়া রেল স্টেশনের উত্তর দিকে যে ব্রিজ ছিল (তিতাস নদীর উপর ব্রিজ) সেটা ধ্বংস করে দেয়। তখনও আখাউড়া পাকিবাহিনীর সেনাদের দখলে ছিল। ব্রিজ উড়িয়েছিল ৬৫ জন বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্য। তারা অক্ষত অবস্থায় আখাউড়া বি ও পিতে ফিরে আসে।

কর্ণেলবাজার অপারেশন : জুন-১৯৭১ : আখাউড়া পতন হওয়ার পর বাংলাদেশ বাহিনী কর্ণেলবাজার জড়ো হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল পাক সৈন্যদের হত্যা করে সংখ্যা কমানো। তাই তারা ওখানে রয়ে গেল। পাকিবাহিনীরা সৈন্য ছিল এক কোম্পানি, আর বাংলাদেশ বাহিনীর ৩টি কোম্পানি। তার ভিতর একটি ছিল নিয়মিত কোম্পানি, অপর দুটি অনিয়মিত বাহিনী।

আগরতলা থেকে যে রাস্তা গঙ্গাসাগরের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তায় উত্তর মুখ করে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ডিফেন্স নেয়। রাস্তার উত্তর দিকে একটি খাল ছিল। পাকিবাহিনী আখাউড়া থেকে কর্ণেল বাজারের দিকে অগ্রসর হয় উত্তর দিক থেকে। তারা খাল পার হয়। রাতের বেলায় এসে পূর্বদিকে অর্থাৎ বাংলাদেশ বাহিনীর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে বাংলাদেশ বাহিনীর সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তারা ছিল অনিয়মিত বাহিনী। যা কিছু সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। এর ফলে বেয়নেটের আঘাতে বাংলাদেশ বাহিনীর ৭ জন সৈন্য শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাহিনীর অনিয়মিত সৈন্যদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারা যার যার মতো নানা দিকে চলে যায়।

সাক্ষাৎকার : ২৬-১০-১৯৭৩

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা :

মেজর ইমামুজ্জামান

মেজর খালেদ মোশাররফ বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য আমার নেতৃত্বে দিয়ে কুমিল্লা-চাঁদপুর সড়কে (লাকসামের কাছাকাছি) পাঠালেন। এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৬৫টি কনভয় আমরা অ্যামবুশ করি। এতে ৫টি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়, বাকি গাড়িগুলো কুমিল্লাতে ফিরে যায়।

এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় (বাগমারায়)। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের তখন অভাব। ভারত তখনও আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেয়নি। দু'দিন পর্যন্ত আমরা তীব্র প্রতিরোধ করলাম। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হলাম। তবুও ওদের প্রায় ২৭০ জন মারা গিয়েছিল– মৃত দেহগুলো গাড়িতে (৭/৮ ট্রাক) উঠাবার সময় আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম।

এপ্রিলের ২১ তারিখে আমরা লাকসাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম। চাঁদপুরে তখন পাকিস্তান বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করে। লাকসাম থেকে আমরা মিয়াবাজারে চলে আসি। এপ্রিলের ২৭ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিয়ারবাজার আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ওদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছিল। ধানক্ষেতে পানির মধ্যে অনেক বেলুচ সৈন্যের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। এপ্রিলের ২৯/৩০ তারিখে ওরা আবার আক্রমণ চালায়। ওদের দুটো আক্রমণই বীরত্বের সাথে প্রতিহত করা হয়। আমাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয়।

আমি কাদের চৌধুরী নামে মুজাহিদ বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে মিয়ারবাজারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে খালেদ মোশাররফের আদেশে চৌদ্দগ্রাম চলে আসি এবং ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে পরিকোট নামক জায়গায় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করি।

মে মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নদীর ওপারে বাংগোডা বাজারে আসে এবং বেশ গোলাগুলি করে। কিন্তু আমাদের শক্তিশালী ঘাঁটির কথা জানতে পেরে ওরা লাকসাম চলে যায়। মে মাসের ১৪ তারিখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় নদীর ওপার থেকে আমাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। আমরা চৌদ্দগ্রাম চলে আসি। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীর ভারী গোলাবর্ষণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা ভারতের রাধানগরে চলে আসি। আমাদের কোনো সরবরাহ ছিল না। ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। গুলির অভাব ছিল।

চৌদ্দগ্রাম থেকে মিয়ার বাজার পর্যন্ত সড়কে পাকিস্তানিরা যাতায়াতের চেষ্টা করে। কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারেনি। প্রায় সমস্ত পুল ভেঙে দেয়া হয়েছিল। বক্সুয়া দৌলতপুর থেকে ছাগলনাইয়া পর্যন্ত জুন মাসের প্রথম দিকে মেজর জিয়ার সেনাবাহিনী এবং ২নং সেক্টরের সেনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে একটা মজবুত প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করেছিল।

সাক্ষাৎকার : ১০-১-১৯৭৪

কুমিল্লা-নোয়াখালীর সশস্ত্র প্রতিরোধ :

সুবেদার মেজর লুৎফর রহমান

৩০শে অথবা ৩১শে মার্চ (১৯৭১ সুবেদার সিরাজুল হককে সঙ্গে নিয়ে আমি চৌমুহনী পৌঁছি। এখানে পরিষদ সদস্যদের সাথে দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। এসময় জনাব নুরুল হক ও অন্যান্য সদস্যরা ঢাকাসহ প্রদেশের সমস্ত জায়গায় পাকি পশুশক্তির বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। উপরন্তু আমরা বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনি। তারা সবাই আমাকে যে কোনো প্রকারে যোদ্ধা সংগ্রহ করে শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে বলেন। তাঁরা সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আমাকে মাইজদিতে নিয়ে যান। সেখানে তৎকালীন এম এন এ, এমপিএদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২রা এপ্রিল আমি ফেনীতে মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি) সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করি। মেজর জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে কালবিলম্ব না করে নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং বাঘামারায় শত্রুকে বাধা দিতে নির্দেশ দেন। তিনি সকল প্রকার অস্ত্র সরবরাহ করারও প্রতিশ্রুতি দেন। ফেনী থেকে ফিরে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং ৭৬ জন প্রকৃত নিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করি এবং নোয়াখালীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১- সর্বপ্রথম বাঘমারা পরির্দশন : দয়াময়কে স্মরণ করে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লাকসামের উত্তরে বাঘমারা পরিদর্শন করি এবং সুবেদার নজরুল ও সুবেদার জব্বারকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্থান নির্দিষ্ট করে দেই। এমন সময় নোয়াখালী জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং পরিষদ সদস্যরা এসে আমাকে জানালেন, দু'খানা পাকিসেনা বহনকারী জাহাজ রামগতির দক্ষিণ পাশের নদীতে অবস্থান করছে। এ খবর শোনার পর আমি তৎক্ষণাৎ রুহুল আমীন (শহীদ) পিটি অফিসার সাহেবসহ চারজন বুদ্ধিমান জওয়ানকে এর সত্যতা প্রমাণ করতে পাঠালাম। তারা নদী থেকে ফিরে এসে আমাকে সুনিশ্চিতভাবে জানান যে, সেখানে একটি নৌকা ছাড়া কিছু নেই। অতঃপর ৫ই এপ্রিল নোয়াখালীর অদূরবর্তী দৌলতগঞ্জের সেতুটি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেই। কেন না পাকিসৈন্যরা তখন লাকসামের উত্তরে বাঘমারাতে অবস্থান করছিল। কয়েকজন মোজাহিদ ও আনসারকে হালকা অস্ত্র দিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করি। বিকেলে অস্ত্র আর বিষ্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশে ফেনীতে যাই।

৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ : ফেনী থানা থেকে অতিকষ্টে ১৮টি হ্যান্ড গ্রেনেড সংগ্রহ করে কোম্পানিতে ফিরে আসি। এসময় রাতদিনের আরাম-আয়েশ হারাম হয়ে পড়ে আমার জন্য। শুধু যোদ্ধা, অস্ত্র আর অ্যামুনিশন সংগ্রহের চিন্তায় অস্থির হয়ে

পড়ি। যে সমস্ত যোদ্ধা আমার সাথে ছিল তাদের হাইড-আউটের (নিরাপদ অবস্থান) কথাও চিন্তা করি।

৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ : সারারাত যোদ্ধা, হাতিয়ার আর অ্যামুনিশন সংগ্রহের উদ্দেশে হাঁটাহাঁটি করে ভোর ছ'টায় ক্যাম্পে ফেরামাত্র খবর পেলাম, ফেনীতে ইপিআর এবং অবাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। পুরা কোম্পানি নিয়ে ফেনী যাবার সিদ্ধান্ত নিলে সুবেদার সিরাজ ফেনী যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। কেন না আমাদের হাতে কয়েকটি রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার কথামতো কোম্পানি রেখে আমি নিজে স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখার জন্য ফেনী রওনা হই। ফেনীর পরিস্থিতি দেখে চৌমুহনীতে ফিরে আসি এবং নোয়াখালীর সমস্ত পরিষদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে জরুরি পরামর্শে বসি।

৮ই এপ্রিল, ১৯৭১ : নোয়াখালীর ডেপুটি কমিশনার জনাব মঞ্জুর সাহেব সারা দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান এবং নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার জন্য তাগাদা দেন। বিকেলে ক্যাপ্টেন এনামুল হক সাহেব কোম্পানি পরিদর্শন করে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

৯ই এপ্রিল, ১৯৭১ : শত্রুর তুলনায় সামান্য অস্ত্র এবং যোদ্ধা নিয়ে ফরোয়ার্ড লাইনের প্রায় সবটাই কভার করে নেই। এদিন নাথের পেটুয়া স্টেশনের কাছে আরও একটি ফরোয়ার্ড ডিফেন্স স্থাপন করি।

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১-লাকসামে প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধ : ১০ই এপ্রিল বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয় মুখোমুখি যুদ্ধ। নোয়াখালীর পরিষদ সদস্যদের দেয়া চারশত টাকা ফরোয়ার্ড ডিফেন্স বাহিনীতে ভাগ করে দেয়ার জন্য সকাল ১০টায় ল্যাকসামে যাই। বেলা ১২টার সময় খবর পেলাম পাকিবাহিনী বাঘমারা থেকে লাকসামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প নেই। লাকসামের সামান্য উত্তরে পশুশক্তিকে বাধা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে পজিশন নেয়া হলো। মাত্র ৭০ জন যোদ্ধা নিয়ে এই অভিযান চালাই। সঙ্গে দুটো এল এম জি ছাড়া বাকি সবই ৩০৩ রাইফেল ছিল। তাই নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে রইলাম সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ পর শত্রুপক্ষ যখন আমাদের রেঞ্জের ভিতরে চলে আসে, তখনই একসঙ্গে গোলাগুলি শুরু করি। আমাদের এ অতর্কিত আক্রমণে পাকিবাহিনীর দু'জন লেফটেন্যান্টসহ ২৬ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৬০ জন আহত হয়। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে পাকিবাহিনীর সৈন্যরাও মেশিনগান, মর্টার ও আর্টিলারির গোলাগুলি শুরু করে। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু হলো। প্রায় ৪ ঘণ্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। শত্রুপক্ষের দুটো ট্রাকে আগুন ধরে যায়। ক্রমেই আমাদের গোলাবারুদ শেষ হতে থাকে। সরবরাহ ও সাহায্যের কোনো আশা ছিল না। অপরপক্ষে পাকিবাহিনী ময়নামতি থেকে সরবরাহ ও সৈন্য পেয়ে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর। কাজেই অক্ষত সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হই। ফলে পাকিবাহিনী লাকসাম দখল করে নেয়।

রাতে নূরুল হক সাহেব, নাগবাবুসহ অপর দু'জন পরিষদ সদস্য ২টা এল এম জি ও ৪টা এস এল আর আমার হাতে অর্পণ করেন। কিছু বিস্ফোরক দ্রব্যও ছিল। আমি উক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে দৌলতগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দেই এবং লাকসাম-নোয়াখালী সড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হই।

২০শে এপ্রিল, ১৯৭১-নাথের পেটুয়ার মুখোমুখি যুদ্ধ : ১০ই এপ্রিল সারারাত সেতু ধ্বংস করায় ব্যস্ত থাকায় ভোরে বিপুলাশ্বরে পৌঁছামাত্র মাইজদী থেকে টেলিফোনযোগে খবর পেলাম যে, লাকসামে অবস্থানরত পাকিসৈন্যরা নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ কোম্পানিকে ফল-ইন করি। সুবেদার সিরাজ সাহেবকে প্রথম প্লাটুনের এবং সুবেদার জব্বার সাহেবকে দ্বিতীয় প্লাটুনের কমান্ডার নিযুক্ত করি। আমি নিজে তৃতীয় প্লাটুনটি কোম্পানি হেডকোয়ার্টারসহ নিয়ে নাথের পেটুয়া অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটে যাই। স্টেশনের পূর্ব দিকের দায়িত্ব সুবেদার সিরাজ সাহেব ও জব্বার সাহেবের উপর অর্পণ করি এবং আমি পশ্চিম দিক রক্ষার দায়িত্ব নেই। তাদেরকে এ কথাও জানাই যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের যখন কোনো ব্যবস্থা নেই, সেহেতু শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যেন কেউই পশ্চাদপসরণ না করেন।

আমি নিজের প্লাটুনকে প্রত্যেক সেকশনের পজিশন স্বহস্তে দেখিয়ে দেই। খনন কাজ শেষ না হতেই হঠাৎ নায়েক সিরাজ সতর্ক সংকেত দ্বারা আমাকে দেখালেন যে, শত্রুপক্ষ ক্রলিং করে আমাদের পজিশনের নিকট এসে গেছে। আমি চেয়ে দেখি সত্যিই ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় পাকিস্তানিদের এক কোম্পানি সৈন্য ক্রলিং করে এমনভাবে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা ধারণা করা যায় না। আমি তৎক্ষণাৎ এস এল আর'- এর মাধ্যমে গুলি শুরু করি। নায়েক সিরাজও এল এম জি'র সাহায্যে শত্রুর উপর আঘাত করে। বলতে গেলে আমার সমস্ত প্লাটুনের সৈন্যরা একসাথে আগত শত্রুর প্রত্যেককে আহত বা নিহত করতে সক্ষম হয়। এরপর শত্রুপক্ষের ফলো-আপ কোম্পানি তাদের সাপোর্টিং বা সাহায্যকারী অস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে দ্রুতবেগে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে এবং আমাদের পাল্টা হামলার মুখে বিফল মনোরথ হয়। আহত ও নিহত সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিয়ে ওরা পিছনে চলে যায় এবং তারপর আমাদের উপর আর্টিলারি এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

অন্যদিকে পূর্ব দিক থেকে আমার দ্বিতীয় প্লাটুনের এল এম জি'র ফায়ার পূর্ব দিক থেকে যখন শত্রুপক্ষের উপর পড়ছিল, তখনই শত্রুরা তাদের উপর অনবরত শেলিং করতে থাকে। পরিণামে আমার একজন সৈন্য তৎক্ষণাৎ শহীদ হন এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হন। আমি বাধ্য হয়ে প্লাটুনকে ২০০ গজ পশ্চাতে একটা ডোবার পাশে দৌড়ে পজিশন নিতে আদেশ দেই। শত্রুর দুই প্লাটুনের মতো সৈন্য আমার প্রথম পজিশনটি দখল করে ফেলে। এসময় আমি আমার

প্লাটুনকে আদেশের মাধ্যমে দ্বিতীয় ডিফেনসিভ পজিশনে নিয়ে যাই। এবং পুনরায় শত্রুরু গতিবিধি লক্ষ্য করেই গুলি আরম্ভ করি। এমন সময় হঠাৎ তিনখানা যুদ্ধ বিমান সোজা আমাদের উপর ডাইভ করে পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। তারা প্রচুর পরিমাণ গুলি ছোঁড়ে এবং নাপাম বোমা ফেলতে থাকে।

আমাদের সৌভাগ্য যে, শত্রুর সমস্ত গুলি এবং বোমাগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমাদের সামনে এবং পিছনে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এভাবে ভোর থেকে শুরু করে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুদের আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তখন আমি পূর্বদিকে অবস্থানরত দুই প্লাটুনের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে আমার একজন জওয়ানকে তাদের খবর আনতে পাঠাই। এ সময় পূর্বদিকের গ্রামগুলো আগুনে জ্বলতে দেখি। সংবাদদাতা ফিরে এসে জানালো যে, পূর্বদিকের দুই প্লাটুন তাদের স্ব-স্ব অবস্থান সৈন্য তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ কথা শোনার পর আমি বাধ্য হয়ে অলরাউন্ড ডিফেন্স করি। এভাবে সন্ধে পর্যন্ত গোলাগুলি বিনিময় হয়। সন্ধের পর পাকিবাহিনী রেকি পেট্রোলিং শুরু করে। তারা আমাদের উপর ফাইটিং পেট্রোল পাঠায়। আমাদের সঙ্গে দু'ঘন্টা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পর তারা চলে যায়।

সারাদিন ধরে যুদ্ধ করার পর আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বিশ্রাম এবং আহার কোনোটাই হয়নি। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না আমাদের। এমতাবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলি এবং রাত সাড়ে দশটার সময় আমি আমার যোদ্ধাদের নিয়ে সোনাইমুড়ি অভিমুখে রওনা হই। এ সময় রাস্তায় কোনো জনগণের সাড়া-শব্দ ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির লোক ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে চলে গেছে। সোনামুড়িতে পৌঁছে ড. মফিজ সাহেবের সাক্ষাৎ পাই। আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরেন। (ড. মফিজ খবর পেয়েছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মারা গিয়েছি।) তারপর তিনি আমাকে ও আমার সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

২১শে এপ্রিল ভোরে শত্রুদের আবার অগ্রসর হবার খবর পেলাম। আগের দিনের যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া অ্যামুনিশনও তেমন ছিল না। তবু শত্রুবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার সিদ্ধান্ত নেই। সে অনুযায়ী সোনাইমুড়ি রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছাকাছি অ্যামবুশ পার্টি বসাই। কিছুক্ষণ পর শত্রুবাহিনীর জওয়ানরা অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে আমরা গুলি চালাই। শত্রুপক্ষ ৩ ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগান থেকে গুলি চালায়। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়। ইতিমধ্যে আমাদের অ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে, আমি আমার বাহিনীকে উইথড্র করে চলে আসি। পাকিবাহিনী সোনাইমুড়ি দখল করে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হয়।

আমি আবিরপাড়ায় একটি গোপন বৈঠক-এর ব্যবস্থা করি। এখানে কর্মীদের বিপুল উৎসাহ দেখতে পেলাম। নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ ও ইসহাক মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

২৪শে এপ্রিল : আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী জনাব আমীনউল্লাহ মিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর্বর পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমাকে সাহস দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার নিশ্চয়তা দেন। তিনি প্রথমবারের মতো ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য এবং যাতায়াতের রাস্তা ঠিক করার জন্যে ভারতে চলে যান। এইদিন সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে আমার কোম্পানিতে যোগদান করেন।

'২৬শে এপ্রিল : হাবিলদার নূর মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে বিপুলাশ্বর স্টেশনের দক্ষিণে অ্যামবুশ করি। সকালে পাকিবাহিনীর ৬ জন সিগনালম্যানসহ দু'খানা গাড়ি যাবার সময় এল এম জি দ্বারা ব্রাশ করলে তাদের একখানা গাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং দু'জন আহত হয়। পাকিবাহিনী আহত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়ে অন্য গাড়িসহ পালিয়ে যায়। এখানে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। আমরা শত্রুদের দুটো রাইফেল উদ্ধার করি।

২৮শে এপ্রিল : সিপাই শাহজানকে সঙ্গে নিয়ে সোনাইমুড়িতে রেকি করি। ২৯শে এপ্রিল নায়েক সফি তার সেকশন নিয়ে সোনাইমুড়ি আউটার সিগন্যাল পুনরায় অ্যামবুশ করে। কিছুক্ষণ পর পাকিবাহিনীর তিনখানা গাড়ি অগ্রসর হতে থাকলে সফি ফায়ার শুরু করে। এতে সামনের গাড়িখানা অকেজো হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ পজিশন নিয়ে পাল্টা ফায়ার শরু করে। দু'তিন ঘণ্টা যাবৎ গোলাগুলি বিনিময় হয়। কিন্তু অ্যামুনিশন শেষ হয়ে গেলে আমাদের জওয়ানরা গা-ঢাকা দেয়। শত্রুপক্ষের একজন গুরুতরভাবে আহত হয়। এখানে পাকিবাহিনীর গুলিতে একটি ছেলে ও এক বৃদ্ধ মারা যায়।

১লা মে- বগাদিয়ার যুদ্ধ : নায়েক সিরাজ এক প্লাটুন যোদ্ধা নিয়ে বগাদিয়া সেতুর কাছে অ্যামবুশ করে। এ জায়গা দিয়ে একখানা জিপসহ তিনখানা ৩-টনী লরি কিছু দূরত্ব বজায় রেখে অগ্রসর হবার সময় নায়েক সিরাজ পাকিবাহিনীর উপর চরম আক্রমণ চালায় এবং প্রথম ও শেষ গাড়িখানার উপর অনবরত গুলি চালালে ৩-টনী একখানা গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এখানে ১৫/২০ জন খানসেনা সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। পরক্ষণে পাকিসেনারা ৩ ইঞ্চি মর্টার ও মেশিনগান হতে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। দীর্ঘ সময় যুদ্ধের পর নায়েক সিরাজ প্লাটুন উইথড্র করে। পাকিসেনারা এখানে কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এ যুদ্ধে হাবিলদার নূরুল আমীন ও অপর একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হয়। নায়েক সিরাজ অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে এ যুদ্ধ পরিচালনা করে।

৬ই মে- ফেনাকাটা পুলে সংঘর্ষ : চৌমুহনী-চন্দ্রগঞ্জ রাস্তায় পাকিবাহিনীর আবার চলাচল শুরু হয়। কিন্তু অ্যামবুশ করার সুযোগ পাই না। অবশেষে ৬ই মে নায়েক শফির সেকশন নিয়ে অ্যামবুশ পার্টি বসাই। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনখানা পাকিসৈন্য বোঝাই ট্রাক চন্দ্রগঞ্জ থেকে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাই। আমাদের এই অতর্কিত আক্রমণে পাকি জওয়ানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই বেশ কয়েকজন খানসেনা ধরাশায়ী হয়। মুহূর্তের মধ্যে শক্ররা ভারী মেশিনগান দ্বারা আমাদের পাল্টা আক্রমণ করে। পাকিসেনাদের মেশিনগানের গুলিতে একই নামের আমাদের দু'জন বীর মুক্তিসেনা (ইসমাইল) শহীদ হন। তাঁদের একজনের বাড়ি আমিশাপাড়া বাজারের পশ্চিমে সাতঘরিয়া, অপরজনের বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জে। এরপর আমি আমার সৈন্য তুলে নিয়ে শহীদদ্বয়ের দাফনের ব্যবস্থা করি। আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী চৌমুহনীর হোটেল জায়েদীর মালিক এবং পদিপাড়ার নুর মোহাম্মদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পদিপাড়াতে এই দুই শহীদকে সমাধিস্থ করা হয়।

৮ই মে : আমি ভারত থেকে মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেবের আদেশক্রমে অস্ত্র আনয়ন করি।

৯ই মে-পুনরায় বগাদিয়াতে যুদ্ধ : ফেনাকাটা যুদ্ধ ও অপারেশনের পর জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নতুন করে সাহসের সঞ্চার হয়। নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে বগাদিয়াতে অ্যামবুশ করার নির্দেশ দিয়ে নায়েক সুবেদার জবেদকে সঙ্গে নিয়ে আমি শক্রবাহিনীর কর্মতৎপরতা ও অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশে চৌমুহনী রওনা হই। চৌমুহনীতে পাকিবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করে বগাদিয়ায় ফেরার পূর্বেই নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিবাহিনীর একখানা পিকআপ ভ্যানের একজন জেসিওসহ ছ'জন সৈন্যের উপর আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে শক্রদের দু'জন সৈন্য (জেসিও) নিহত হয়। গাড়িখানা রাস্তায় পড়ে যায়। ইতিমধ্যে আমরাও পৌঁছে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে শক্রবাহিনীর আরও দু'খানা গাড়ি এসে পড়ল। আরম্ভ হয় উভয়পক্ষের আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ। প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা গোলাগুলি বিনিময় হয়। অবশেষে শক্ররা হতাহত সৈন্যদের নিয়ে চৌমুহনীর দিকে চলে যায়। এখানে শক্রপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এ যুদ্ধে নায়েক সুবেদার ওয়ালীউল্লার গুলি লাগে এবং তিনি সামান্য আহত হন। তিনি এ যুদ্ধে অসামান্য সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পাকিবাহিনীর সেই অকেজো গাড়িখানা স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ কয়েক মাস রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে ছিল।

তৎকালীন পাকিস্তান বাজারের পূর্ব দিকে যুদ্ধ : পাকিসেনাদের চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর সড়কে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সেই রাস্তায় অ্যামবুশ করার পরিকল্পনা

করি। অবশেষে ১০ই মে অ্যামবুশ করে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একখানা সিভিল বাসে কিছু ছদ্মবেশে ও কিছু সামরিক পোশাকে খানসেনারা লক্ষ্মীপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বাসের ২/৩ শত গজ পেছনে সামরিক গাড়িতে আরও বহু পাকিসৈন্য অগ্রসর হচ্ছিল। প্রথম গাড়িটিই আমরা আঘাত করি। ফলে কয়েকজন সৈন্য প্রাণ হারায়। মুহূর্তে অন্য পাকিসৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে মর্টার ও আর্টিলারির সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ চালালে আমরা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হই।

১১ই মে, ১৯৭১- মীরগঞ্জে পাকিবাহিনীর পরাজয় : এখানে রেকি করে সুবেদার ওয়ালীউল্লাকে অ্যামবুশ করার এবং নায়েক আবুল হোসেনকে রাস্তায় মাইন পুঁততে নির্দেশ দেই। আবুল হোসেন মাইন বসিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। লক্ষ্মীপুরের প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার আব্দুল মতিনও তার সেকশন নিয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে কিছুক্ষণ পরে শত্রুবাহিনী একখানা গরুর গাড়ি সামনে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। গরুর গাড়িখানা পুঁতে রাখা মাইনের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে সেটি কয়েক হাত উপরের দিকে উঠে যায়। এতে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, কয়েকজন অস্ত্র ফেলে প্রাণপণে পালানোর চেষ্টা করে। অমনি শুরু হয় আমাদের গোলাগুলি। কয়েকজন হতাহতও হয়। জানা যায়, শত্রুরা পালিয়ে যাবার সময় দু'জন খানসেনা জনসাধারণের হাতে মাছ মারা রাকসা দ্বারা আহত হয়। শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। এখানেও সুবেদার ওয়ালীউল্লা অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

১২ই মে : চৌমুহনীর দেড়মাইল উত্তরে মান্দারহাটে শত্রুদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য আমি এক প্লাটুন মুক্তিসেনা নিয়ে অ্যামবুশ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তখন চৌমুহনীতে পাকিবাহিনীর বিরাট ঘাঁটি। এসময়ে পাকিবাহিনী গুপ্তচর মাধ্যমে খবর পেয়ে অতর্কিত এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে আমরা সেখান থেকে কোনো প্রকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। কিন্তু পাকিবাহিনী আমাদের ধরতে না পেরে মান্দারহাট বাজারটি পুড়িয়ে দেয়।

১৩ই মে : বিকেল দু'টায় খবর পেলাম নোয়াখালীর এসডিও দুই গাড়ি পাকিসৈন্য নিয়ে লক্ষ্মীপুর পরিদর্শনে গেছেন। তাদের প্রত্যাগমনে বাধা দেয়ার জন্যে হাবিলদার নুর মোহাম্মদ এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে চন্দ্রগঞ্জের কাছে কোনো এক জায়গায় অ্যামবুশ করেন। এ অ্যামবুশে এসডিও সহ কয়েকজন সামান্য আহত হন।

১৪ই মে : নায়েক আবুল হোসেন বিপুলাশ্বর স্টেশনের কাছে কয়েকটি মাইন পুঁতে রাখে। কিন্তু পাকিসেনাদের গাড়ি অতিক্রম করার পূর্বেই একখানা ইট

বোঝাই ট্রাক সে স্থান অতিক্রম করার সময় ট্রাকটি ধ্বংস হয়। অন্যদিকে একই দিনে হাবিলদার নূর মোহাম্মদ তার প্লাটুন নিয়ে চন্দ্রগঞ্জে অ্যামবুশ করেন। লক্ষ্মীপুর থেকে অগ্রগামী একখানা লরী বোঝাই খানসেনাদের অ্যামবুশ করে ৫/৬ জনকে খতম করতে সক্ষম হয়। অসমর্থিত খবরে জানা যায়, একজন কর্ণেলও নাকি নিহত হয়। পরে তারা দোয়াইরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

১৫ই মে : নায়েক সুবেদার ইসহাক এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ৭ মাইল পায়ে হেঁটে খিলপাড়ার পশ্চিমে মইলকার দিঘির পাড়ে পাকি হানাদার বাহিনীর ছোট একটি ছাউনি আক্রমণ করে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। নায়েক সুবেদার ইসহাক এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেয়।

১৮ই মে, ১৯৭১- সাহেবজাদার পুল ধ্বংস : কড়া পাহারা সত্ত্বেও ওয়ালীউল্লা মাইন দ্বারা সাহেবজাদার পুলটি ধ্বংস করে লাকসাম- নোয়াখালীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়।

১৯শে মে- বগাদিয়ায় পুনরায় সংঘর্ষ : নায়েক আবুল হোসেনকে মাইন বসানোর নির্দেশ দিয়ে গোপনে অ্যামবুশ করে বসে থাকি। সকাল ৯ টার সময় ৩ জন পাকিসেনা বেবী ট্যাক্সি করে লাকসাম যাবার সময় বগাদিয়ায় পৌছলে পোঁতা মাইন বিস্ফোরণে বেবী ট্রাক্সিটি কয়েক গজ দূরে উড়ে যায় এবং ৩ জন খান সেনাও নিহত হয়। এ খবর শত্রুবাহিনীর কানে পৌঁছামাত্র এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আমরা গা-ঢাকা দেই।

২৬শে মে : সুবেদার ওয়ালীউল্লা দালালবাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে ৩০ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং ৬টি রাইফেল উদ্ধার করে।

২৮শে মে : পুনরায় সেক্টর কমান্ডারের আদেশক্রমে ভারতে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে কিছু এ্যামুনিশন নিয়ে আসি।

২৯শে মে : মীরেরহাট থেকে ১৫ জনের একটি রাজাকার দল অগ্রসর হলে হাবিলদার আবদুল মতিন তাদেরকে আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৫ জন রাজাকারই হাবিলদার মতিনের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।

সাক্ষাৎকার : ১৮-৯-১৯৭৩

সশস্ত্র প্রতিরোধে কুমিল্লা :
সুবেদার সৈয়দ গোলাম আম্বিয়া

২৬শে মার্চ সকাল বেলা আখাউড়া কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে একজন নায়েক অপারেটর সিঙ্গারবিলে আসে এবং জানায় যে ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ। কুমিল্লাতেও আমাদের লোকজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ-খবর পাবার পর আমি আমার লোকজনকে গোপনে ডাকি। কমান্ড তখন আমার হাতে। আর কেউ

সিনিয়র না থাকায় এ-মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ৬টা বিওপিতে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি ইপিআরকে আজ রাতের মধ্যে শেষ করতে হবে। পরদিন সকালে খবর পাঠানো হলো, সকল বিওপি ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আখাউড়া সিনেমা হলের সামনে সমবেত হওয়ার জন্য। ২৮শে মার্চ সবাই আখাউড়াতে গিয়ে একত্রিত হই।

২৯শে মার্চ জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে সমস্ত বাঙালি ইপিআর আখাউড়ায় পাকিস্তানি কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর ডব্লিউপিআররা রাতের অন্ধকারে দুটি লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আখাউড়া থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে জনসাধারণ তাদেরকে ঘিরে ফেলে। দুইজন স্থানীয় লোককে পাকিস্তানিরা এসময় গুলি করে হত্যা করে। তারপর আমার এক প্লাটুন ইপিআর হাজির হলে শত্রুরা স্থানীয় মসজিদে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানের এক সুবেদার ও এক নায়েব সুবেদারসহ ১৪ জনকে সেখানে হত্যা করা হয়।

কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, অয়ারলেস সেট, রেশন সরিয়ে সিনেমা হলের সামনে স্কুলে নিয়ে আসি। দুইজন হাবিলদারকে নায়েক সুবেদার দিয়ে ৩টা প্লাটুন খাড়া করি। এবং আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসহ এই এলাকায় ডিফেন্স তৈরি করি।

২রা এপ্রিল মেজর খালেদ মোশার্‌রফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে টেলিফোনে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি আমাকে একটা প্লাটুন দিয়ে উজানিসার এবং আর একটা প্লাটুন দিয়ে গঙ্গাসাগর রেলওয়ে স্টেশনে ডিফেন্স করার নির্দেশ দেন। ৪ঠা এপ্রিল দুটি প্লাটুন উল্লিখিত জায়গায় মোতায়েন করা হয়। ৫ই এপ্রিল আমি নিজেই উজানিসার চলে যাই।

১২ই এপ্রিল উজানিসার ও গঙ্গাসাগর ব্রিজ আংশিক নষ্ট করে দেয়া হয়— পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য। এটা হচ্ছে কুমিল্লা থেকে সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার রাস্তা।

১৪ই এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এটি ব্রিগেড কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হয়। উজানিসার ব্রিজের হাজার গজ দূরে এদের একটি কোম্পানি গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার দু'পাশের নালা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ব্রিজের নিচে আমাদের বাংকার ছিল। শত্রুরা আমাদের কাছাকাছি আসার পর তাদের উপর ফায়ার ওপেন করা হয়। আমাদের এই আচমকা আক্রমণে শত্রুপক্ষের অনেকেই হতাহত হয়। নৌকাতে তারা সমস্ত বোঝাই করে নিয়েছিল। এসব নৌকার মাঝিরা পরে আমাদেরকে বলেছে যে, একজন অফিসারসহ ১৭৩ সৈন্য ওদের নিহত হয়েছিল।

এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় এবং আর্টিলারি ও মর্টারের সাহায্যে আমাদের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের কাছে কোনো আর্টিলারি বা মর্টার ছিল না। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কাছে খবর

পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে সাহায্যে করার জন্য। আমাদের লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলের কাউকে পায়নি। জনসাধারণ বলেছে যে, তারা নাকি আখাউড়ার দিকে চলে গেছে। পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা (আমাদের দুই প্লাটুন সৈন্য) উইথড্র করে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসি। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও আমাদের কোনো ডিফেন্স নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা উইথড্র করি।

উজানিসারে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য গঙ্গাসাগর হয়ে আখাউড়া আসার চেষ্টা করে। হাবিলদার আসদ্দর আলীর নেতৃত্বে আমাদের এক প্লাটুন ইপিআর গঙ্গাসাগর ব্রিজে ডিফেন্স বানিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখানে পৌঁছুলে এক প্লাটুন ইপিআর তাদের উপর ফায়ার ওপনে করে। এই অতর্কিত আক্রমণে (১৫ই এপ্রিল) পাকিস্তানিদের ৩ জন অফিসারসহ আনুমানিক ৭০/৭৫ জন সৈন্য নিহত হয়। তিনজন অফিসার ও সৈন্যদের কবর সেখানে পাওয়া যায়। আমাদের প্লাটুনটির ডিফেন্স দুদিন পর্যন্ত সেখানে থাকে।

অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরাও তাদের ডিফেন্স মজবুত করে। পাকিস্তানি ব্রিগেড কমান্ডার ওই ব্যাটালিয়নকে উইথড্র করে নতুন আর একটা ব্যাটালিয়ন গঙ্গাসাগরে পাঠায় এবং দুই দিনের মধ্যে গঙ্গাসাগরে মুক্তিফৌজদের ডিফেন্স ধ্বংস করে আখাউড়া পৌঁছার নির্দেশ দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের ডিফেন্সে চলে আসে। আর্টিলারি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে তারা ওভারহেড ফায়ার অব্যাহত রেখেছিল। ইপিআর-এর মোহাম্মদ সুফি মিয়া তখনও গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংকারে ঢুকে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ল্যান্স নায়েক মোবাশ্বের আলীকেও বাংকারে ঢুকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়। ৭ জনকে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় আগরতলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৮ই এপ্রিল প্লাটুন-এর অন্যান্য সৈন্য উইথড্র করে আখাউড়া চলে আসে।

১৯শে এপ্রিল পুরো ইপিআর কোম্পানিকে ক্লোজ করে আখাউড়ায় একত্রিত করা হয়। এখানে ৪র্থ বেঙ্গলের একটি কোম্পানিও এসেছিল ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীনের নেতৃত্বে।

২১শে এপ্রিল ঘয়েরকোট ও ইটনা গ্রামে আমরা মিলিতভাবে ডিফেন্স করি। ২২শে এপ্রিল গঙ্গাসাগরে এক অ্যামবুশে আমরা ৬ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করি ও বাইশ হাজার চীনা অ্যামুনিশন উদ্ধার করি; সঙ্গে ৫টা রাইফেল ও একটা স্টেনগানসহ।

২৮শে এপ্রিল আমাদের দুটি প্লাটুনকে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীন আজমপুরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

১১ই মে আজমপুরে আমরা অ্যামবুশ তৈরি করি। পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি কোম্পানি সিলেটের মুকুন্দপুর থেকে আজমপুরের দিকে আসছিল। আমাদের দুটি

প্লাটুন নরসিঙ্গর নামক জায়গায় ওদেরকে অ্যামবুশ করে। এই অ্যামবুশে ৬৩ জন পাকিসেনা নিহত হয়।

১৩ই মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক অ্যামবুশে ৩ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়।

১৮ই মে এই এলাকায় আমাদের আচমকা রেইডে ৬ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। একজন আহত সৈন্যকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২৭শে মে রাজাপুর এলাকায় একই ধরনের রেইডে ৪ জন পাকিসেনা নিহত হয়।

২৯শে মে সিঙ্গারবিল এলাকায় এক অ্যামবুশে ৬ জন পাকিসেনা নিহত হয়।

৩১শে মে সিঙ্গারবিলে আর এক অ্যামবুশে ১৩ জন পাকিসেনা নিহত হয়। ৪ঠা জুন দুটি অ্যামবুশে ৯ জন পাকিসেনা নিহত হয় সিঙ্গারবিল এলাকায়।

সাক্ষাৎকার : ২০-৭-১৯৭৬

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ

বড়কামতার যুদ্ধ : বর্ডার পেরিয়ে আগরতলা এসে পৌঁছেছি। তারপর ক'টা দিন কেটে গেছে। মুক্তিবাহিনীর ভাইদের স্বচক্ষে দেখবার জন্য আর তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে মরছিলাম। কিন্তু আমাদের মতো লোকের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি তাদের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। অতিরিক্ত আগ্রহ দেখালে হয়তোবা সন্দেহভাজন হয়ে পড়ব! শুনলাম শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে জি, বি, হাসপাতালে মুক্তিবাহিনীর দশ-বারো জন আহত যোদ্ধা রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলে আমাদের মনের আশা মিটতে পারে।

কিন্তু কাজটা কি এতই সহজ! আমরা যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোক নই তারই বা প্রমাণ কী? এখনকার অবস্থায় এই সন্দেহ তো জাগতেই পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলাম, আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। আমরা যে পরিচয়টুকু নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই কাজটা সহজ হয়ে গেল। বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা তাঁদের মুখে নানা কাহিনি শুনলাম। আমার মনে হলো তারা যেন প্রথমত কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিল। পরে কথা বলাবলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল।

সবশুদ্ধ চার জায়গার চার জন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমরা আলাপ করেছি। তিন জনের সাথে কথা শেষ করে চতুর্থ জনের সঙ্গে কথা শুরু করতেই চমকে উঠলাম। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি কোন জায়গায় লড়াই করে জখম

হয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন সে জায়গার নাম বড়কামতা। এই কথা শোনার পর আমার চমকে উঠার কথাই তো! এই তো মাত্র ক'দিন আগে বড়কামতায় এক রাত্রি যাপন করে এসেছি। সেকথা কি এখনই ভুলে যেতে পারি?

বড়কামতা?

হ্যাঁ, বড়কামতা। আমার মানসচক্ষে সেই স্বল্পভাষী যুবকটির মুখ ভেসে উঠেছিল। আর স্মৃতিপটে ভেসে আসছিল স্খলিত কণ্ঠে বৃদ্ধের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, দুর্গা, দুর্গা। তাহলে আমার সেই এক রাত্রির স্নেহঘন আশ্রয় বড়কামতার গ্রামটিও যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে?

ওরা কোন তারিখে হামলা করেছিল আর সেই সময় আপনারাই বা সেখান থেকে কতদূরে ছিলেন?

ওরা হামলা করেছিল ৩০-এ, অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল তারিখে।

আমরা ২৫ তারিখে প্রথম সেখান যাই। তারপর থেকে সেখানেই ছিলাম।

কী আশ্চর্য কাণ্ড, আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

আমি খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসাব করে দেখলাম আমরা চার বন্ধু সেই ২৫-এ এপ্রিল তারিখেই বড়কামতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। এঁরাও আমাদের কাছাকাছি ছিলেন ! কিন্তু আমরা বাইরের লোক, এঁদের কেমন করে জানব। আপনারা ক'জন ছিলেন?

আমরা মুক্তিবাহিনীর দশজন লোক সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ক'টি দিনের মধ্যে ঐ অঞ্চলে আরও পাঁচজন লোককে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলাম বলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দাঁড়াল পনের।

এই ক'দিনে বড়কামতার লোকেরা আমাদের, নিজেদের আপনজনের মতো গ্রহণ করে নিয়েছিল। আমরা সবাই মিলেমিশে সংসার করছিলাম। আমরা এখান থেকে ওখান থেকে বড় বড় মাছ ধরে নিয়ে আসতাম। কখনো তাঁরা রান্না করতেন, কখনো বা আমরা। কিন্তু খাবার বেলায় সবাই ভাগাভাগি করে খেতাম। কিসের হিন্দু আর কিসের মুসলমান, আমাদের জাতপাতের বালাই ছিল না।

উপর থেকে নির্দেশ পেয়ে আমরা ২৯শে এপ্রিল তারিখে চান্দিনার পূর্বদিকে ঢাকা-কুমিল্লা সড়কের একটা পুল উড়িয়ে দিলাম। ক'দিন থেকেই চান্দিনা অঞ্চলে মিলিটারিরা বেশ তোড়জোড় চালাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে ওরা একটা কিছু ঘটাবে সেটা মনে মনে অনুমান করেছিলাম। আমাদের এই ছোট দলটিও সেজন্য তৈরি ছিল। ওরা একটা কিছু অঘটন ঘটালে আমরাও একেবারে চুপ করে থাকব না। পাকিস্তানিরা যাই মনে করে থাকুক না কেন, ব্যাপারটা একদম একতরফা হবে না।

২৯ তারিখে পুল উড়িয়ে দেবার পর ওরা কোথাও না কোথাও হামলা করবেই। কিন্তু ওদের সেই হামলাটা কোথায় হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

কিন্তু এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হলো না। ওরা পরদিন সকালবেলা চারখানা সৈন্যবোঝাই গাড়ি সাজিয়ে এই বড়কামতায় এসে হানা দিল। ওরা কি তবে সন্দেহ করতে পেরেছে যে, আমরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে আছি? কিন্তু তখন বেশি ভাববার সময় ছিল না। ওরা প্রথমেই কতকগুলো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। ওদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে ষাট। ইতিমধ্যে আমরা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা ওদের দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ওরা প্রথমেই কোনো বাধা না পেয়ে আপন মনে তাদের ধ্বংসের কাজে এগিয়ে চলেছিল।

আমরা প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র একই সঙ্গে চারটা গাড়ির উপর 'ব্রাশ' করে চললাম। আমাদের মিলিটারি ভাষায় 'ব্রাশ' কথার মানে একই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুলির পর গুলি চালিয়ে যাওয়া। থামিয়ে না দিলে এইভাবে ক্রমান্বয়ে গুলির পর গুলি চলতে থাকে। এই একটানা গুলিবর্ষণের ফলে সৈন্য-বোঝাই চারটা গাড়িই লণ্ডভণ্ড হতে লাগল। আমাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ওরা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ নিয়ে পালাল।

৩০শে এপ্রিলের যুদ্ধের এটা প্রথম পর্ব। এরপরই যে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যাবে সেটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির দরকার পড়ে না। এখান থেকে ক্যান্টনমেন্ট কতই বা দূর। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বটা যে এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। এর একঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদেই ওরা সৈন্যবোঝাই গাড়ির মিছিল সাজিয়ে চলে এল। ওদের আঠারটা ট্রাক বিকট আওয়াজে পথঘাট কাঁপিয়ে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল। অনুমানে বুঝলাম প্রতিপক্ষ দু'শ জনের কম হবে না। ওদের সঙ্গে মর্টার, মেশিনগান, রাইফেল– কোনো কিছুর অভাব ছিল না। ওরা এবার রীতিমতো শিক্ষা দিয়ে যাবে। ওরা এসেই বেশ বড় একটা এলাকাকে ঘেরাও করে ফেলল।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চারজন সেই ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। আমাদের সুবিধা হচ্ছে এই যে, ওদের আমরা ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত সব লোকের ভিড়ে মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় মিশে আছে এবং তারা কোথায় কোথায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পর্কে ওদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

বড়কামতা গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ বারুই বা বারুইজীবী শ্রেণীর লোক। সে জন্য গ্রামের এখানে-ওখানে বহু পানের বরোজ আছে। এই বরোজগুলো সে দিন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এগুলোর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে তারা শত্রুদের বেছে বেছে তাক করে মারছিল।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার পাকিসৈন্যদের বিরুদ্ধে শুধু যে আমরাই লড়াই করছিলাম তা নয়, গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। দু' একশ' লোক নয়, আমার মনে হয় তাদের সংখ্যা দু'তিন হাজারের কম হবে না। লোকগুলো ক্ষিপ্তের মতো ছুটে আসছিল। তাদের হাতে লাঠিসোটা, বর্শা-বল্লম থেকে শুরু করে বন্দুক পর্যন্ত। এই দুঃসাহসী লোকগুলো এই হাতিয়ার নিয়ে মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটে আসছে। এদের উম্মাদ ছাড়া আর কী বলা চলে ! কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের এই উম্মাদনা আমাদের মধ্যে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে তুলেছিল। ওরা নানারকম স্লোগান 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি আর বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছিল। সেই গর্জন শত্রুদের মনেও ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে তুলেছিল। হানাদার বাহিনী কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে, এটা আমরা কখনও আশা করতে পারিনি। অতি সাধারণ মানুষ যে দেশের ডাকে, স্বাধীনতার ডাকে এমন অসাধারণ ভূমিকা করতে পারে, এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আর কখনও হয়নি। এইভাবে ঘণ্টা দুই ধরে দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল। আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে শত্রু সৈন্যদের তাক করে করে মারছিলম। আর এই ক্ষিপ্ত জনতা যৎসামান্য হাতিয়ার নিয়ে তাদের পক্ষে যেটুকু সম্ভব তাই-ই করে চলেছিল। মর্টার গর্জন করছে, বোমা ফাটছে, মেশিনগান চলছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা যেন ভয় পাবার কথা ভুলেই গেছে। ভয় পেয়ে পালানো দূরে থাক, ওদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এই দু'ঘণ্টার যুদ্ধে বহু সাধারণ মানুষ মারা গেছে। আমরা যে চারজন ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছি তাদের মধ্যে দু'জন জখম হয়েছে। কিন্তু পাকিসৈন্যদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই দুটি ঘণ্টার যুদ্ধ ওদের অনেক হিসেবই ভণ্ডুল করে দিয়েছে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এই নির্ভীক ও মারমুখো মূর্তি এবং তাদের মুহুর্মুহু গগনভেদী চিৎকারে (জয় বাংলা) ওরা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এমন অভিজ্ঞতা ওদের কখনও হয়নি। এমন দৃশ্য আমরাও কোনোদিন দেখিনি।

শেষ পর্যন্ত আমরাই সেদিন এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম। আমাদের সামান্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা সেদিন যে বীরত্ব ও রণচাতুর্য দেখিয়েছিল, সে কথা হয়তো কেউ কোনো দিন জানবে না। কিন্তু এই অঞ্চলের সাধারণ কৃষক জনতা সেদিন যে শক্তি, সাহস আর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল, আর কেউ জানুক আর নাই জানুক, আমরা তা কোনোদিন ভুলতে পারব না।

শেষ দৃশ্য। পাকিসেনারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যেদিকে পারছে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তাদের পেছন পেছন ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত জনতা যার যার হাতিয়ার উঁচিয়ে তাড়া করে চলেছে।

আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা সামনে তিনজন পাঞ্জাবি সৈন্য ওদের জন্য অজানা- অচেনা পথে ছুটে চলেছে। একমাত্র আমি ছাড়া ওরা যে আর কারও নজরে পড়েনি, এটা ওদের জানা নেই। কেমন করে জানবে? একবার মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। আমি সেই সুযোগটাকে ভালোভাবেই কাজে লাগালাম। আমি পরপর গুলি করে একজন একজন করে ওদের তিনজনকেই ভূপাতিত করলাম। সামনে গিয়ে দেখলাম, ওদের তিনজনের মধ্যে একজন তখনও মরেনি। আমি এক গুলিতেই আমার সেই অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করে দিলাম।

এর পরের কাজ এদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নেয়া। সেই অস্ত্র বীর জনতার হাতে তুলে দিলাম। এতক্ষণ বাদে আমার নজরে পড়ল যে, আমি নিজেও অক্ষত নই। এই যে দেখুন, আমার হাতের এই জায়গায় একটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণ এত সমস্ত উত্তেজনাকর ঘটনার মধ্যে আমিও তা টের পাইনি। এরপর চিকিৎসার জন্য চলে এলাম এই হাসপাতালে।

যিনি এতক্ষণ একথা বলছিলেন, তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সুবেদার। এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। তার কথায় বুঝলাম বড়কামতার যুদ্ধের ঐ খানেই পরিসমাপ্তি।

কিন্তু আমাদের বোঝাটা যে কত বড় ভুল বোঝা সেটা বুঝলাম আরও কয়েকদিন বাদে। এবারকার এই 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' চলতে চলতে কী আশ্চর্য জনকভাবে, আর কী অপ্রত্যাশিতভাবে কতরকম লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে! একজনের মুখে শোনা অসম্পূর্ণ কাহিনি কী বিচিত্রভাবে আর একজন এসে সম্পূর্ণ করে দিয়ে যাচ্ছে। এই তো সেদিন হঠাৎ চান্দিনা কৃষক সমিতির আমার এক পরিচিত সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মুখে শুনলাম, এই বড়কামতার যুদ্ধে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, তারা নিজেরাও ভালোভাবেই জড়িত ছিলেন।

৩০শে এপ্রিল তারিখে পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন দ্বিতীয়বার বড়কামতা আক্রমণ করল, তখন শুধু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারাই তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেনি, বহু সাধারণ মানুষ সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল, এ কথা আমরা সেই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার মুখে আগেই শুনেছিলাম। আমাদের চান্দিনার সেই পরিচিত কৃষক কর্মীটির মুখে শুনলাম প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার কৃষক সেদিন এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

পরদিন ১লা মে তারিখে গতদিনের পরাজয়ের ঝাল মেটাবার জন্য সকাল দশটায় প্রায় হাজার খানেক পাকিসেনা পুনরায় এই অঞ্চলে আসে। গতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর বেশ বড়রকমের ঘাঁটি রয়েছে। তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে তারা বেশ বড়রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এখানে এসে হামলা করল। তারা চান্দিনার দুই মাইল পূর্বে কোরপাই থেকে আরম্ভ করে এক মাইল পশ্চিমে হাটখোলা পর্যন্ত সমস্ত পাকা রাস্তায় পজিশন নেয়। তাছাড়া কিছু দূরে দূরে মেশিনগান ও কামান পেতে রাখে। তিন-চারশ' পাকিসেনা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে এবং বাড়িগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে থাকে কিন্তু মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা তখন ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। হামলাকারীরা বুঝতে পারল যে, তাদের হাতের শিকার ফস্‌কে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চারদিককার গ্রামবাসীদের উপর মনের ঝাল মিটিয়ে এই রক্তখাদক মানুষ-শিকারির দল তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চলে গেল।

চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ : মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের চর এসে সংবাদ দিল, সামরিক ভ্যান-বোঝাই একদল পাকিসৈন্য ফেনী থেকে চন্দ্রগঞ্জের দিকে আসছে। ওদের যখন চন্দ্রগঞ্জের দিকে চোখ পড়েছে, তখন ওরা সেখানে লুটপাট না করে ছাড়বে না। খবর পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লুৎফর রহমান, যিনি এই অঞ্চলে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো হবে। এদের প্রতিরোধ করতে হলে দলে কিছুটা ভারী হয়ে নেয়া দরকার। খোঁজ-খবর করে অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ছয় জন মুক্তিযোদ্ধাকে জড়ো করা গেল।

সাত জন মানুষ সাতটি রাইফেল। এই সামান্য শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাওয়া ঠিক হবে কি? মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন। কথাটা মিথ্যা নয়, এটা একটা দুঃসাহসের কাজই হবে। অথচ হাতে সময় নেই, মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন, তার মধ্যে এই লুণ্ঠনকারী দস্যুরা এদের কাজ হাসিল করে সরে পড়বে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে যাবে, আর তারা বসে বসে তাই দেখবে! না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন সুবেদার লুৎফর রহমান, যেভাবেই হোক, এদের প্রতিরোধ করতেই হবে। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ওরা অক্ষতভাবে হাসতে হাসতে চলে যাবে- এ কিছুতেই হতে পারে না। ওরা আমাদের অনেক রক্ত নিয়েছে, তার বিনিময়ে ওদেরও কিছুটা রক্ত দিতে হবে।

রাস্তার ধারে একটা বড় রকমের ইটের পাঁজা। কে যেন কবে একটা দালান তোলবার জন্য এখানে এই ইটগুলো এনে জড়ো করে রেখেছিল। অনেকদিন হয়ে

গেল, সেই দালান এখনো তোলা হয়নি, ইটগুলো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। চন্দ্রগঞ্জে ঢুকতে হলে সৈন্যবাহী গাড়িগুলোতে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। সুবেদার লুৎফর রহমান আর ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা সেই ইটের পাঁজার পেছনে পজিশন নিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে থেকেই তাঁরা সেই হামলাকারী দস্যুদের প্রতিরোধ করবেন, এটা খুবই দুঃসাহসের কাজ। তাঁরা জানতেন, তারা তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চলেছেন। কিন্তু এমন এক-একটা সময় আসে যখন জেনে-শুনে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। অবস্থা বিশেষে বামন হয়েও তাঁদের দানবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে হয়। মুক্তিবাহিনীর নায়েক সুবেদার লুৎফর রহমান বললেন, এখনকার অবস্থা হচ্ছে তেমনি এক অবস্থা।

কিন্তু বেশি কথা বলার সময় ছিল না। দূরে থেকে অস্ফুট সামরিক ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। ঐ যে, ঐ যে আসছে ওরা! তাঁরা সাত জন সাতটি রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন। সেই অস্ফুট আওয়াজ ক্রমেই স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একটু বাদেই দেখা দিল সামরিক ভ্যান পথের ধুলো উড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। উত্তেজিত প্রতীক্ষায় তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন ইস্পাতের মতো দৃঢ় আর কঠিন হয়ে এল।

সামরিক ভ্যান দ্রুত আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল। না থেমে উপায় ছিল না, কাদের অদৃশ্য হস্তের গুলিতে গাড়ির টায়ারের চাকা ফুটো হয়ে গেছে। একই সঙ্গে কতগুলো রাইফেলের আওয়াজ। বিস্ময়ে আতঙ্কে সৈন্যরা ঝুপঝাপ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। কিন্তু সেই অদৃশ্য হস্তের গুলিবর্ষণের যেন শেষ নেই। সৈন্যদের মধ্যে যারা সামনের দিকে ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়ে ভূমিশয্যা নিল। একটু বাদেই রাইফেলের আওয়াজ থেমে গিয়ে পল্লী প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আর শান্তি ফিরে এল।

সৈন্যরা সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তন্ন তন্ন করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অদৃশ্য শত্রুরা কি তবে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? না, ওদের বিশ্বাস নেই, একটু বাদেই হয়তো ওরা আরেক দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে। রাস্তার দু'পাশে অনেক ঝোপঝাড় জঙ্গল। তাদের মাঝখানে ওরা কোথায় আশ্রয় নিয়ে বসে আছে কে জানে। তবে দলে ওরা ভারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা না হলে তাদের বিরুদ্ধে এমন করে হামলা করতে সাহস পেত না।

চন্দ্রগঞ্জ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এসে অবাধে লুটপাট করা যাবে- এই আশা নিয়ে তারা এখানে এসেছিল। এই অঞ্চলে তাদের একজন জামাতে ইসলামপন্থী দালাল ছিল। তার কাছ থেকে খবর পেয়েই তারা লুটের আশায় এখানে ছুটে এসেছে। তারা শুনেছিল এখানে তাদের 'বাধা দেবার মতো কেউ নেই।' কিন্তু

হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে এই শয়তানের দল মাটি ফুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কে জানে হয়তো ওরা ইতিমধ্যে তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে। প্রতিটি গাছ আর প্রতিটি ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে একজন করে শত্রু লুকিয়ে নেই, এমন কথাই বা কে বলতে পারে ! ওদের রাইফেলগুলো এইভাবে বহু গুলি অপচয় করার পর থামল?

কিছু সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। সৈন্যরা ভাবছিল, তাদের অদৃশ্য শত্রুরা সম্ভবত পালিয়ে গেছে। এমন প্রবল গুলিবৃষ্টির সামনে ওরা কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে! কিন্তু তাহলেও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা দরকার। এবার বেশ হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হবে। যারা হতাহত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে, ওরা তাদের একজন একজন করে ভ্যানের উপর তুলছিল। ঠিক সে সময়ে আবার কতকগুলো রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। গুলির পর গুলি আসছে, বিরতি নেই। সৈন্যদের মধ্যে এক অংশ আছে ভ্যানের উপরে, অপর অংশ রাস্তায়। অদৃশ্য হস্তগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। একটি গুলিও বৃথা যাচ্ছে না। সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল পড়ে গেল। তারা একটু সামলে নিয়ে আবার প্রবলভাবে গুলিবর্ষণ করে চলল। কিন্তু তাদের সামনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ দু'পক্ষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। ইতোমধ্যে সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপর পক্ষে অদৃশ্য প্রতিপক্ষের কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না।

অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সৈন্যরা। কিন্তু একটু আগেই তাদের দালাল, জামাতে ইসলামীপন্থী সেই লোকটি তাদের সাহায্যে করবার জন্য এসে গেছে। সে অত্যন্ত চতুর লোক, চারদিকে ভালোভাবে নজর করে সে এই রহস্যটা বুঝতে পারল। দূরবর্তী ইটের পাঁজাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বলল, আমার সন্দেহ হয়, ওরা ঐ পাঁজাটার পেছনে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কথাই তো, এই সন্দেহটা সকলের মনেই জাগা উচিত ছিল কিন্তু এতক্ষণ এই কথাটা ওদের কারও মাথায় আসেনি।

এবার ওদের রাইফেলগুলো একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল। সৈন্যরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে সন্তর্পণে তিন দিক দিয়ে এগিয়ে চলল। ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলতে হবে। খুব সাবধান, ওদের একটাও যেন সরে পড়তে না পারে। মুক্তিবাহিনীর জওয়ানরা ইটের পাঁজার আড়াল থেকে সবকিছুই দেখছিল। সৈন্যদের মতলব বুঝতে তাদের বাকী রইল না।

আর এক মুহূর্ত দেরি করার সময় নেই। এখনই তাদের সরে পড়তে হবে। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তারা যতটা আশা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হাসিল করতে পেরেছে। এবার তারা স্বচ্ছন্দে ছুটি নিতে পারে। একজন একজন

করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছুটা বাদে শিকার সন্ধানী সৈন্যরা এসে সাফল্যের সঙ্গে সেই ইটের স্তূপটাকে ঘেরাও করে ফেলল। কিন্তু কী দেখল এসে? দেখল, পাখিগুলো তাদের একদম বোকা বানিয়ে দিয়ে মুক্ত আকাশে উড়ে চলে গিয়েছে। ইটের পাঁজার পেছনে একটিও জন-প্রাণী নেই। শুধু মাটির উপরে অনেকগুলো কার্তুজের খোল ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

সেদিনকার যুদ্ধে সবসুদ্ধ ২৩ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল। আর মুক্তিবাহিনীর সাতটি জওয়ান সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। যে দেশদ্রোহী দালালটি শত্রুদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, এর কয়েকদিন বাদেই মুক্তি যোদ্ধারা তাকেও খতম করল।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ঘা খেয়ে পাকিসৈন্যদের চূড়ান্তভাবে নাজেহাল হতে হয়েছিল। চন্দ্রগঞ্জে লুটপাট করা দূরে থাক, হতাহত বন্ধুদের নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে ওরা মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই অপমান আর লাঞ্ছনা ওরা ভুলে যেতে পারেনি। দিন কয়েক বাদে ওরা আবার নতুনভাবে তৈরি হয়ে চলল চন্দ্রগঞ্জের দিকে। তাদের মনের জ্বালাটা এবার ভালো করেই মিটিয়ে নেবে।

পাকিসৈন্যরা আবার হামলা করতে আসছে, এই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল চন্দ্রগঞ্জে। সুবেদার লুৎফর রহমান এখন সেখানে নেই, অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মধ্যেও কেউ নেই। এবার কে তাদের প্রতিরোধ করবে? ওরা সেদিন আচ্ছামতো ঘা খেয়ে ঘরে ফিরে গেছে, এবার ভালো করেই তার প্রতিশোধ তুলবে। চন্দ্রগঞ্জকে এবার ওরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত না করে ছাড়বে না। যাকে পাবে তাকেই মারবে। ওদের হাতে কেউ কি রেহাই পাবে? সারা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চন্দ্রগঞ্জের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। ওরা ওদের যা করবার বিনা বাধায় করে যাবে।

কিন্তু চন্দ্রগঞ্জের একটি মানুষ এই কথাটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। না, কিছুতেই না, গর্জে উঠলেন তিনি, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আর যদি কেউ না যায় আমি একাই যাব, একাই গিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করব।

কে এই লোকটি? কী তাঁর নাম? না, তাঁর নাম আমার জানা নেই। কোনো খ্যাতনামা লোক নন তিনি। একজন বৃদ্ধ প্রাক্তন সৈনিক। আর দশজন বৃদ্ধের মতো তিনিও তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষ। কেউ কোনোদিন তাঁর কোনো অসাধারণত্বের পরিচয় পায়নি। কিন্তু আজ দেশের এক বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ অনুকূল মুহূর্ত তাঁর ভেতরকার সুপ্ত আগুনকে জাগিয়ে তুলছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ ভয়ে অস্থির, সেখানে এই একটি মানুষ দৃঢ় নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

যদি একা যেতে হয়, আমি একাই যাব, আমি একাই ওদের সঙ্গে লড়াই করব। মরবার আগে এই হিংস্র পশুগুলোর মধ্যে একটাকেও যদি মেরে যেতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হবে।

যারা তাঁর হিতৈষী, তারা তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। বলেছিল তুমি একা মানুষ, তার উপরে বুড়ো হয়েছ, তুমি কী করে ওদের সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু কারও কোনো বাধা তিনি মানলেন না, দৃঢ় মুষ্টিতে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থকে। তাঁর এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর তরুণ ছেলে তাঁকে ডেকে বলল, দাঁড়াও আব্বা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার মতো আমিও ওদের সঙ্গে লড়াই করব। ছেলের কথা শুনে বাপের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'জনের হাতে দু'টি রাইফেল, পিতাপুত্র পাশাপাশি প্রতিরোধ সংগ্রামে যাত্রা করল।

আজও ওরা সেই ইটের পাঁজার পেছনে আশ্রয় নিল। ওরা পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে শত্রুদের আগমনের জন্য অধীর চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে দূর থেকে মোটর ভ্যানের গর্জন শোনা গেল। হ্যাঁ, এইবার ওরা আসছে। দেখতে দেখতে সৈন্যবাহী গাড়ি একেবারে কাছে এসে পড়ল। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের কাছেই এই ইটের পাঁজাটি সুপরিচিত। ঐটিকে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়, কিন্তু আজও যে কেউ তাদের আক্রমণ করবার জন্য এর আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে, এটা তারা ভাবতে পারেনি। ভাবতে না পারা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ওরা এই স্তূপটার বরাবর আসতেই পর পর তিনজন সৈন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। সবাই দেখতে পেল, কে বা কারা তাদের লক্ষ্য করে স্তূপটার আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা এর পাল্টা জবাব দিল। ইটের পাঁজাটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ চলল। এরপর সেই স্তূপের পেছন থেকে আর কোনো গুলির শব্দ শোনা গেল না। সৈন্যরা একটু সময় অপেক্ষা করল, তারপর ছুটে গেল স্তূপটার সামনে। উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে ধরে যখন তারা পায়ে পায়ে সেই স্তূপটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখতে পেল, সেখানে এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। কিন্তু অস্ত্র বলতে কোনো কিছু সেখানে নেই, শুধু কয়েকটা কার্তুজের খোল পড়ে আছে। ওরা বুঝল, এই বৃদ্ধের সঙ্গে আরও যারা ছিল তারা অস্ত্রসহ পালিয়ে গিয়েছে।

সোনাইমুড়ি রেলস্টেশনে : চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের পর সুবেদার লুৎফর রহমান নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিকারের সন্ধানে ছুটে চলেছিলেন। তাঁর এক মুহূর্তও বিশ্রামের অবকাশ নেই। তিনি পাকিসৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে দক্ষ শিকারির মতো তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরছিলেন। মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচরেরা নিত্যনতুন

সংবাদ নিয়ে আসছে। আর সেই সূত্র অনুসরণ করে তাদের মুক্তিবাহিনী যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেই শত্রুদের উপর ঘা দিয়ে চলেছে।

এপ্রিলের শেষ ভাগ। খবর এল একদল সৈন্য কুমিল্লার লাকসাম থেকে ট্রেনে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছবে। লুৎফর রহমান এই খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। স্থির হলো, ওদের বিনা বাধায় এগুতে দেয়া হবে না। সোনাইমুড়ি স্টেশনেই এই হামলাকারীদের উপর হামলা করতে হবে। রেলস্টেশনে চড়াও হয়ে আক্রমণ। হয়তো সেজন্য মুক্তিবাহিনীকে বেশ কিছুটা মূল্য দিতে হবে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে নিতে হবে। তা হোক, এই শিকারকে কিছুতেই ফসকে যেতে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু এবার আর চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধের মতো সাতজন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে চলবে না। এবার আর আগেকার মতো আড়াল থেকে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ চলবে দিবালোকে প্রকাশ্যে, মুখোমুখি। ওদের সৈন্য সংখ্যা বড় কম নয়, আক্রমণ করতে হলে বেশ কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হবে। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চাশ জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে সোনাইমুড়িতে এনে জড়ো করা গেল। অবশ্য যতদূর জানা গিয়েছে, সৈন্যদের সংখ্যা এর চেয়েও অনেকটা বেশি। তা হোক, এই শক্তি নিয়েই ওদের সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে সৈন্যবাহী ট্রেনটা সোনাইমুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছল। মুক্তিবাহিনী কাছেই কোনো একটা জায়গায় লুকিয়ে ছিল। ট্রেনটা এসে পৌঁছবার সাথে সাথেই রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ট্রেনটাকে ঘেরাও করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ট্রেনের আরোহীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। ওরা গাড়ির ইঞ্জিনটাকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। ড্রাইভার ইঞ্জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। ফলে ড্রাইভারহীন ট্রেনটা অচল হয়ে গেল।

প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে আক্রান্ত হতে হবে, পাকিসৈন্যরা তা কল্পনাও করতে পারেনি। তারপর ঘটনাটা এমন দ্রুত ঘটে গেল যে, একটু সময় ওরা হতভম্ব আর স্তব্ধ হয়ে রইল। পর মুহূর্তেই তারা তাদের রাইফেল বাগিয়ে ধরে হুড়মুড় করে কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে পড়তে লাগল। ওদের মধ্যে কয়েক জনকে কামরা থেকে নামবার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ দিতে হলো।

এবার দু'পক্ষে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। এবারকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রেলস্টেশনের উপর এ ধরনের লড়াই আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি রেলস্টেশন এজন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রায় তিন ঘণ্টা

ধরে এই লড়াই চলল। এই যুদ্ধ পঁয়ত্রিশ জনের মতো পাকিসৈন্য নিহত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছয় জন শহীদ হলেন।

ইতিমধ্যে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে ঘণ্টাতিনেক বাদে আক্রান্ত পাকিসৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য চৌমুহনী থেকে সামরিক ভ্যানে করে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। এবার পাকিসৈন্যদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল আড়াইশতের উপরে। হতাহতদের বাদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা তখন আনুমানিক চল্লিশ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র। মুক্তিযোদ্ধারা এমন ভুল কখনও করে না। তারা যেমন বিদ্যুৎ গতিতে এসে আক্রমণ করেছিল, তেমনিভাবেই ঘটনাস্থল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকিসৈন্যরা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

['কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় সশস্ত্র প্রতিরোধের আরও বিবরণ' -এর অংশ বিশেষ 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ'-পুস্তক থেকে সংগৃহীত।- সম্পাদক]

মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম
জন্ম : নভেম্বর ১৯৩৭। নিহত : নভেম্বর ১৯৭৫

পরিশিষ্ট-১

ক. খালেদ মোশাররফ-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ও পারিবারিক পরিচিতি
খ. 'এখনই সময়- এ প্রকাশিত মৃত্যুর পটভূমি
গ. খালেদ মোশাররফ এর সামরিক অভ্যুত্থানের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী
ঘ. পর্দার অন্তরালের আরও কিছু ঘটনাবলী এবং জেল হত্যা
ঙ. খালেদ, হুদা ও হায়দার কীভাবে নিহত হলেন।
চ. 'জানি না কী লিখবেন-লিখলে কী হবে' বেগম সালমা খালেদ
ছ. আমার শত্রুরও যেন এ দুর্ভাগ্য না আসে
জ. খালেদ মোশাররফ ভারতের চর ছিলেন না

খালেদ মোশার্‌রফ- এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ও পারিবারিক পরিচিত

খালেদ মোশার্‌রফের গ্রামের বাড়ি জামালপুর জেলার ইসলামপুরের মোশাররফগঞ্জে। জন্ম ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। বাবা মোশার্‌রফ হোসেন। তিনি ছিলেন একজন পাট ও চামড়ার ব্যবসায়ী। ইসলামপুরের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন জনাব মোশার্‌রফ। বহু সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি অর্থদান করে গেছেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই গ্রামটির নাম দেয়া হয় মোশাররফগঞ্জ। একই নাম স্থানীয় রেল স্টেশনের। জনাব মোশার্‌রফ হোসেন ৩৬ বছর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের মেম্বার ছিলেন। খালেদ মোশাররফের আম্মার নাম জমিলা আখতার। খালেদ মোশাররফরা ছিলেন পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন। কিন্তু ছোট বেলায় তিন ভাই মারা যায়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাশেদ মোশার্‌রফের জন্ম হয়। খালেদ মোশার্‌রফের বোনরা হলেন, হেনা, বকুল, জ্যোৎস্না, রুনু ও রীনা। হেনার স্বামীর নাম জিয়াউল আমিন। তিনি ৬২ সালে এম পি ছিলেন এবং ১৯৮১ সালে ইন্তেকাল করেন। বকুলের স্বামীর নাম মজিবুর রহমান। তিনি বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। জ্যোৎস্নার স্বামীর নাম সাইদুর রহমান। তিনি একজন ব্যবসায়ী। রুনুর স্বামী ফকরুল হোসেন। তিনি একজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। রুনু বর্তমানে আনসার অ্যাডজুটেন্ট। রীনার স্বামী মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মক্কা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক। তিনি জন্মগতভাবে পাকিস্তানি নাগরিক। বর্তমানে রীনা ও তার স্বামী ব্রিটিশ নাগরিক।

খালেদ মোশার্‌রফ ছোট বেলা থেকে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইসলামপুর হাই স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তী সময় ময়মনসিংহ জেলা স্কুলেও দু'বছর পড়েছেন। তাঁর মামা চাকুরি করতেন কক্সবাজার। খালেদ তাঁর মামার বাসা থেকে ১৯৫৩ সালে এস, এস, সি পাস করেন। এরপর তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তিনি ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন খুবই রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৪ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তী সময় ১৯৫৫ সালে খালেদ মোশার্‌রফ সেনাবাহিনীতে লংকোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি কমিশন পান।

১৯৬৫ সালে তিনি সালমা খালেদকে বিয়ে করেন। একাত্তরের যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মেজর। বঙ্গবন্ধুর আহবানে খালেদ মোশার্‌রফই প্রথম বাঙালি সেনা যিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং জনা কয়েক পাকিস্তানি আর্মি অফিসারকে বন্দি করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসীম সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। তিনি মাহাজেরীন খালেদ, আমমেরীন খালেদ ও আয়রিন খালেদ এই তিন কন্যার জনক। ৩রা নভেম্বর '৭৫ তাঁর নেতৃত্বে দেশের দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের মুখে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর সেনানী খালেদ মোশার্‌রফ সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের গুলিতে নিহত হন।

সাপ্তাহিক 'এখনই' সময়ে প্রকাশিত মৃত্যুর পটভূমি

পনের আগস্ট। দেশের প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের পাঁচদিন পরে ২০ শে আগস্ট জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ফরমেশন কমান্ডার ও প্রধান স্টাফ অফিসারদের এক বৈঠক ডাকেন। মেজর ফারুক ও রশিদ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শফিউল্লাহর উপস্থিতিতে সিনিয়র অফিসারদের এ মর্মে জানালেন যে, প্রেসিডেন্ট মোশতাক মেজর ফারুক ও রশিদকে পাঠিয়েছেন 'শেখ মুজিবকে কেন হত্যা করা হয়েছে' তা বর্ণনা করার জন্য। মেজর রশিদ, শেখ মুজিবকে হত্যা করে খন্দকার মোশতাককে কেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, তা বলতে শুরু করলে কর্ণেল শাফায়াত জামিল তাকে থামিয়ে রাগান্বিত স্বরে বলেন, মোশতাক আমার প্রেসিডেন্ট নন। মোশতাক স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট; তিনি নির্বাচিত নন এবং তাঁর প্রতি আমার কোনো আনুগত্য নেই। মোশতাক এক জন খুনী, ষড়যন্ত্রকারী এবং প্রথম সুযোগেই আমি তাকে সরিয়ে দেবো। কর্ণেল শাফায়েত জামিলের এই ক্রোধমিশ্রিত বক্তব্যের পরে সভা আর অগ্রসর হতে পারেনি। বৈঠকের ঐখানেই পরিসমাপ্তি।

নানা ঘটনা প্রবাহে ২৪ শে আগস্ট জেনারেল শফিউল্লা ও এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকারের চাকুরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান ও এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

মাহবুবুল আলম চাষী রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের নতুন সামরিক সচিব হলেন লে. কর্ণেল আমিন আহমেদ চৌধুরী। এ বি এস সফদর এন এস আই- এর ডিরেক্টার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টিকর্তা ও রাও ফরমান

আলীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শফিউল আজমকে ক্যাবিনেট সচিব হিসাবে নিয়োগ করা হলো। কেরামত আলী হলেন সংস্থাপন সচিব। আর আইয়ুব-ইয়াহিয়ার প্রিয় ব্যক্তি কাজী আনোয়ারুল হক হলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা।

জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন অথচ তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি খোন্দকার মোশতাককে অভিনন্দন জানালেন।

অন্যদিকে গোলাম আজম জেদ্দা থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে উল্লাসিত হয়ে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহবান জানালেন। খাজা খায়ের উদ্দিন, মাহমুদ আলী অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন- আর হামিদুল হক চৌধুরী অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখলেন খন্দকার মোশতাককে। ভূট্টো বাংলাদেশকে ৫০ হাজার টন চাল ও এক কোটি ৫০ লক্ষ গজ কাপড় উপঢৌকন পাঠালেন। সৌদি আরব ও সুদান ১৬ই আগস্ট আর চীন ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল।

তাজউদ্দিন ২২শে আগস্ট নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামও গ্রেফতার হন সরকারি বাসভবন থেকে। প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী আত্মগোপন করেন। কিন্তু ওয়াবদুর রহমান ও শাহ মোয়াজ্জেম কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে তাঁর ছেলেরা আব্বার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেন। মোশতাকের মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী হতে অস্বীকার করায় ১৭ই আগস্ট মনসুর আলীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো। কোরবান আলী, আব্দুস সামাদ আজাদ, কামরুজ্জামানসহ প্রায় ২০ জন নেতা ২৩শে আগস্ট নাগাদ গ্রেফতার হলেন। ২৫ শে আগস্ট গ্রেফতার হলো তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং জিল্লুর রহমান।

আব্দুল মালেক উকিল আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে যোগদানের জন্য ২৩শে আগস্ট লন্ডন যান। এই সময় বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটে। ভারত সরকার এমর্মে ঘোষণা করে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এরূপ ঘটনায় ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। ফলে এমর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ভারত যে কোনো সময় হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ দখল করে নিতে পারে।

পরবর্তীকালে শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে খন্দকার মোশতাক বিশেষ দূত পাঠান এবং এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, পঁচিশ বছর মেয়াদী চুক্তিসহ সব বিষয়ে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। দিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনকেও বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতকে অবহিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এসময় মহিউদ্দিন আহমেদ (বাকশাল) বিশেষ

দূত হিসেবে মস্কো যান খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোদগর্নির কাছে তিনি মোশতাকের একটি চিঠি পৌঁছে দেন। এসময় ভারতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণরত ব্রিগেডিয়ার এরশাদকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর উপ স্টাফ প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না এই মর্মে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এরপর উপদেষ্টাদের পরামর্শে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভবনে অবৈধ ক্ষমতা দখল বৈধ করার উদ্দেশে জাতীয় সংসদের সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে সংসদ সদস্য সিরাজুল হক মোশতাককে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্বোধন করতে পারি না। কোন আইনের বলে মোশতাক প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জনাব হক তা জানতে চান। মোশতাক সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

এটা এমন এক সময়, যখন মেজর ফারুক ও রশীদ অন্যান্যদের নিয়ে বঙ্গভবনে বসবাস করা ছাড়াও প্রায়শই সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করতেন। মেজর ফারুক প্রেসিডেন্টের সাদা মার্সিডিজ গাড়ি পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার শুরু করেন। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভংগ করে বিদ্রোহী মেজরদের এইরূপ আচরণে উর্ধ্বতন অফিসারগণ ক্ষুব্ধ হন। ক্রমশ এই ক্ষোভ সেনাবাহিনীর সকল স্তরের অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী মেজরগণ অক্টোবরের শেষের দিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন যে, সেনানিবাস থেকে পাল্টা অভ্যুত্থান অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে। অক্টোবরের শেষের দিকে মোশতাক, ওসমানী, জেনারেল খলিল, ফারুক ও রশীদ আসন্ন পাল্টা অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন। জেনারেল খলিল বলেন যে, তিনি খালেদ মোশাররফ ও জিয়াকে সমভাবে সন্দেহ করেন। কে বেশি বিপজ্জনক? খালেদ অথবা জিয়া এ নিয়ে প্রায় প্রতিরাতেই বঙ্গভবনে আলোচনা সভা চলতে থাকে। মহল বিশেষের মতে এসময় ফারুক ও রশীদ খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনুগত সৈন্যদের নিয়ে একটি ব্রিগেড গঠন করে জিয়া, খালেদ ও অন্যান্য বিরোধী অফিসারদের গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব ভেবে পরবর্তীকালে বাতিল করা হয়।

উল্লেখ্য, যে কারণেই হোক, জেনারেল ওসমানী কিন্তু জেনারেল জিয়াকেই বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। এরই জের হিসেবে ২রা নভেম্বর রাতে জেনারেল ওসমানী জেনারেল খলিলকে সঙ্গে করে মোশতাকের কাছে যান এবং বলেন যে, সম্ভাব্য পাল্টা অভ্যুত্থান এড়ানোর জন্য জিয়াকে অবশ্যই সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। রশিদ সে সময় উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে শাসনতন্ত্র (সংবিধান) ও জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে মনোরঞ্জন ধরকে প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ রচনার দায়িত্ব দিয়ে ক্যাবিনেট সাব-

কমিটির দীর্ঘ বৈঠক শেষ হয়েছে। প্রকাশ, মধ্যরাত্রে ওসমানী খলিলকে সঙ্গে করে মোশতাককে এই মর্মে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, জিয়াকে অবশ্যই সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরাতে হবে। রশিদ এই প্রস্তাবের জোর আপত্তি তোলেন এবং বলেন যে, জিয়া নয়, বরং খালেদ ও শাফায়াত জামিলই বিপজ্জনক। মোশতাকের কানে কানে রশিদ বললেন, জিয়াকে সরানোর প্রস্তাবের পেছনে ওসমানীর গভীর ষড়যন্ত্র আছে। মোশতাক এমর্মে জবাব দিলেন, ঠিক আছে, যদি জিয়াকে সরানো হয় তাহলে পরবর্তী সেনা প্রধান কে হবেন?

রশিদ ভাবলেন, ওসমানী নিশ্চয়ই খালেদের নাম বলবেন। ওসমানী যদি খালেদের নাম প্রস্তাব করে, তাহলে এটা নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, ওসমানী খালেদের পক্ষের লোক। ওসমানী পরদিন নতুন সেনা প্রধানের নাম প্রস্তাব করবেন বলে বঙ্গভবন ত্যাগ করেন।

রশিদ করিডোর দিয়ে হেঁটে তাঁর শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন জোয়ান দৌড়ে এসে জানালো, ইনফ্যান্ট্রির লোকজন যারা বঙ্গভবন পাহারা দিচ্ছিল, তারা এই মাত্র চলে গেল। ওরা আমাদেরকেও চলে যেতে বলল। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোশতাকের দপ্তরে বসে, রশিদ প্রথমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াকে ফোন করেন। জিয়া তখন ঘুমাচ্ছিলেন। রশিদ তাঁকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারপর রশিদ ফোনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলেন। রশিদ ও ব্রিগেডিয়ার খালেদের মধ্যে উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর বিনিময় হয়। এরপর রশিদ বাংলাদেশ রাইফেলস সদর দপ্তরে ফোন করে কোনো সাড়া না পেয়ে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবকে ফোন করেন। তাওয়াবের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলেন না। তাওয়াব বঙ্গভবনে যেতে অস্বীকার করলেন।

রশিদ এবারে ফোন করলেন ওসমানীকে। ওসমানী তখন তাঁর ঢাকা সেনানিবাস-এর বাসভবনে ঘুমাচ্ছিলেন। রশিদ জানালেন, রাষ্ট্রপতি মোশতাক অবিলম্বে তাঁকে বঙ্গভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওসমানী তৎক্ষণাৎ বঙ্গভবনে আসতে রাজি হলেন; কিন্তু তাঁর কোনো গাড়ি ছিল না। ওসমানী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বহু সৈন্যকে ঘোরাফেরা করতে দেখলেন। জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ রাইফেলস সদর দপ্তরে ফোনে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য অবিলম্বে বঙ্গভবনে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু তাঁর নির্দেশ মতো কোনো বি ডি আর সৈন্য বঙ্গভবনে যায়নি। ওসমানী তারপর জেনারেল জিয়াকে ফোন করেন। বেগম জিয়া ফোন ধরে জানালেন যে, জিয়া বন্দি। তাই ফোন ধরতে পারবেন না। ওসমানী তখন খালেদ মোশার্‌রফের বাসায় ফোন করে জানতে পারলেন, খালেদ চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে আছেন। ওসমানী সেখানে ফোন করে খালেদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলেন, খালেদ মোশার্‌রফই পাল্টা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, খালেদ মোশার্‌রফ ও শাফায়াত জামিল বেশি কিছুদিন ধরে বঙ্গভবনে অবস্থানরত বিদ্রোহী মেজরদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। বিশেষ করে শাফায়াত জামিল কখনই সেনাবাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' ভঙ্গকারী মেজরদের অসদাচরণ গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রায়ই জেনারেল জিয়ার কাছে নির্দেশ চাইতেন, বিদ্রোহী মেজরদের শাস্তি দেবার জন্য। তিনি জেনারেল জিয়ার কাছে অভিযোগ করতেন, মেজররাই দেশ চালাচ্ছে। অথচ সেনাবাহিনীর 'চেইন অফ কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আপনি আদেশ দিলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবো। জিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে কখনো এ বিষয়ে নির্দেশ দেননি।

খালেদ মোশার্‌রফের-এর সামরিক অভ্যুত্থানের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী

খালেদ মোশাররফ ১লা নভেম্বর তারিখে শাফায়াত জামিলকে ডেকে বললেন, তুমি কি এখনও 'চেইন অফ কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী? জামিল সম্মতি জানালে খালেদ তাঁকে বললেন, পরিস্থিতি সীমার বাইরে চলে গেছে। আমাদের এখনই পাল্টা আঘাত করা উচিত। সেদিনই বিকেলে ঢাকা স্টেডিয়ামের কাছে একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় গোপন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। খালেদ ও জামিলের সঙ্গে আরও দুজন বিশ্বাসভাজন জুনিয়ার অফিসারও উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। সেই বৈঠকে পাল্টা অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। জুনিয়ার অফিসাররা জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার কথা বললে, খালেদ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, পরদিন বঙ্গবভন আক্রমণ করে বিদ্রোহী মেজরদের ও তাদের ট্যাংক বহরকে বের করে এনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে। জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করে পরবর্তীকালে অবসর প্রদান করা হবে।

পরিকল্পনা মোতাবেক ২রা নভেম্বর বিকেলে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানি কমান্ডার মেজর ইকবালকে তার সৈন্যসহ বঙ্গভবন থেকে সেনানিবাসে ফিরে আসতে নির্দেশ দেয়া হয়। মেজর ইকবাল মধ্যরাত্রে তার অধীনস্থ প্রায় ৩০০ সৈন্যসহ ঢাকা সেনানিবাসে চলে আসেন। প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহকে অর্ডার দেয়া হলো, জেনারেল জিয়ার বাস ভবনে যেতে। হাফিজউল্লাহ ক্ষিপ্র গতিতে সৈন্যদের নিয়ে জিয়ার বাসভবনে ঢুকে পড়েন। এর আগে রশিদের টেলিফোন পেয়ে জিয়া জেগেই ছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী হচ্ছে? ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লা জিয়ার বুক বরাবর

বন্দুক তাক করে বললেন, স্যার আপনি বন্দি। হাফিজউল্লাহ জিয়াকে গৃহবন্দি করে রাখলেন।

১৯৭৫ সালের ২রা নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের শাসন ক্ষমতা বেশ কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বেশ কিছু রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল বঙ্গভবনে। মরহুম জেনারেল ওসমানী অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও পালন করেন। উল্লিখিত কয়েকদিনের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেল। জেনারেল ওসমানী ১৯৮১ সালে সেই কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন দু'জন সাংবাদিকের কাছে। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত 'সর্বাধিনায়ক ওসমানী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ২রা ও ৩রা নভেম্বর ৭৫-এর মধ্যবর্তী রাতে মোশতাক আহমদ কয়েকজনকে নিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ বের করার জন্য আলোচনায় বসেন। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন ধর, মালেক উকিল, ইউসুফ আলী, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; যে সংসদ বাকশাল কায়েম করেছিল, সেই সংসদই গণতন্ত্র কায়েম করবে। ওসমানী এতে সন্দেহ পোষণ করলে, তাঁকে বলা হয়, সংসদের মাধ্যমে এটা করা সহজ এবং সামরিক আইনের মাধ্যমে এটা করা উচিত হবে না। আলোচনার শেষে ওসমানী তাঁর বাসভবনে চলে যান। গাড়ির ড্রাইভার তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেয়েই টেলিফোনে জানায়, বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনীর প্রহরা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে টেলিফোন করেন। জিয়া তাঁকে জানান, তিনিও খোঁজ নিচ্ছেন কী হলো। এরপর ওসমানী জেনারেল খলিলুর রহমানকে ঘটনা জানান এবং নির্দেশ দেন প্রয়োজন বোধে বিডিআর দিয়ে প্রহরার ব্যবস্থা করার জন্য। পরে আবার টেলিফোন করেন জিয়াকে। বেগম খালেদা জিয়া টেলিফোন ধরলে তিনি জিয়াকে চান। বেগম জিয়া আম্‌তা আম্‌তা করলেন। টেলিফোন ছেড়ে দেন ওসমানী। পরে তিনি টেলিফোন করলেন খালেদ মোশার্‌রফকে। উত্তর নেই। তার পর টেলিফোন করলেন কর্ণেল শাফায়াত জামিল ও ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হককে। উত্তর নেই। আবার জিয়াকে টেলিফোন করলেন। বেগম ধরলেন– উদ্বিগ্ন মনে হলো না। কিন্তু ফোনে জিয়াকে পাওয়া গেল না। আবার চীফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশার্‌রফ এবং আমিনুল হককে টেলিফোন করলেন। খালেদ মোশার্‌রফ বললেন, তিনি কিছুই জানেন না। ইতিমধ্যে ওসমানী টেলিফোন পেলেন বিমান বন্দর, টেলিফোন কেন্দ্র, বেতার কেন্দ্র দখল করা হয়েছে।

আবার টেলিফোন করলেন খালেদ মোশার্‌রফকে। জিজ্ঞেস করলেন কী হচ্ছে? খালেদ মোশার্‌রফ আশংকা করে বললেন যে, ট্যাংক বাহিনী সম্ভবত

আক্রমণ করতে পারে। জবাবে ওসমানী বললেন, ট্যাংক বাহিনী আক্রমণ করে কিছুই করতে পারবে না। খালেদ মোশার্‌রফ জানালেন, তিনি দেখছেন কী করা যায়। কিছুক্ষণ পরে খবর পাওয়া গেল জঙ্গি বিমান টেক অফের। এরপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন হকের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে চড়ে ওসমানী বের হয়ে এলেন। তার আগে ডিজিএফআই এয়ার কমোডর আমিনুল ইসলামকে ফোন করে বললেন, এটা খুব খারাপ হচ্ছে। এভাবে জাতি ধ্বংসের পথে চলে যাবে। গৃহযুদ্ধও শুরু হয়ে যেতে পারে। এয়ার কমোডর বললেন যে, তিনি বা তাঁর লোকজন ঢুকতে পারছেন না। ওসমানী বের হয়ে এসে তেজগাঁ বিমান বন্দরের সামনে এয়ার ফোর্সের কে, এম সালামের বাংলোতে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখলেন, সেখানে আর এক ব্যক্তি বসা। সেই ব্যক্তি তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যে ওখানে গিয়েছেন তা যেন কেউ না জানে। ওসমানী যখন বের হয়ে আসছেন তখন আর একজন ভিআইপি-কে দেখলেন। সেখান থেকে ওসমানী এলেন বঙ্গভবনে। খন্দকার মোশতাক তখন শুয়ে এক শোফায়। রেসকোর্সের ট্যাংক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে টেলিফোন এল জেট বিমানটি গুলি করে নামানোর অনুমতি চেয়ে। ওসমানী সে অনুমতি দেননি। টেলিফোন করে খালেদ মোশার্‌রফকে বললেন বিমানটি নামিয়ে নিতে। খালেদ মোশার্‌রফ-এর জবাবঃ- তিনি চেষ্টা করছেন।

দুপুরের দিকে কয়েকজন অফিসার এল বঙ্গভবনে। তাঁরা খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চান। সামান্য কথাবার্তার পর তাঁরা ওসমানীকে বললেন, খন্দকার মোশতাককে এই প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। ওসমানী তাতে রাজি হননি। নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরদিন তিন বাহিনীর প্রধান এসে জানালেন, খন্দকার মোশতাকের প্রতি তাঁরা অনুগত। এই বৈঠকে খালেদ মোশার্‌রফ পকেট জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ একটি পত্র দেখান। এই পর্যায়ে একজন নতুন চীফ অব আর্মি স্টাফ নিয়োগের জন্য চাপ দেয়া হয়। খন্দকার মোশতাক বললেন, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারবেন না। সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসলো। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান এবং নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানের কক্ষে খালেদ মোশাররফ এসে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে চলে গেলেন। এরপর মন্ত্রিসভায় আলোচনা শুরু হলো জেল হত্যা সম্পর্কে।

কিছুক্ষণ পর ক্যাবিনেট রুমের দরজা খুলে তাওয়াব ইশারা করলেন ওসমানীকে বাইরে যেতে। ওসমানী বাইরে এসে দেখেন, তাওয়াব ও খালেদ মোশার্‌রফ। তাঁদের দাবি খুব শীঘ্রই চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করতে হবে। তখন এডমিরাল এম এইচ খানও উপস্থিত ছিলেন। খন্দকার মোশতাকও বাইরে এলেন এবং তৎক্ষণাৎ চীফ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করলে আকস্মিক ভাবে শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে কয়েকজন ক্যাবিনেট রুমে ঢুকে পড়ে এবং সবার দিকে অস্ত্র তাক করে। ওসমানী এসে কাউকে কিছু না বলে সবাইকে ধরে ধরে

বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। একটু পরেই শাফায়াত জামিল এসে খন্দকার মোশতাককে বললেন, "আপনাকে এবং মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।"

এ পর্যায়ে মনোরঞ্জন ধর অথবা আসাদুজ্জামান জবাব দিলেন, "তাহলে স্পিকার মালেক উকিলকে রাষ্ট্রপতি করতে হবে।" এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শাফায়াত জামিল কটু মন্তব্য করলেন, "আপনারা যদি সংসদীয় গণতন্ত্র বাদ দিয়ে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, এটাও পারবেন করতে।" এরপর ওসমানী তাকে সতর্ক করায় শাফায়াত জামিল ওসমানীর সঙ্গেও রূঢ় ব্যবহার করেন। এসময় খালেদ মোশাররফ শাফায়াত জামিলকে সরিয়ে নিয়ে যান।

বেশ কিছুক্ষণ পর বঙ্গভবনের একজন অফিসার এসে ওসমানীকে খবর দিলেন, প্রধান বিচারপতি সায়েম আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে বিচারপতি সায়েম জানতে চান, তাঁকে কেন আসতে বলা হয়েছিল। ওসমানী বললেন, যদিও তিনি তাঁকে আসতে বলেননি, তবুও বিচারপতি সায়েম যদি এসময় রাষ্ট্রপ্রধান হন তাহলে দেশটা অন্তত আইনের পথে চলবে। সবাই তখন আতংকিত। এরপর মন্ত্রী সভার সদস্যদের চলে যেতে বলা হয়। রয়ে গেলেন তাহের ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম এবং আরেকজন। খন্দকার মোশতাক তখনো সেখানে বসে ছিলেন। ওসমানী বললেন, খন্দকার সাহেব এখনও রাষ্ট্রপতি, তাঁকে এভাবে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়। তখন ব্রিগেডিয়ার মশহুরুল হক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে খন্দকার মোশতাককে উপরের তলায় রাষ্ট্রপতির কক্ষে নিয়ে যায়।

পরদিন রেডিওতে দেশবাসী জানতে পারল যে, স্পিকার ছাড়াও কোনো মনোনীত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন এমর্মে খন্দকার মোশতাক অধ্যাদেশ জারি করেছেন।

৭ই নভেম্বর সকালে যখন জেনারেল ওসমানী নিচতলায় বাড়িওয়ালার সাথে বসে চা খাচ্ছিলেন, তখন খন্দকার মোশতাকের টেলিফোন এল। টেলিফোনে খন্দকার মোশতাক জানালেন, কিছু সামরিক ও বেসামরিক লোক তাকে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। মোশতাক সাহেবের অনুরোধে রেডিও খুলে ওসমানী জিয়ার বক্তৃতা শুনতে পেলেন। জিয়া বলছেন, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ফলে আইনের চোখে তখন দেশে তিন জন কর্ণধার। ওসমানী সাহেব বাসা থেকে বের হয়ে এলেন ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য। এরমধ্যেই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এবং দ্রুত সংগঠিত হয়েছে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান। প্রবল গোলাগুলি ও সিপাহী-জনতার ভিড় ঠেলে বেতার কেন্দ্রে এসে দেখলেন, খন্দকার মোশতাক এক শোফায় শুয়ে আছেন। মোশতাক বললেন, তাকে কিছু সামরিক ও বেসামরিক লোক বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রপতি হতে বলছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।

যেহেতু আগের দিনই বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। বহু চেষ্টার পর জেনারেল জিয়াকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তার অবস্থান

সম্পর্কে খবর নিয়ে ওসমানী প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন প্রধান এবং সেনাবাহিনীর প্রধানকে আর্টিলারি রেজিমেন্টের দফতরে সমবেত হতে অনুরোধ জানালেন। জেনারেল (অব.) ওসমানী তৎকালীন রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব মাহবুব আলম চাষীকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গোলাগুলির ভেতরে রওয়ানা দেন। আর্টিলারি রেজিমেন্টের দফতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে জিয়া ও কর্ণেল তাহের বসে। ওসমানী জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আবু তাহের তুমি এখানে কেন? তাহের জবাব দিলেন, তিনিই জিয়াকে মুক্ত করেছেন। ওসমানী জিয়ার দিকে তাকাতেই তিনিও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন।

বৈঠকে এমর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে রাষ্ট্রপতি সায়েমকেই হতে হবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। তখন জিয়া বলেন, তিনি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে অন্য দুই বাহিনী প্রধান আপত্তি করলে ঠিক হয় যে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকারের লক্ষ্য হবে বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা। সেদিনকার এই বৈঠকের সবগুলো সিদ্ধান্ত জেনারেল ওসমানীর উপদেশে গৃহীত হয়েছিল।

পর্দার অন্তরালে আরও কিছু ঘটনাবলী এবং জেল হত্যা

এক্ষণে আগের কিছু নাটকীয় ঘটনার কথা। রাত তখন তিনটা। জেনারেল ওসমানী খবর পেলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকেরা বিমান বন্দর, ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র এবং শহরের বিভিন্ন অংশ দখল করেছে। ট্যাংক বাহিনী ও ইনফেন্ট্রী সৈনিকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধ জেনারেল আসন্ন গৃহযুদ্ধের কথা ভেবে চিন্তিত।

এদিকে বঙ্গভবনে মেজর রশিদ জেনারেল জিয়ার ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছিল। রশিদ দ্বিতীয়বার জিয়ার বাসায় ফোন করেন। বেগম জিয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জানালেন, তাঁর স্বামীকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।

এসময় রশিদ যখন এই ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য আতংকগ্রস্ত হয়ে জিয়ার 'কাপুরুষতা' ও 'অক্ষমতাকে' দোষারোপ করছিলেন, তখন তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশার্‌রফের ফোন পেলেন। খালেদ আপোসের জন্য পরামর্শ দিলে রশিদ ক্ষিপ্ত হয়ে ফোনে রাগারাগি করেন।

এদিকে বঙ্গভবনে ট্যাংক রেজিমেন্টের সৈন্যরা ইনফেন্ট্রি সৈন্যদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছিল ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের সৈন্যরা ভোরের আগেই বঙ্গভবন আক্রমণ করবে।

ভোর চারটার সময় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির ফোন বেজে উঠে। রশিদ ফোন ধরলেন। অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আমি ডি আই জি প্রিজন, আমি রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলতে চাই। রশিদ খোন্দকার মোশতাকের হাতে রিসিভার হস্তান্তর করলেন। মোশতাক ফোন ধরে বেশ কিছুক্ষণ শান্ত ভাবে শুনলেন এবং বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী ব্যাপারে আলাপ হলো রশিদ তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রকাশ, দুই মাস আগে পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হলে মেজর ফারুক ও রশিদ (অনেকের মতে) কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। এক্ষণে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সম্মতি।

রিসালদার মোসলেউদ্দিন কয়েকজন সৈন্যসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা প্রাপ্ত হন। ডি আই জি প্রিজন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন। ৪ঠা নভেম্বর বিকেলে বিগ্রেডিয়ার খালেদ, শাফায়েত জামিল ও আমিনুল হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার থেকে এই তথ্য জানা যায় যে, মোসলেহউদ্দিন কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে তাদের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানান। ডি আই জি প্রিজন জেল আইনের পরিপন্থী এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। তখন মোসলেউদ্দিন রশিদকে ফোন করেন। রশিদ ডিআই জি প্রিজনকে মোসলেউদ্দিনের কথা মতো কাজ করতে বলেন। ডি আই জি প্রিজন এবারও অস্বীকৃতি জানালে মোসলেউদ্দিন ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে ডি আই জি প্রিজন প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে কথা বলেন এবং তার পরেই মোসলেউদ্দিন ও তাঁর দলকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেন।

তাজউদ্দিন ও সৈয়দ নজরুল একই সেলে থাকতেন। মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান পাশের সেলে। প্রকাশ, তাঁদের সবাইকে তাজউদ্দিনের সেলে নিয়ে এসে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। তাজউদ্দিনের তলপেটে ও পায়ে গুলি লাগে। প্রবলভাবে রক্তক্ষরণের পর তাজউদ্দিন ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এ দিকে এ মর্মে গুজব রটে যায় যে, তাজউদ্দিন ও অন্যান্যরা খালেদ মোশার্‌রফের সাহায্যে ৩রা নভেম্বরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। এই অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতের হাত ছিল এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য খালেদ এই অভ্যুত্থান করেছেন বলেও গুজব রটে যায়। এনায়েতুল্লা খানের সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। Bangladesh the Unfinished Revolution গ্রন্থে লিফৎসুলজ লিখেছেন রয়টার সংবাদদাতা আতিকুল আলমের হাতে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনের কাছে

লেখা অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা বিষয়ক তাজউদ্দিনের স্বহস্তে লিখিত চিঠি ছিল। আতিকুল আলম অবশ্য জোরে শোরে এ কথা অস্বীকার করেন। জিল্লুর রহমান খান Leadership Crisis in Bangladesh গ্রন্থে লিখেছেন যে, খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিল একটি মুজিবপন্থী অভ্যুত্থান। কারণ চারনেতা বীরোচিত ভাবে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

আসলে এসবই ছিল অসত্য ভাষণ। তাজউদ্দিন গ্রেফতার হন ২২শে আগস্টে। পনেরই অক্টোবর পর্যন্ত কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি। এদিন বেগম তাজউদ্দিনকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের জন্য তাজউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়। বেগম তাজউদ্দিন সর্বশেষ দেখা করেন ১লা নভেম্বর, তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৩৬ ঘন্টা আগে। তখন চারজন সামরিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এই দুইবার সাক্ষাত ছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাজউদ্দিনের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

খালেদ মোশার্‌রফ ভারতপন্থী ছিলেন এবং তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। খালেদের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হয় ৩রা নভেম্বর রাতে। খালেদ তাজউদ্দিনকে দিয়ে সরকার গঠন করতে চাইলে ৪ঠা নভেম্বরই আওয়ামী লীগ নেতাদের জেল থেকে মুক্ত করে সরকার গঠন করতে পারতেন। আসলে খালেদ জেল হত্যার বিষয়ে ত্রিশ ঘন্টা পরে জানতে পারেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত কর্ণেল ফারুক ও রশিদ লিখিত "মুক্তির পথ" পুস্তকে খালেদকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। খালেদ ভারত কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে কাজ করেছিলেন একথার বিরুদ্ধে মত পোষণ করে তারা লিখেছেন, খালেদ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং কখনই আওয়ামী লীগ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাননি।

উল্লেখ্য যে, একটি আওয়ামী লীগের মিছিল ৪ঠা নভেম্বর বিকেলে ৩২ নং ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে। সরকার এই মিছিল করতে বাধা প্রদান করেনি। বিশেষ করে খালেদের মা ও ভাই রাশেদ মোশার্‌রফ এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। গুজব রটনাকারীদের গুজব ছড়াতে এই ঘটনা সাহায্য করে।

তিনজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সমন্বয়ে জেল হত্যা তদন্তের জন্য জুডিসিয়াল কমিশন গঠিত হয়। রহস্যময় কারণে জিয়া তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে এই কমিশনকে তদন্ত করতে দেননি এবং আজ পর্যন্ত কোনো তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি।

আবার খালেদ মোশর্‌রফ-এর অভ্যুত্থান সম্পর্কে আরও কিছু প্রাসংগিক কথাবার্তা। বঙ্গভবনে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর

দুটি মিগ বিমান এসময় বঙ্গভবনের উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তৎক্ষণাৎ একজন ট্যাংক অধিনায়ক ওয়ারলেসে জানান যে, একটি রাশিয়ান তৈরি হেলিকপ্টার বঙ্গভবনের চত্বরে অবস্থিত ট্যাংক বহরের উপর দিয়ে বৃত্তাকারে উড়ছে। ট্যাংক অধিনায়ক গুলিবর্ষণ করে ভূপাতিত করার অনুমতি চান। জেনারেল ওসমানী কঠোরভাবে গুলিবর্ষণ করতে নিষেধ করেন।

কিছুক্ষণ পরে সেনানিবাস থেকে দুজন কর্ণেল এবং মেজর ডালিম ও নুর বঙ্গবভনে ফিরে এলেন। পাল্টা অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজিব হত্যায় জড়িত মেজর ডালিম ও নুর সেনানিবাসে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সমঝোতার জন্য গিয়েছিলেন। এক্ষণে তাঁরা ফিরে এসে বঙ্গভবনে জানালেন যে, খালেদ তিনটি দাবি করেছেন। প্রথমত, ট্যাংক বহরকে নিরস্ত্র করে সেনানিবাসে ফেরৎ পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়ত, জেনারেল জিয়ার স্থলে একজন সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করতে হবে এবং তৃতীয়ত মোশতাক প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন, তবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অবশ্য পরিবর্তন করতে হবে। যে সব দেশ দুঃসময়ে বাঙালি জাতির বন্ধু হিসেবে এগিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে।

মোশতাক এ সকল দাবি মানতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তাঁদেরকে বলেন যে, বিগ্রেডিয়ার খালেদকে এই মর্মে জানিয়ে দেয়া হোক যে, ভোর ৬ টার পরে তিনি (মোশতাক) আর রাষ্ট্রপতি থাকছেন না।

আলোচ্য অফিসারগণ আবার সেনানিবাসে যান। দুঘণ্টা পর ফিরে এসে জানালেন যে, মাত্র দুটো দাবিতেই খালেদ সমঝোতার রাজি আছেন। এগুলো হচ্ছে, ট্যাংক বহরকে নিরস্ত্র করে সেনানিবাসে পাঠাতে হবে এবং একজন নতুন সেনাবাহিনী প্রধান করতে হবে। মোশতাক অফিসারদের জানান যে, তিনি এসব দাবি মানতে পারবেন না। কারণ ভোর ৬টার পর থেকে তিনি আর রাষ্ট্রপতি নন। অফিসাররা তখন রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানীর দিকে তাকালেন। ওসমানী জানালেন, যেহেতু মোশতাক রাষ্ট্রপতি নন সেহেতু তিনিও আর রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নন। এতে মেজর ডালিম ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার করে ওসমানীকে বললেন, আপনে রশিদ ও ফারুককে আত্মসমর্পণ করতে বলুন। এভাবেই বঙ্গভবনে উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর বিনিময় হতে লাগল এবং অফিসাররা বঙ্গবভন ও সেনানিবাসে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন।

সকাল দশটায় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ নুরুল ইসলাম বঙ্গভবনে জেনারেল খলিলকে ফোনে জেল হত্যার খবর দেন। জেনারেল খলিল এই খবর পেয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে অনতিবিলম্বে এই দুঃসংবাদ রাষ্ট্রপতির সচিব মাহবুব আলম চাষীকে জানান। চাষী তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতির কক্ষে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানালেন মোশতাক সব কিছুই অবগত আছেন।

জেনারেল খলিল জেল হত্যাকাণ্ডের সংবাদে ক্ষুব্ধ হলেও কাউকে কিছু বললেন না। এই কারণেই ৩৬ ঘণ্টা পরে শাফায়াত জামিল খলিলকে গ্রেফতার করার হুমকি দেন এবং বলেন, তাঁর নীরবতার কারণেই হত্যাকারীরা দেশত্যাগ করতে পেরেছেন।

জেল হত্যাকাণ্ডের পরে রশিদ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। জেল হত্যার কথা ফাঁস হয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে পড়বে, এই ভেবে যুদ্ধ করার চাইতে নিরাপদে দেশত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করেন।

সম্ভবত, এই কারণেই রশিদের পরামর্শে মোশতাক, খালেদ মোশাররফ ও শাফায়েত জামিলকে অনুরোধ করেন যে রশিদ ও ফারুককে নিরাপদে তাঁদের পরিবারবর্গসহ দেশ থেকে চলে যেতে দিতে। খালেদ মোশার্‌রফ ও শাফায়েত জামিল এই প্রস্তাবে রাজি হন। মেজর রশিদ ও ফারুক এবং অন্যান্য যারা দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক তাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দেয়া হলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াবকে। এই পর্যায়ে মোশতাক স্বয়ং মেজরদের সাথে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান। কিন্তু খালেদ তাতে রাজি হননি। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ১৭ সদস্যবিশিষ্ট দল বাংলাদেশ ছেড়ে ব্যাংককে যান। এদের মধ্যে মেজর ফারুক ও রশিদের সঙ্গে ডালিম, নুর, হুদা, পাশা এবং শাহরিয়ারও ছিলেন।

মেজরদের দেশ ত্যাগের পর বঙ্গভবনে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। খালেদ মোশার্‌রফ চেয়েছিলেন মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু মোশতাক বললেন, তিনি ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন এবং নিজস্ব বাসভবনে চলে যাচ্ছেন। এভাবে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলার পর মোশতাক দুইটি শর্তে রাষ্ট্রপতি থাকতে সম্মত হলেন। প্রথমত, সেনাবাহিনীকে তার প্রতি অনুগত থাকতে হবে এবং তার আদেশ মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভাকে বৈঠকে বসতে দিতে হবে এবং মন্ত্রিসভাকে তাঁর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। খালেদের কাছে এই সব শর্ত মনঃপুত হলো না। তিনি দাবি করলেন, তাকে জেনারেল জিয়ার স্থলে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করতে হবে। খালেদের এই দাবি এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াব এবং কমোডর এম, এইচ, খান সমর্থন করেন। খন্দকার মোশতাক এবং খালেদ মোশাররফের মধ্যে রাত এগারোটা পর্যন্ত তর্ক চলতে থাকে। পরদিন ৪ঠা নভেম্বর তাঁরা আবার আলোচনায় বসবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেদিনকার মতো বৈঠক শেষ হয়।

পরদিন সকাল ১০ টায় খলিল, তওয়াব এবং কমোডর খানকে সঙ্গে করে খালেদ মোশার্‌রফ এলেন বঙ্গভবনে এবং জেনারেল জিয়ার পদত্যাগ পত্র দেখালেন। জেনারেল জিয়ার স্বহস্তে লিখিত এই পত্রে জিয়া লিখেছেন যে, তিনি যেহেতু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে চান না; সেহেতু পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক এবং একই পত্রে জিয়া পূর্ণ পেনশন ও ভাতাদির জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

একথা বিশ্বাস করা যায় যে, যেহেতু জিয়া গৃহবন্দি ছিলেন সেহেতু বোধগম্য কারণে জিয়ার কাছ থেকে জোর করে এই পদত্যাগ পত্র নেয়া হয়। জিয়ার পদত্যাগের পর স্বাভাবিকভাবেই অভ্যুত্থানকারীদের নেতা খালেদের জন্য সেনাবাহিনীর প্রধান হতে আর কোনো বাধা রইল না। মোশতাক খালেদকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সেই দিনই বিকালে মোশতাক মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকতে রাজি হলেন। এই সিদ্ধান্তের পর তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন সামরিক গোয়েন্দা প্রধান এয়ার কমোডর আমিনুল ইসলাম ত্রস্তপদে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাজউদ্দিন ও অন্যান্যদের জেলে হত্যাকাণ্ডের কথা জানালেন। তখন অভ্যুত্থানকারী মেজরদের দেশত্যাগের ৩০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

অবিলম্বে বঙ্গবভনের নিচতলায় ক্যাবিনেট রুমে ২৬ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল। বৈঠকে কেন ফারুক, রশিদ ও অন্যান্যদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হয়েছে এ-নিয়ে তুমুল বির্তক হয় এবং জেলহত্যা তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। খালেদ মোশার্‌রফকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগের বিষয়টিও আলোচিত হয়। মোস্তাক চতুরভাবে জেনারেল ওসমানীর দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তিনি শুধু তার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানীর সুপারিশ ক্রমেই খালেদ মোশার্‌রফকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করতে পারেন। ওসমানী উচ্চৈস্বরে জানালেন যে, সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং এতে কিছু সময় লাগবে। খালেদ মোশর্‌রফ ও তার সহকর্মীরা এতে রাগান্বিতভাবে বাদানুবাদ শুরু করেন। এক পর্যায়ে মোশতাক এমর্মে খালেদকে বলেন, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনেক ব্রিগেডিয়ারকে দেখেছি, সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। এই সময়ে আকস্মিকভাবে সশব্দে দরজা খুলে গেল। যমদূতের মতো পাঁচজন সশস্ত্র অফিসারসহ ছড়ি হাতে কর্ণেল শাফায়াত জামিল ক্যাবিনেট রুমে প্রবেশ করল। উপস্থিত মন্ত্রিসভার সদস্যরা এই ঘটনায় এতই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা আসন ছেড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হন। মেজর ইকবাল এ সময় খন্দকার মোশতাকের মাথা বরাবর স্টেনগান তাক করে বললেন, "আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার দেখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর দেখেননি, এখন দেখবেন"।

মোস্তাক তখন মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। জেনারেল ওসমানী মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং গুলি করতে নিষেধ করলেন। খন্দকার মোস্তাকের পদত্যাগ দাবি করে শাফায়াত জামিল বললেন, "আপনি একজন খুনী, আপনি জাতির পিতাকে হত্যা করেছেন। জেলে ৪ নেতাকে হত্যা করেছেন, আপনি খুশী। আপনার সরকার অবৈধ। আপনার ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই।

আপনাকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে।" এরপর শাফায়াত জেনারেল খলিলের দিকে তাকালেন এবং বললেন "জেল হত্যার কথা জানা থাকলেও আপনি আমাদের জানাননি। আপনাকে বন্দি করা হলো।"

জেনারেল ওসমানী এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খন্দকার মোস্তাককে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করেন এবং মোস্তাকও পদত্যাগ করতে রাজি হলেন। তখন মন্ত্রিসভার সদস্যরা আবার নিজ নিজ আসনে বসলেন। শাফায়াত জামিল প্রস্তাব করলেন, প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর এতে বাধা দিয়ে বলেন যে, এটা আইনগতভাবে ঠিক হবে না। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শাফায়াত জামিল এতে রাগান্বিত স্বরে বলেন, "আপনারা হত্যাকাণ্ড বৈধ করার জন্য শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং আপনারা আবার শাসনতন্ত্র পরির্তন করতে পারেন। আমি বলছি প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি হবেন।" এভাবে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। খন্দকার মোশতাকসহ তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং কে, এম, ওবায়দুর রহমানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো।

৫ই নভেম্বর রাত ১টায় প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হলো। বিচারপতি সায়েমকে জেনারেল ওসমানী বললেন, আপনাকেই দেশের প্রেসিডেন্ট হতে হবে। বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট হতে অস্বীকার করলে জেনারেল ওসমানী বললেন, "আল্লাহর দোহাই, আপনি রাজি হন। তা না হলে দেশে কোনো আইন-শৃংখলা থাকবে না। দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।" শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সায়েম সবার অনুরোধে রাষ্ট্রপতি হতে সম্মত হলেন এবং ৬ই নভেম্বর বাংলাদেশের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

খালেদ মোশার্‌রফ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াব ও কমোডর এম এইচ খান খালেদের সামরিক পোশাকে সহাস্যে মেজর জেনারেল ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। বাংলাদেশ অবজারভারের প্রথম পাতায় বড় আকারের এই ছবি প্রকাশিত হলো। দুইদিন পরে সিপাহী বিদ্রোহে খালেদ নিহত হলে তওয়াব ও এম এইচ খান জিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে ৩, ৪, ও ৫ই নভেম্বর কোনো সরকার ছিল না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ স্বাধীনতা যুদ্ধকালে "কে" ফোর্স কমান্ডার হিসেবে একটি ব্রিগেড পরিচালনা করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে স্বয়ং বীরোচিতভাবে অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আর এইজন্য বীরোত্তম খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর একজন প্রথিতযশা অফিসার হিসেবে তাঁর সুনাম ও জনপ্রিয়তার অন্ত ছিল না। কিন্তু খালেদ তাঁর এই সুনাম ও জনপ্রিয়তা কাজে লাগাতে পারেননি।

একজন দক্ষ ও সাহসী অফিসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞ ও অপারদর্শী।

অভ্যুত্থানকারী সামরিক অফিসার হয়ে যার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করা হয়েছে তাঁরই কাছে খালেদ পদোন্নতি প্রার্থনা করেছেন। পৃথিবীর দেশে দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। মাত্র তিন মাস আগে মোশতাক নিজেও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিহত হলে জাতীয় সংসদের স্পিকার অথবা উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব না দিয়ে তিনি নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সংবিধানের কোন ধারা বলে মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। অথচ এই ধরনের একটি অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েও মোশতাকের সঙ্গে পদোন্নতি ও সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগের বিষয়ে খালেদ দেন-দরবার শুরু করেন। ভাগ্যের পরিহাস! বিচারপতি সায়েম যখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন মোশতাককে দিয়ে স্পিকারের বদলে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন এই অধ্যাদেশ সই করিয়ে নেন। অথচ কোনো কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। শাফায়াত জামিলের ৪৬তম ব্রিগেড দিয়েই তিনি একটি সফল অভ্যুত্থান করতে পারতেন এবং নিজেকে সেনাবাহিনী প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, এমনকি রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করতে পারতেন। খালেদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই দেশে তিনদিন সরকার না থাকায় জনগণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। দেশে কী হচ্ছিল জনগণ তা' এসময় জানতে পারেনি। খালেদ বেতার বা টেলিভিশনে একটি ঘোষণা বা বক্তৃতা করেও জনগণকে প্রকৃত পরিস্থিতি জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মেজর হাফিজ পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনি একটি ভাষণের খসড়া তৈরি করে খালেদের কাছে যান এবং আর কালক্ষেপ না করে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। খালেদ তখন তওয়াব ও এম এইচ খানের সঙ্গে হাসিগল্পে মশগুল ছিলেন। হাফিজের কথায় কর্ণপাত করেননি। শাফায়াত জামিল বলেছেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যেসব মেজররা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে নেপথ্যে থেকে দেশ পরিচালনা করছিলেন, তাদের বের করে দিয়ে সেনাবাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' ঠিক করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল অথবা জিয়াকে অন্তরীণ বা অবসর প্রদান করে খালেদের সেনাবাহিনী প্রধান হওয়া মূল পরিকল্পনায় ছিল না। সম্ভবত এসব কারণেই খালেদ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

ঢাকা সেনানিবাসে ৭ই নভেম্বর মধ্যরাতে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। এর আগে দুই দিন ধরে ঢাকা সেনানিবাসে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বেঙ্গল ল্যানসার ও দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সৈনিকেরা এই পরিস্থিতিতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জেনারেল জিয়ার অপসারণ, মোশতাক ও ওসমানীর পদত্যাগ,

সর্বোপরি অভ্যুত্থানের নেতা ফারুকসহ সকল অফিসারদের দেশত্যাগের ফলে তাঁরা নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করছিলেন না। এছাড়া দশম ইস্ট বেঙ্গল ও পনের ইস্ট বেঙ্গলকে ঢাকায় আনার খবরে এরা আসন্ন বিপদের আশংকায় অসহায় বোধ করতে থাকেন। ৫ই এবং ৬ই নভেম্বরে মুসলিম লীগ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক খালেদ মোশার্‌রফ- বিরোধী লিফলেট ছড়ানো হয়। এই সময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও বিপ্লবী গণবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। এই সব লিফলেটে খালেদকে দেশদ্রোহী ও ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সন্নিকটে অবস্থিত অফিসার্স মেসে জনৈক ব্যাটম্যান দৌড়ে এসে একজন অফিসারকে বললেন, আপনারা পালান স্যার। সিপাহীরা আপনাদেরকে মারতে আসছে। অফিসাররা পেছনের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

খালেদ, হুদা এবং হায়দার কীভাবে নিহত হলেন

খালেদ মোশার্‌রফকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সদর দপ্তর থেকে সিপাহী বিদ্রোহের কথা জানানো হয়। খালেদ আগেই গোলমালের কথাটা আঁচ করতে পেরে তাঁর পরিবারবর্গকে শহরের গোপন স্থানে সরিয়ে দিয়েছিলেন। রাত সাড়ে এগারটার সময় খালেদ ও শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনে তাওয়াব ও এম, এইচ, খানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এঁরা খালেদের সঙ্গে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সমমর্যাদা চাচ্ছিলেন। এঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সায়েম হবেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। অন্য দিকে খালেদ নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হতে আগ্রহী এবং প্রায় এক ঘন্টা ধরে বির্তক চলাকালে ঢাকা সেনানিবাস থেকে সিপাহী বিদ্রোহের খবর আসে।

খালেদ তৎক্ষণাৎ বঙ্গভবন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শাফায়েত জামিল যেতে অস্বীকার করেন। খালেদ নিজে গাড়ি চালিয়ে কর্ণেল হুদা ও লে. কর্ণেল হায়দারকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েন। কর্ণেল হুদা রংপুরে অবস্থনরত ৭২ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন এবং হায়দার চট্টগ্রামে অবস্থানরত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। এরা সম্ভবত খালেদের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। অনেকের মতে খালেদ ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শাফায়েত জামিল বলেন, খালেদ মীরপুর রোড ধরে শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত দশম ইস্ট বেঙ্গলে যাচ্ছিলেন। পথে ফাতেমা নার্সিং হোমের কাছে গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে গাড়ি থেকে তিন জনই নেমে পড়েন। খালেদ ফাতেমা নার্সিং হোম থেকে দশম ইস্ট বেঙ্গলে ফোন করেন পরিস্থিতি জানার জন্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দশম ইস্ট বেঙ্গল খালেদ মোশার্‌রফ পরিচালিত 'কে' ফোর্সের অন্তর্গত ছিল। স্বাভাবিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের খবর সত্ত্বেও দশম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন নিবিড় সম্পর্কের কথা ভেবে খালেদ নিজেদেরকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। খালেদ, হুদা এবং হায়দার হেঁটে দশম ইস্ট বেঙ্গলে গেলেন এবং রাত্রি যাপন করলেন।

সাতই নভেম্বর সকাল। আর্মড ও আর্টিলারির কিছু সৈন্য দশম ইস্ট বেঙ্গলে আসে এবং দশম ইস্ট বেঙ্গলের সিপাহীদের বিদ্রোহে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানায়। এতে দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। দশম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল নওয়াজেস উত্তেজিত সৈন্যদের শান্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু সিপাহী বিদ্রোহের আপাতত লক্ষ্য ছিল অফিসারদের নিশ্চিহ্ন করা; সেহেতু নওয়াজিসও ভীত হয়ে পড়েন। যতদূর জানা যায়, কর্ণেল তাহেরের গঠিত "বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার" সৈনিকবৃন্দ তাহেরের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে মেজর আসাদের কাছে পৌঁছে দেন। মেজর আসাদ ও মেজর জলিল প্রাণ বাঁচানোর জন্য সিপাহীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং দশম ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যদের উত্তেজিত করে তোলেন। এসময় পরিস্থিতি লে. কর্ণেল নওয়াজেসের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

খালেদ তখন সিগারেট খাচ্ছিলেন। হুদা আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে চুপচাপ ঘরের এক কোণে বসেছিলেন। হুদা ভীত হওয়ায় খালেদ ধমক দিচ্ছিলেন, "হুদা, ডোন্ট বি কাউয়ার্ড।" হায়দার নির্ভীকভাবে পরটা মাংস খাচ্ছিলেন। এমন সময় মেজর জলিল ভিতরে এসে লে. কর্ণেল হায়দারের শরীর থেকে তাঁর সুন্দর জ্যাকেটটি খুলে নিজেই পরে নেন। এই ঘটনায় হায়দার দারুণ মর্মাহত হয়ে বলেন, "তুমি করছো কী? আমি কী করেছি, আমি কি অভ্যুত্থান করেছি?"

উল্লেখ্য যে, জলিল ও আসাদ ১৩তম বেঙ্গলে হায়দারের অধীনে চাকুরি করেছেন এবং সে সময় হায়দারের সাথে এদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই হায়দার তাঁর নিজের প্রতি আক্রমণ হবে না এই ভেবে নিশ্চিত ছিলেন। ঠিক এমনি এক সময়ে একজন এন, সি, ও হায়দারের বুক বরাবর রাইফেল দিয়ে গুলি করেন। হায়দার আর্ত চিৎকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর আসাদ ও জলিল স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে খালেদকে হত্যা করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে মেজর আসাদ ও মেজর জলিল যে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সময় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জিয়া তিনবার নওয়াজেশকে ফোন করেন এবং খালেদকে যেন হত্যা না করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ করেন। সর্বশেষ ফোনে

নওয়াজেশ যখন জিয়াকে জানালেন যে, আসাদ ও জলিল আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে তখন জিয়া আসাদকে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলার জন্য নওয়াজেশকে অনুরোধ করেন। আসাদ ও জিয়ার মধ্যে ফোনে আলাপ হওয়ার আগেই খালেদ, হুদা ও হায়দার নিহত হন।

মেজর আসাদ ও মেজর জলিল এক সাক্ষাৎকারে নিজেরাই এদের হত্যা করেছেন একথা অস্বীকার করেন। তবে বলেন যে, ও রকম পরিস্থিতিতে তাঁরা (খালেদ, হুদা ও হায়দার) মারা না গেলে সৈন্যরা আমাদের মেরে ফেলতো। মেজর আসাদ বলেন, দেশ ভারতের হাতে চলে যাচ্ছিল। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। [সাপ্তাহিক 'এখনই সময়'- এ ১৯৮৯ সালের ২-৮ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে সংকলিত এবং কিঞ্চিৎ সংশোধিত।- সম্পাদক]

'জানি না কী লিখবেন-লিখলে কী হবে'

বেগম সালমা খালেদ

"চিন্তা করো না, ভালো আছি। কাল সকালে আসবো"। সকালে এসেছিল। তবে সে নয়। আমার চাচা। আমাকে বললেন– "খালেদকে ওরা মেরে ফেলেছে"। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কখন সালমা খালেদের শেষ কথা হয়েছিল, তা জানার জন্যে প্রশ্নটি শেষ করার আগেই উপরোক্ত কথা ক'টি বলেছিলেন বেগম সালমা খালেদ। গুলশানের ৫৬ নম্বর সড়কের নিরিবিলি একটি বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান সালমা খালেদ। বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশার্‌রফ তাঁর কাছে এখন শুধুই স্মৃতি। সুখকর জীবনের প্রতিটি আচরণ এখন তাঁকে ভাবায়। তিনি ভাবেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোকে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল। দশ বছরের দাম্পত্য জীবন। একটি দশক। শত দশকে মিশে গেছে। চোখের জলে একাকার হয়ে আছে মনের হাজারো গোপন কথা। তিনি ভালো আছেন- ভালো নেই।

সালমা যখন ইডেনে পড়তেন তখনই বউ হয়ে এসেছিলেন একজন সেনা অফিসারের। এক রোখা মানুষের স্ত্রী হিসেবে তাঁর জীবন কখনো এক ঘেঁয়েমি ছিল না। খালেদ মোশার্‌রফ ছিলেন তাঁর স্বামী, তাঁর বন্ধু, তাঁর অভিভাবক। গৃহবধূর জীবনে স্বামীই একমাত্র পৃথিবী। সালমার কাছে সে পৃথিবী এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, আরব্য উপন্যাসের রাক্ষসপুরী। সময় কাটে ছবি দেখে আর কন্যাদের সাথে কথা বলে। কথার ফাঁকে তিনি বললেন, ময়মনসিংহ জেলার আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো খালেদও ছিল অত্যন্ত বন্ধু প্রিয়। কারণে অকারণে বন্ধুদের দাওয়াত করে খাওয়ানোটা ছিল খালেদের নিত্য অভ্যাস। সেনা জীবনের ব্যস্ততম সময়েও পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভুল হতো না কখনো।

বিয়ের বছরে খালেদ মোশার্‌রফের পোস্টিং ছিল পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমিতে। সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে বেগম সালমা বললেন, কী ভাবে তাঁর সঙ্গে খালেদা জিয়ার পরিচয় হয়েছিল; কী ভাবে তিনি জেনেছিলেন জিয়াউর রহমানকে। একই বিল্ডিং-এ থাকতেন। তাঁরা উপরে এবং জিয়া নিচে। খালেদা জিয়া এখনো তাঁর নিকট বন্ধুদের একজন। তবে খুব একটা দেখা হয় না।

২রা নভেম্বর '৭৫। কী হয়েছিল সেদিন? এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি জবাব না দিয়ে বেগম খালেদ (সালমা) যে কথা বলেছেন, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব ধারণা। তিনি ধারণা করেছিলেন সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে (শৃংখলা) আনার জন্যে তাঁর স্বামী সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। এ ধারণা তিনি আঁচ করেছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে স্বামীর আলোচনা থেকে। বেগম খালেদ স্পষ্টত যে কথা বললেন, তা হলো খালেদ মোশার্‌রফ-এর সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তিনি কখনও ভারতীয় রাজনীতি বিশ্বাস করতেন না। বরং স্বাধীনতা-উত্তর সময় খালেদকে অনেকবারই তিনি বলতে শুনেছেন, 'ভারতের গতিবিধি আমার কাছে ভালো লাগে না।' ৭৫ নভেম্বরে সেই উত্তপ্ত সময়ের বিশেষ কোনো স্মৃতি বা কথা বেগম খালেদ মোশর্‌রফকে বিশেষভাবে ভাবায় কি-না একথা জানতে চেয়েছিল আমাদের (সাপ্তাহিক এখনই সময়) প্রতিবেদক।

-অবশ্যই ভাবায়। আমি ওর সাথে দেখা করার জন্যে আর্মি কোয়ার্টারে যাই। রাতে ওর সাথে দেখা হয়। একসাথে খাবার খেয়েছি। খালেদ আমাকে বলল "তুমি চলে যাও মা'র বাড়িতে। আমি বঙ্গভবনে গেলাম; মিটিং আছে। ফিরতে সকাল হয়ে যেতে পারে"।

আমাকে একটা গাড়িতে তুলে দিল। সে উঠলো অন্য গাড়িতে। ছোটো মেয়ে আইরিন আমার কোলে। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে আইরিন কেঁদে উঠল। কান্নার শব্দে খালেদ নেমে এল তাঁর গাড়ি থেকে। কোলে নিলো। বুকে জড়িয়ে আদর করলো অনেকক্ষণ। আমি সে কান্নার অর্থ আজো খুঁজে পাই না। আমি না জানলেও অবুঝ শিশু হয়তো জেনেছিল। আর সে রাতেই আমার সাথে তাঁর শেষ কথা হয়েছিল– 'কাল আসবো।' একথা বলেছিল, বাসায় ফিরে আমি যখন গভীর রাতে ফোন করেছিলাম বঙ্গভবনে।

তিন মেয়ের সাজানো সংসার ভাবনায় তাঁর জীবন কাটে এখন। বেগম সালমা খালেদ বর্তমানে ব্যবসা করেন। 'অপসরা' রেডিমেট জামা কাপড়ের দোকান। বনানীতে একটি ভাড়া করা দোকানে তাঁর ছোট্টো এই ব্যবসা। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। মেঝ মেয়ে দিল্লীতে লেখা পড়া করছে। ছোটো মেয়ে হলিক্রসের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। বেগম খালেদের একটি মাত্র অভিযোগ দেশের কাছে, দেশের মানুষের কাছে। আর তা হলো- দেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাকে মেরে ফেলল অথচ কেউ এ বিষয়ে কিছু বলল না। বিচার হলো না। উপরন্তু মিথ্যা

অভিযোগে তাঁকে ব্যর্থ অভ্যুত্থানকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হলো এবং হচ্ছে। দেশ আছে। দেশের মানুষ আছে। আছে দেশের আইন। অথচ এই দেশটি যাঁরা স্বাধীন করল, তাঁদের অন্যতম একজন সেরা ব্যক্তি নির্মম-ভাবে নিহত হলো। আর বলতে পারলেন না বেগম সালমা খালেদ। চোখ ভর্তি পানি নিয়ে বললেন– দীর্ঘদিন পরে হলেও আপনারা এলেন তাঁর জীবন কাহিনি লিখতে। জানি না কী লিখবেন। লিখলে কী হবে। আমার কাছে যা সত্য তা হলো–আমার পৃথিবী শূন্য।

আমার শত্রুরও যেন এ দুর্ভাগ্য না আসে

"শোকের দাবানলে অহর্নিশ দাগ্ধহ হচ্ছি। জানি, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এ-দাহ থেকে মুক্তি নেই। খালেদ আমার জীবন ছিল। আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিল। ও চলে গেছে। সাথে নিয়ে গেছে আমার সুখ-শান্তি, সাধ-আহ্লাদ। এখন শুধু বেঁচে আছি বাচ্চাদের জন্যে। আমার কিছু হয়ে গেলে ওদের দেখার কেউ নেই। তাই মনকে শক্ত রাখার চেষ্টা করি। এতে কী যন্ত্রণা তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কায়মনবাক্যে সদা প্রার্থনা করছি আমার চরম শত্রুর জীবনেও যেন কোনোদিন এ-দুর্ভাগ্য না আসে।"

কান্না জড়িত কণ্ঠে কথা বলছিলেন মরহুম খালেদ মোশার্‌রফের স্ত্রী বেগম সালমা খালেদ। বেগম খালেদ আরও বললেন, পাষাণ চাপা ভাগ্য আমার, তাই খালেদের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর কেঁদে বুক হাল্কা করার জায়গাও ছিল না। বাচ্চা তিনটা নিয়ে খড়কুটার মতো এখানে-সেখানে প্রাণ-ভয়ে ভেসে বেড়িয়েছি। আমার থাকার জায়গাও ছিল না। দুর্যোগ মুহূর্তে আমার কেউ ছিল না। কী ভাবে যে দিন কেটেছে তা ভাবতেও আজ ভয়ে শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। ওর লাশ পেয়েছি চারদিন পর। শুধু দুঃখ এই, এক বোঝা মিথ্যে অপবাদ মাথায় নিয়ে ওকে মহাযাত্রায় পাড়ি দিতে হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মরলো না। মারা পড়লো মুক্ত স্বদেশে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত হয়ে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে ছিলেন খালেদ। ব্রেন অপারেশন করতে হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন ওর বাঁচার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। আশ্চর্যজনকভাবেই সেদিন বেঁচে উঠেছিলেন। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! তাকে জীবন দিতে হলো স্বদেশের মাটিতে। ও কোনো অন্যায় করলে, বিচার তো হতে পারতো। কিন্তু এভাবে মারা হলো কেন?"

প্রশ্নটা তুলেই আনমনা হয়ে গেলেন বেগম খালেদ মোশাররফ। আমরা নীরবে শুনছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর বেগম খালেদ মোশার্‌রফ বলে উঠলেন, অনেক তর্ক-বিতর্ক শুনি। কিন্তু এ যাবৎ কেউ বলছেন না যে উনি মৃত্যুকালে কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ওর মৃত্যুর পর পরই আমার ক্যান্টনমেন্টের বাসা লুট হয়ে যায়। বিছানাপত্র থেকে শুরু করে জামাকাপড় পর্যন্ত আমি আর পাইনি।

আপনার সাথে শেষ দেখা কখন হয়? প্রশ্ন করলাম। বেদনা বিধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ছ' তারিখ রাতে। মা'র বাসা থেকে আমি ক্যান্টনমেন্টের বাসায় চলে আসি। ইচ্ছে ছিল রাতে যাবো। কিন্তু খালেদ নিষেধ করলেন। বললেন, রাতে আমি বাসায় যাবো না, কাজ আছে। তুমি মা'র বাসায় চলে যাও। ওর কথায় আমার একটু রাগও হয়েছিল। তাই এক বসনে বাচ্চাদের নিয়ে মা'র বাসায় ফিরে আসি। এর পরের দিন আসার কথা ছিল। কে জানতো এটাই হবে ওর শেষ আলাপ। জানেন, আমাদের বিয়ে হয়েছে '৬৫ সালে। সেই থেকে আমি সব সময় নিজের বাসায় থাকতেই ভালোবাসতাম। কখনও আরেক বাসায় থাকতে মন চাইতো না। তাই সেদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর কথামতো মা'র বাসায় চলে এসেছিলাম। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই ভাবতাম, ওর আগে আমি যেন মরি। ওর কোলে মাথা রেখে মরার বড় সাধ ছিল। হলো না। হতে দিলো না।"

চোখ ছলছল হয়ে উঠলো বেগম খালেদ মোশার্‌রফের। বেগম সালমা খালেদ এবারও অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। কান্না সংবরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা। ওকে অতীত থেকে বর্তমানে আনার জন্য তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমানে আপনার সংসার কী ভাবে চলছে। উত্তর দিতে গিয়ে গলা ধরে এল বেগম খালেদের। একটু থেমে বললেন, "মৃত্যুর সময় ও কিছুই রেখে যায়নি। ১৪ হাজার টাকা লোন ছিল। কেটে নেয়া হয়েছে। গুলশানের এ-বাড়িটা আমার নামে অ্যালটমেন্ট হয়েছে। যে কোনো সময় ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে। ওর পেনশনের টাকা আর আত্মীয়স্বজনদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর কোনো মতে টিকে আছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। খালেদ নেই, আমাকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিলেও সে সুখ আর আসবে না। তিনটি মেয়ে রেখে গেছে খালেদ। ওদের মাঝেই আমি বিবর্ণ অতীতকে ভুলার চেষ্টা করছি। গুলশানের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিলো আমাদের। শাদা শাড়ি পরিহিতা বেগম সালমা খালেদ উত্তর দিচ্ছিলেন। ওঁর বড় মেয়ের সেদিন জ্বর ছিল। আর পাশে বসে ছোটো মেয়ে দু'টি ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

খালেদ মোশার্‌রফ ভারতের চর ছিলেন না

'এখনই সময়'

৩রা নভেম্বর ভারতীয় সরকারের পূর্ব ইঙ্গিত বা ইচ্ছাই যে ব্রিগেডিয়ার মোশার্‌রফ প্রতি- অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন, তা সুনিশ্চিত করে বলবার মতো কোনো জোর প্রমাণ কখনো পাওয়া যায়নি। খালেদ মোশার্‌রফের ঘনিষ্ঠ সামরিক সূত্রের মতে এ

ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সত্যিকারভাবেই ভারতের সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না। খালেদের এই সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীতে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধার। অভ্যুত্থানের (প্রথম) ফলে মুজিবের মৃত্যুর পর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব কাঠামো অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল। এক কথায় এঁরা একটা গতানুগতিক বুর্জোয়া সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কাঠামো ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তারা আরো দাবি করেন যে, বেসামরিক নেতৃত্বের সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আগস্ট মাসের শেষ দিক থেকেই, আর্মি চীফ অফ স্টাফ জিয়াকে মুজিবের হত্যাকারী মেজরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চীফ অফ জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশার্‌রফকে চাপ দিয়ে আসছিলেন। এই অফিসাররা মুজিবকে হত্যার পর উর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ অমান্য করে তাদের অধীনস্থ সিপাহীসহ ব্যারাকে ফিরে আসতে অস্বীকার করেছিলেন। পনেরই আগস্ট থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত সময় মেজর রশীদ ও ফারুকের অধীনস্থ বেঙ্গল ল্যান্সার ও আর্মড কোর-এর সেনারা বঙ্গভবনের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। এরা নিরস্ত্র হবার ভয়ে ব্যারাকে ফিরতে অস্বীকার করে। এ ছাড়া খোন্দকার মোশতাকও তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত একমাত্র সামরিক ইউনিট হিসেবে এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। খালেদের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, জিয়া এই মেজরদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করায় দু'জনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। জানা যায়, অক্টোবরের শেষের দিকেও জিয়া এমর্মে খালেদকে বলেন যে, উপযুক্ত সময় হয়নি।

খালেদ উল্টো তর্ক করে বলেন, সিনিয়র অফিসাররা জেনারেলদের মতো হাবভাবকারী এইসব মেজরের কাছ থেকে আদেশ নিতে নিতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। মনে হয় আগস্টের পনের তারিখের রাত্রেও খালেদ একইভাবে জিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন, এদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। কিন্তু, এধরনের কোনো পদক্ষেপ অপরিপক্ক হবে বলে জিয়া খালেদকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করেন।

মনে হয়, অন্যান্যের মতো খালেদও আগস্টের আগে জিয়ার সাথে এই মেজরদের ও মোশতাক চক্রের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। খালেদকে মুজিবের অনুগত লোক মনে করে মেজরদের দল কিংবা মোশতাকের লোকেরা কখনো তাঁর সাথে যোগাযোগ করেনি।

সামরিক বাহিনীর সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়, জিয়ার বিরুদ্ধে খালেদ স্বীয় প্রতি-অভ্যুত্থানকে পুরোপুরি সেনাবাহিনীর নিজস্ব ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। স্থিতিশীলতার স্বার্থে এজন্যই তিনি খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি রাখতেও রাজি ছিলেন। '৭৬-এর জুন মাসে এই লেখকের (এখনই সময়'-এর

প্রতিবেদক) সাথে এক সাক্ষাৎকারে মোশতাক স্বীকার করেন যে, খালেদ তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি নিজেই রাজি হননি। বন্ধুদের মতে অন্যান্য অফিসারের চাপে 'নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা পুনরুদ্ধারের' আশায়ই হঠাৎ করে তিনি এই পদক্ষেপ নেন; যা জিয়া নিতে অস্বীকার করেছিলেন। অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার তিনি 'বেসামরিক' নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু এই ব্রিগেডিয়ার যদি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন যে, তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে আলাদা রাখতে পারবেন; তা'হলে বলতেই হয়, খালেদ মোশার্‌রফের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল বাস্তব বুদ্ধিহীন, নিতান্তই সহজ সরল।

বিশ্বস্ত কোনো সামরিক শক্তি ছাড়া মোশতাকের পক্ষে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মুজিবের হত্যাকারী সামরিক শক্তির অপসারণের পর মুজিবের অনুগত শক্তি আবারও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। খালেদ কি এমন একটা পুনরুদ্ধারকরণের পক্ষে ছিলেন? তিনি কি জেনেশুনে এদের পক্ষে কাজ করেছিলেন? যে ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অভ্যুত্থানের পরদিন ৪ঠা নভেম্বর মুজিবপন্থীদের একটি মিছিলে খালেদের মা ও ভাই নেতৃত্ব দিলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল যে, মুজিবপন্থীরাই এটা ঘটিয়েছে। খালেদের পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, খালেদ এই ঘটনায় তাঁর মা ও ভাই-এর ওপর প্রচণ্ডভাবে রেগে গিয়েছিলেন।

৫ই নভেম্বর ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মুজিবপন্থী মিছিলের নেতৃত্বে খালেদের মা ও ভাই-এর ছবি দেখে সাধারণ মানুষের মনে হয়েছিল যে, সত্যিকারভাবেই সেনাবাহিনীর ফন্দি এটা। এই ছবিই ছিল খালেদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

খালেদকে ভারতীয় চর অভিধায় অভিষিক্ত করার পেছনে যে দু'জন বাংলাদেশির অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হচ্ছেন দু'জন সাংবাদিক— আতিকুল আলম ও এনায়েতউল্লাহ খান। এনায়েতউল্লাহ খান খালেদ মোশর্‌রফের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। আতিকুল আলম রয়টার ও বি বি সি-র ঢাকাস্থ সংবাদদাতা। নভেম্বরের চার ও পাঁচ তারিখে আতিকুল আলম ঢাকায় কূটনীতিক মহলে ঘুরে ঘুরে দাবি করেন যে, তাঁর কাছে কারান্তরীণ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও মুজিব মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য তাজউদ্দিন আহমদ-এর লেখা একটা চিঠি রয়েছে। ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেনকে লেখা কথিত এই চিঠিতে অভ্যুত্থানের প্ল্যান ও প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ লেখা ছিল। আতিকুল আলম জার্মান দূতাবাসের লোকজন ছাড়া আরও অনেককে চিঠিটি দেখান। তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন যে, চিঠিটি তাজউদ্দিনের নিজ হাতে লেখা। এই চিঠি থেকে খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে

ভারতের যে হাত রয়েছে তা একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিদেশি কূটনীতিকদের আতিকুল আলম বোঝান যে, এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল ভারতপন্থী তাজউদ্দিন আহমেদকে জেল থেকে বের করে এনে ক্ষমতায় বসানো। আলমের দেখানো এই চিঠির ফলে কূটনীতিক মহলে রটে যায় যে, খালেদের অভ্যুত্থানের পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাত রয়েছে। আতিকুল আলম ঘটনার তিন মাস পরে এবং পরবর্তীসময় তিন বছর পর লন্ডনে দেয়া দুটো সাক্ষাৎকারে বলেন যে, চিঠিটি তিনি তাঁর মূল সূত্রের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটার যে আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল, এটা প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কাছে ওটার কোনো নকল নেই। তবে তিনি দাবি করেন যে, ওটা আসলেই ছিল খাঁটি। আলমের সহযোগী সাংবাদিক বন্ধুদের মতে এ ধরনের কোনো চিঠির অস্তিত্বই ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা বাজে প্রচারণা মাত্র। পাঁচই নভেম্বরের রাতে আলোচ্য চিঠির কথিত লেখক বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে বেয়নেটে খুঁচিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়। জেলখানার ভিতরের ঘনিষ্ঠ সূত্র অনুযায়ী মোশতাকের সমর্থক হিসাবে কথিত সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

সাতই নভেম্বরের ঘটনার পরদিন সাপ্তাহিক হলিডের তৎকালীন সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয়তে সম্প্রসারণবাদ (ভারত) ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ (সোভিয়েত ইউনিয়ন)-এর শক্তিদের খালেদের অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার অভিযোগ করেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে বাইরের হস্তক্ষেপ ছিল তা' খুবই স্পষ্ট। এঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের হারানো প্রতিমূর্তি উদ্ধারের আশায় সেনাবাহিনীর কিছু দেশদ্রোহী (?) অফিসারদের উচ্চাভিলাষকে কাজে লাগায়। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এঁরা পরিবর্তনের গতিকে আটকে দিয়ে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

মুজিবের মৃত্যুর পর খন্দকার মোশতাক সাপ্তাহিক হলিডের প্রাক্তন সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খানকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস্-এর সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন। খন্দকার মোশতাকের পতনের পরও জনাব খান তাঁর পদে বহাল থাকেন ও পরে জিয়াউর রহমানের সক্রিয় সমর্থক-এ পরিণত হন। সাতাত্তরে তিনি জিয়ার সামরিক সরকারের মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত হন। জিয়ার প্রথম রাজনৈতিক ফ্রন্ট জাগো দল-এর তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। জিয়া তাঁর এক সময়ের অন্যতম প্রধান প্রচারককে ত্যাগ করেন।

খালেদের সংঘটিত অভ্যুত্থানের পেছনে সত্যিকার উদ্দেশ্য যাই-ই থাকুক; পূর্বতন কোনো বহির্যোগাযোগ তাঁর থাকুক আর না-ই থাকুক; বাংলাদেশের শহুরে জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এর ফলে বিস্ফোরিত প্রতিক্রিয়া ঘটে। খালেদ

মোশাররফের অভ্যুত্থানের পেছনে ছিল গোপন ভারতীয় সহযোগিতা আর এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ভারতের অনুগত একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করা—এই বিশ্বাসে সারা দেশের মানুষ প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। এই তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াকেই জাসদ নেতৃবৃন্দ তাঁদের গণসংগঠনগুলোর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পূর্ণ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করেন। খালেদের অভ্যুত্থানের ভেতরের সত্যি ঘটনাগুলো আজো পর্যন্ত প্রকাশিত হবার অপেক্ষায়।

পরিশিষ্ট-২

'৭৫-এ খালেদ হত্যা থেকে '৮১-তে জিয়া হত্যার ঘটনা

-মেজর (অব.) রফিক

.... এদিকে ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহী বিদ্রোহ ১৯৭৫ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সৈনিকদের যত্রতত্র আকাশের দিকে গুলিবর্ষণ ও মুহুর্মুহু : স্লোগানে ঢাকা সেনানিবাস এলাকা কম্পমান হতে থাকে। সুবেদার সারোয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈনিক রাত একটার সময় গৃহবন্দি জিয়াকে মুক্ত করে ঘাড়ের ওপরে বসিয়ে বিজয়োল্লাস করতে করতে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দপ্তরে নিয়ে আসে। এখান থেকে জিয়া প্রথম জেনারেল খলিলকে ফোনে জানান যে তিনি মুক্ত। জিয়া উপস্থিত সৈনিকদের সাথে গভীর আনন্দে আলিংগনাবদ্ধ হন এবং মীর শওকত, আবদুর রহমান ও আমিনুল হককে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে বলেন যে, তিনি রক্তপাত চান না। সবাইকে শান্ত হতে বলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবার সাহায্য কামনা করেন।

তারপর জিয়া বঙ্গভবনে অবস্থানরত শাফায়েত জামিলকে ফোন করেন এবং বলেন, লেট আস ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ অ্যান্ড ইউনাইট দি আর্মি। শাফায়েত জামিলের তখনও ধারণা ছিল তাঁর ব্রিগেডের বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্যরা তাঁর প্রতি অনুগত আছে এবং তাঁর আদেশ মান্য করবে এবং তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেবে না। শাফায়েত জামিল জিয়াকে কর্কশভাবে জবাব দেন, 'নাথিং ডুয়িং উই উইল সর্ট দিস আউট ইন দি মর্নিং'। কিন্তু শাফায়েত জামিল অচিরেই বুঝলেন তাঁর এই ধারণা কত ভুল। প্রায় ১৫০ জন বিদ্রোহী সৈন্য খালেদ, শাফায়েত জামিলের খোঁজে বঙ্গভবনে ঢুকে পড়ে। শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনের দেয়াল অতিক্রম করে অপর পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পায়ে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মুন্সীগঞ্জে চলে যান এবং মুন্সীগঞ্জের এস ডি পি ও'র কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং পরে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

৭ই নভেম্বর রাত ১-৩০ মিনিটে বিদ্রোহী সৈনিকেরা বেতারকেন্দ্র দখল করে সিপাহী বিপ্লবের কথা ঘোষণা করে। জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করার সংবাদে

মহানগরীর জনগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। জনতা বিপ্লব জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে থাকে।

৩রা নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা জানতে পেরে গৃহবন্দি হওয়ার আগে আসন্ন বিপদের কথা ভেবে জিয়া কর্ণেল (অব.) তাহেরকে ফোন করে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। জিয়া ও তাহের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাহের অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও জিয়া তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সেই অনুরোধ অনুযায়ী তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে সিপাহী বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে খালেদ মোশার্‌রফের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে নির্দেশ দেন। ৭ই নভেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটায় তাহের দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দপ্তরে আসেন এবং জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। জিয়া আবেগাপ্লুতভাবে তাহেরকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'থ্যাংক ইউ তাহের ইউ হ্যাভ সেভড দি নেশন'। তাহের জিয়াকে বেতার কেন্দ্রে গিয়ে ভাষণ দেয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে উপস্থিত অফিসারগণ জিয়াকে যেতে নিষেধ করেন। তখন জিয়ার একটি ছোট ভাষণ রেকর্ড করা হয় এবং পরে তা ঢাকা বেতার থেকে প্রচার করা হয়। জিয়া তাঁর সেই ভাষণে বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর অনুরোধে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি সবাইকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে বলেন। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ জনমনে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। জনগণ রাজপথে নেমে আসে এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করতে থাকে।

তারপরে জিয়াকে শহীদ মিনারে গিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। সম্ভবত তাহেরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রণীত সিপাহীদের বারো দফা দাবির প্রতি জনসমক্ষে জিয়ার আনুগত্য ঘোষণা করিয়ে নেয়া। বারো দফা দাবি শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তন করার জন্য দেয়া হয়নি, বস্তুত এই দাবিনামায় সেনাবাহিনীর কাঠামো পরিবর্তন করে সেনাবাহিনীকে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। জিয়া বিনম্রভাবে তাহেরের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

পরে জিয়া বিকেলে যখন বেতার কেন্দ্রে যান তখন ঘরভর্তি উত্তেজিত সিপাহীদের সামনে তাহের জিয়াকে বারো দফা দাবিনামা দেন এবং সই করতে বলেন। জিয়া উপায়ন্তর না দেখে সই করেন। কিন্তু বেতার ভাষণে সুকৌশলে বার দফা দাবির কথা উল্লেখ না করে সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে গিয়ে অস্ত্র জমা দিতে বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক : রাষ্ট্রপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

সকাল ১১ টার সময় দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দপ্তরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল জিয়া, ওসমানী, খলিল, তাওয়াব, এম. এইচ. খান, মাহাবুবুল আলম চাষী ও তাহের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থির হয় বিচারপতি সায়েমই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে যাবেন। জিয়া এর আগে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জেনারেল খলিল প্রস্তাব করলেন, রাষ্ট্রপ্রতি সায়েমই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন এবং তিনি বাহিনী প্রধান, উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জিয়া এজন্য খলিলকে কখনো ক্ষমা করতে পারেননি। এই সভায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কর্ণেল তাহের প্রবলভাবে বারো দফা দাবির কথা উল্লেখ করলেও উপস্থিত সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কর্ণেল তাহের পরিচালিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনী জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসেও সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। ৮ই নভেম্বর রাত থেকে বিদ্রোহী সৈনিকেরা অফিসার হত্যা শুরু করে। এই বিদ্রাহে অন্তত বারো জন অফিসার নিহত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অফিসারদের হত্যা করা হয়। ক্যাপ্টেন সিতারা, মেজর করিম, ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও লে. মুস্তাফিজকে হত্যা করা হয়। মেজর আজিম ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য বিমানে উঠতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন খালেক ও লে. সিকান্দার উত্তেজিত সিপাহীদের হাতে নিহত হন। এই অন্তর্ঘাতমূলক হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীতে ব্যাপক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। অফিসাররা তাঁদের পরিবারবর্গসহ সেনানিবাস ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকেন। সেনাবাহিনীর কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। জিয়া সিনিয়র অফিসারসহ সেনা সদরে কঠোর প্রহরায় অবস্থান করতে থাকেন এবং অফিসারদের ইউনিট ব্যারাকে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। পরদিন ৯ই নভেম্বর জিয়া গ্যারিসন সিনেমা হলে সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বলেন যে, কোনো অফিসারকে হত্যা করার আগে তাঁকে প্রথম হত্যা করতে হবে কারণ তিনিও একজন অফিসার। আর যদি সৈন্যরা তাঁর আদেশ মানেন তাহলে কোনো অফিসারকে হত্যা করা চলবে না। অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দিতে হবে। উপস্থিত সৈন্যরা জিয়ার এই ভাষণে অস্ত্র সমর্পণে রাজি হয়। জিয়া অফিসারদের উদ্দেশেও অনুরূপ বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, ডোন্ট রান এওয়ে লাইক কাউয়ার্ড ইফ ইউ রান দে উইল চেজ ইউ। বিহেভ লাইক অফিসার অ্যান্ড সেভ দি নেশন।

অপরদিকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আ.স.ম. আব্দুর রব, মেজর জলিল ও মোহাম্মদ শাজাহান সৈনিকদের অস্ত্র জমা না দিতে আহ্বান জানিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দেন। কর্ণেল তাহের সৈনিকদের বারো দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং কর্ণেল তাহেরের বাহিনী জিয়ার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, কর্ণেল তাহের সমাজের যে-পরিবর্তন সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের জনগণ তথা বিদ্রোহী সৈনিককেরা সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তা থাকায় তাঁর দেশপ্রেমমূলক উদাত্ত আহ্বানের ফলে সেনানিবাস প্রায় শান্ত হয়ে পড়ে। ব্যাটম্যান প্রথা বিলোপ ও কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধিতে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। জিয়া যখন ২৩শে নভেম্বর রাতে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন 'আমি রাজনীতিক নই– আমি সৈনিক– আমরা কোনো বিশৃংখলা– কোনো রক্তপাত চাই না।' তখন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী রব, জলিল, হাসানুল হক ইনু এবং কর্ণেল তাহেরের বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খানকে গ্রেফতার করে। পরদিন সকালে তাহেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হল থেকে গ্রেফতার করা হয়।

দু'দিন পরে কর্ণেল তাহেরকে মুক্ত করার জন্য একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে অপহরণ করার চেষ্টা হয়। হাই কমিশনারের প্রহরারত পুলিশের গুলিবর্ষণে তাহেরের ছোট ভাইসহ চারজন নিহত হয়। আর সমর সেন তাঁর হাতে গুলিবিদ্ধ হন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের দশ হাজার সদস্য কারারুদ্ধ হন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে বিশেষ ট্রাইবুনালে ২১শে জুন ১৯৭৬ কর্ণেল তাহেরের বিচার শুরু হয়। কর্ণেল তাহেরের সঙ্গে মোট ৩৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশ জন বিদ্রোহী সৈনিক অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্ণেল তাহের যে-অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধের জন্য প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হতে পারতো। কিন্তু কারাগারের মধ্যে গোপন বিচারের ব্যবস্থা করে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়। তাহেরের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, তাহের বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সিপাহীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই বৈধ সরকার বলতে খালেদ মোশার্‌রফের চার দিনের সরকারকে বোঝায় এবং এই বিদ্রোহ সংঘটিত করে তাহের জিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। তাহেরের দুর্ভাগ্য যে, যে-বিদ্রোহ জিয়াকে শুধু মুক্তই করেননি ক্ষমতাসীন করেছেন, সেই বিদ্রোহের জন্য তাহেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। তাহেরকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আইনসম্মতভাবে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি। যেদিন বিচার শুরু হয় কেবল

সেদিনই তাঁকে অভিযোগনামা দেয়া হয় এবং তাঁর আগে তাঁকে আইনজীবীদের পরামর্শ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে ১৭ই জুলাই এই বিশেষ ট্রাইবুনাল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাহের শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। তাহেরের পক্ষে তাহেরের স্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফের আবেদন জানালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা' প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ২১শে জুন ভোররাতে তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হয়। মেজর জলিলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সিরাজুল আলম খান ও আ.স.ম. আব্দুর রবকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

খালেদ মোশার্‌রফ নিহত হওয়ার পরে মীর শওকত আলী কিছুদিনের জন্য চীফ অব জেনারেল স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন। এরপরে দিল্লিতে বাংলাদেশ মিশনে মিলিটারি এটাচি হিসেবে কর্মরত ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর উপস্টাফ প্রধান জেনারেল এরশাদ ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ও নবম ডিভিশনের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৬ সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি সায়েমের সঙ্গে মিলিত হন। বিমানবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও উপরাষ্ট্রপতি এসময় উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি সায়েমের কাছে প্রস্তাব করেন। সায়েম তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আলোচনা শুরু হয়। রাত একটা পর্যন্ত আলোচনা চলার পরে একরকম বাধ্য হয়েই সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ জিয়াকে হস্তান্তর করেন।

৭৭-এ রাষ্ট্রপতি সায়েমের বিদায় : জেনারেল জিয়া নয়া রাষ্ট্র প্রধান

১৯৭৭ সালের ২৯শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করলে জিয়া ৪৩ বছর বয়সে বাংলাদেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে জিয়ার অনুরোধে সায়েম দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির অজুহাতে তা স্থগিত ঘোষণা করেন। জিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল বলেই এ নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এই সময় রাজনৈতিক দলবিধি অধ্যাদেশও জারি করা হয়।

জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরই শাসনতন্ত্রের রদবদল করার জন্য অধ্যাদেশ জারি করেন। শাসনতন্ত্রকে ইসলামীকরণ করার জন্য প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানুর রহিম' সংযোজন করেন এবং রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করা হয় এবং সমাজতন্ত্রের স্থলে লেখা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার। এই ঘোষণায় বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পরিবর্তন করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সূচনা করা হয়।

১৯৭৮ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জিয়া মাত্র চল্লিশ দিন আগে নির্বাচনের ঘোষণা প্রচারণার জন্য তেইশ দিন সময় দেন। জিয়া তখন একাধারে সেনাবাহিনী প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৮ সালের ১৮ই এপ্রিল ঘোষিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনী প্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে জিয়া অযোগ্য হওয়ার ভয়ে ২৯শে এপ্রিল সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করেন। সেনাবাহিনীর আর্মি রুলস (ইনস্ট্রাকশন) ও পরিবর্তন করে জিয়ার প্রার্থী হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

জিয়া প্রথমে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন এবং পরে জাগদল বাতিল করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি) গঠন করেন। বিরোধী দল মনোনীত প্রার্থী জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

জিয়া একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দালালী আইনে গ্রেফতার ও পরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করেন। অনেকের ধারণা যেহেতু আওয়ামী লীগ জিয়াকে সমর্থন করেনি সেহেতু, জিয়া স্বাধীনতা বিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত মেলান। জিয়ার মন্ত্রিসভায় তিন জন মন্ত্রী ছিলেন, যাঁরা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন। অন্যান্য দলছুট স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকও জিয়ার দলে যোগদান করেন। জিয়া ব্যক্তিগতভাবে সততার পরিচয় দিলেও তাঁর রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থের জন্য তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ও দুর্নীতিবাজ আমলাদের সহ্য করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের নায়ক ফারুক, রশীদ ও অন্যরা ভেবেছিল, তাঁদের বিদেশে অবস্থান হবে স্বল্পকালের জন্য। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষের দিকে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাদের দেশে ফেরানো জেনারেল জিয়ার কাম্য নয়। দেশে ফেরার জন্য তাদের সকল আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়। এমনকি তাদের পরিবারবর্গকে বেতন ও ভাতাদি দেয়া থেকে পর্যন্ত সরকার বিরত থাকে। রশীদ ও ফারুককে এ সময় সেনাবাহিনী থেকে অবসর প্রদান করা হয়।

এ সমস্ত কারণে ফারুক ও রশীদ জিয়ার প্রতি বিরূপ হন। রশীদ শেষ পর্যন্ত জেনারেল জিয়াকে দুই পাতাবিশিষ্ট একটি চিঠি লেখেন এবং ঢাকা আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রশীদ এই পত্রে আরও উল্লেখ করেন যে, জেনারেল জিয়াকে অবশ্যই তাঁদের ফেরৎ যাবার খরচ বাবদ ১৫০০০ ডলার পাঠাতে হবে। যদি ফেরৎ যেতে না দেয়া হয় তাহলে তার যথার্থ কারণ ৩ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের জানাতে হবে। তা না হলে তাঁরা নিজ খরচে ঢাকা ফিরে আসতে বাধ্য হবেন।

জেনারেল জিয়া ২৩শে ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নুরুল ইসলাম শিশুকে বেনগাজী পাঠান। শিশু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং দূতাবাসে চাকুরি প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। ফারুক ও রশীদ চাকুরি গ্রহণে অস্বীকার করলে শিশু তাঁদের দেশে ফিরে আসার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার নিশ্চয়তা দেন এবং বলেন যে, এটা করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। রশীদ দলের পক্ষ থেকে জিয়াকে হাতে লেখা আর একটি পত্র দেন। এই পত্রে রশীদ জিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দেশসেবার প্রস্তাব পেশ করেন এবং জিয়ার উত্তরের জন্য ২ সপ্তাহ অপেক্ষা করবেন বলে জানান।

রশীদ ও ফারুক বেনগাজীতে বসে জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফারুক ২৪শে মার্চ ফ্রাংকফুর্টে, এ-সময় রশীদ বাংলাদেশ সরকারের কাছে থেকে বার্তা পান যে শুধুমাত্র তাঁকে বাংলাদেশে অল্প সময়ের জন্য আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই বার্তায় ফারুক ও অন্যান্যদের ফিরে না আসার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। রশীদ অবিলম্বে ফ্রাংকফুর্টে ফারুকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ফারুক তখন লন্ডনে চার্চিল হোটেলে এবং এম.জি. তোয়াব সে-সময় পোর্টম্যান হোটেলে অবস্থান করছিলেন। ফারুক তিনবার তোয়াবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং জানতে পারেন যে, ১৪টি ট্যাংক ঢাকার অদূরে সাভার সেনানিবাসে মোতায়েন আছে।

জেনারেল জিয়া বেঙ্গল ল্যাঞ্চারকে বিভক্ত করে ১৪টি ট্যাংক এবং ৫০০ সৈনিক সমন্বয়ে অপর একটি রেজিমেন্ট গঠন করেন। বেঙ্গল ল্যাঞ্চারকে বগুড়া সেনানিবাসে এবং প্রথম বেঙ্গল ক্যাভালরীকে সাভার সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়। তোয়াব ফারুককে জানান যে, প্রশিক্ষণের জন্য ট্যাংক বহরকে রাত ৯টা র্পন্ত বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফারুক বেনগাজী থেকে ফিরে এলেন এবং রশীদের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা তৈরি করলেন। স্থির করা হলো ফারুক মোসলেহউদ্দিন এবং হাসেমকে নিয়ে সিঙ্গাপুর যাবেন। তাঁরা সিঙ্গাপুরে ঢাকা থেকে রশীদের বার্তার অপেক্ষা করবেন। রশীদ ঢাকা অবস্থানকালে অভ্যুত্থানের জন্য দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি বেঙ্গল ল্যান্সার ও প্রথম বেঙ্গল ক্যাভালরির সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ করবেন এবং একই সঙ্গে ফারুক ও অন্যান্যদের দেশে ফেরার বিষয়ে জিয়ার প্রতি চাপ সৃষ্টি করবেন।

পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ : প্রথম দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ও ট্যাংক বাহিনী ফারুকের সিঙ্গাপুর থেকে আসা বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণমাত্র ঢাকা বিমানবন্দর দখল করে নেবে। ফারুক তখন এই সব সৈন্যকে নিয়ে জেনারেল জিয়া এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। দ্বিতীয় বিকল্প পরিকল্পনা ছিল ফারুক ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করা মাত্র কেউ জানার আগেই তাঁকে সাভারে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ফারুক ট্যাংক বাহিনীসহ ঢাকায় প্রবেশ করবে। উল্লেখ্য যে, এসব নাটকীয় পরিকল্পনার কোনোটাই কার্যকরী হয়নি।

রশীদ ব্রিগেডিয়ার শিশুকে ফোন করেন এবং মেজর ডালিমকে সঙ্গে নিয়ে আসার অনুমতি চান। রশীদ ব্যাংকক থেকে ২০শে এপ্রিল ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে রশীদের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সে-দিনই রাতে ব্রিগেডিয়ার শিশু রশীদকে নিয়ে জেনারেল জিয়ার কাছে যান। এ বৈঠক ছিল দীর্ঘ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। রাতের খাবারের পর জিয়া রশীদকে জিজ্ঞেস করলেন, “ফারুক কোথায়”। উত্তরে ফারুক বেনগাজীতে আছে জানালে জিয়া বলেন যে, একটি বিশস্ত সূত্র তাকে জানিয়েছে যে, ফারুক সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছে।

পরিকল্পনা মোতাবেক ফারুক দেশে ফিরে আসেন এবং সাভার সেনানিবাসে প্রায় দুই হাজার সৈন্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং ‘ফারুক জিন্দাবাদ” স্লোগান দিতে থাকে।

২৫শে এপ্রিল একই বিমানে তোয়াব এবং ডালিম ঢাকা আসেন। এই ঘটনায় তোয়াবের প্রতি জিয়ার সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে তোয়াবকে বিমানবাহিনীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

২৭শে এপ্রিল বগুড়া সেনানিবাস থেকে বেঙ্গল লান্সারের সৈনিকেরা এই মর্মে বার্তা পাঠায় যে, অবিলম্বে ফারুককে বগুড়া পাঠাতে হবে। তা না হলে তারা ট্যাংকসহ ঢাকা চলে আসবে। এই খবরে জিয়া আতংকিত হয়ে ওঠেন এবং এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আরিচা ঘাটে মোতায়েন করেন। একই সঙ্গে জিয়া ফারুককে বগুড়া যেতে অনুমতি দেন এবং ফারুক কালো আর্মড ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় বগুড়া সেনানিবাসে প্রবেশ করেন।

২৭শে এপ্রিল বিকেলে রশীদকে গৃহবন্দি করা হয়। পরদিন সকালে ৪ জন অফিসার তাঁকে জেনারেল জিয়ার অফিসে নিয়ে যান। পাশের একটি ঘরে ৬ ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর জিয়া সাক্ষাৎ প্রদান করেন। জিয়া রশীদকে বলেন যে রশীদ, ফারুক, ডালিম এবং অন্যান্যদেরকে অবশ্যই কিছুদিনের জন্য বাইরে থাকতে হবে। জিয়া তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনে চাকুরি প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। রশীদকে সামরিক প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রশীদ ও ডালিমকে থাই এয়ার ওয়েজের একটি বিমানে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়।

বগুড়া সেনানিবাসে ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্ণেল হান্নান শাহ বেঙ্গল ল্যান্সার সৈনিকদেরকে ঘিরে ফেলে। ঢাকায় জেনারেল জিয়ার সুদৃঢ় অবস্থানের কথা ভেবে এবং রশীদ ও ডালিমের দেশত্যাগের কথা জানতে পেরে ফারুক নিরাশ হয়ে পড়ে। জেনারেল জিয়া ফারুকের পিতা এবং বোনকে একটি হেলিকপ্টারে বগুড়া পাঠান এবং ফারুককে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তাব দেন। ফারুক কোনো উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করেন এবং পরে তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রায় দু'মাস পরে ১৫ই জুলাই ১৯৭৬ এ বেঙ্গল লান্সারকে বিলুপ্ত করা হয়।

ফারুক ও রশীদ বিদেশি দূতাবাসে চাকুরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বাকী ১১ জনকে বিদেশি দূতাবাস সমূহে পদস্থ করা হয়।

জেনারেল জিয়া কায়রোতে ১৯৭৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে দেখা করেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য প্রার্থী হিসাবে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে মিশর ও আরব লীগের সমর্থন আদায়ের জন্য জিয়া কায়রোতে যান। প্রেসিডেন্ট সাদাত জিয়াকে অবাক করে দিয়ে জানান যে, মিশরীয় গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছে যে জেনারেল জিয়া ও সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যা করার জন্য একটি সিপাহী বিদ্রোহ চালানো হচ্ছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দিবস উপলক্ষে বিমান বাহিনী অফিসার্স মেসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী সৈনিকেরা আক্রমণ চালাতে পারে। জিয়ার এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার কথা ছিল। সূত্রটি আরো জানায় যে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কমুনিস্ট পার্টির উস্কানিতে একটি মার্কসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিদ্রোহ ঘটতে পারে। জিয়াকে আরো জানানো হয় যে, লিবিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

জিয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর ঢাকা ফিরে আসেন এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি মাহমুদকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠির মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান।

জাপানি এয়ার লাইন্সের একটি ডি, সি-৮ বিমান ১৫৩ জন যাত্রীসহ বোম্বে থেকে ব্যাংক যাচ্ছিল। জাপানি রেড আর্মির হিদাফা কমান্ড ইউনিটের ৫ জন হাইজ্যাকার বিমানটিকে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য করে। হাইজ্যাকাররা জাপান সরকারের কাছে ৬০,০০,০০০,০০ আমেরিকান ডলার দাবিসহ তাদের ৯ জন কমরেডকে মুক্তির দাবি জানায়, অন্যথায় মধ্যরাত্রির পর তারা বিমানের যাত্রীদেরকে হত্যার হুমকি দেয়।

জেনারেল জিয়া এ, জি, মাহমুদকে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে সমঝোতার দায়িত্ব দেন। মাহমুদ উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ও দুইজন উর্ধ্বতন বেসামরিক অফিসারসহ

পরবর্তী ৪ ঘন্টাও তেজগাঁও এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে হাইজ্যাকারদের সাথে সমঝোতা করতে থাকেন। স্বাভাবিক কারণেই অফিসার মেসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। অনুষ্ঠানটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে ২৮শে সেপ্টেম্বর যাঁরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা বিপাকে পড়েন। ফলে বগুড়া সেনানিবাসে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা দুইজন তরুণ লেফটেন্যান্টকে হত্যা করে এবং ৯৩ ব্রিগেড কমান্ডার ও বেশ কিছু অফিসারকে বন্দি করে। তারা নবগঠিত আর্মড ইউনিট ৪র্থ হর্সের সৈন্যদেরকেও বিদ্রোহে যোগ দিতে উস্কানি দেয়। বিদ্রোহীরা বগুড়া শহরে কিছু দোকান পাট ও ব্যাংক লুট করে এবং জেল ভেঙে ১৯৭৬ সালের বিদ্রোহে সাজাপ্রাপ্ত ১৭ জন প্রাক্তন সৈনিককে মুক্ত করে।

জিয়া দ্রুত উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক ডাকেন। এবং আসন্ন বিদ্রোহকে প্রতিহত এবং অস্ত্রাগার সুরক্ষিত করার জন্য নির্দেশ দেন। অফিসারদের সর্বাধিক সতর্ক অবস্থায় ইউনিট ব্যারাকে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে ২৪ ঘন্টা থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

আর্মি সিগন্যাল ব্যাটেলিয়ন সর্বপ্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। আগে স্থিরীকৃত প্রহরারত সেন্ট্রি কর্তৃক রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজে সিপাহীরা চিৎকার করতে করতে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে ও অস্ত্রাগার লুট করে। তারা সিপাহী বিপ্লবের স্লোগান দিয়ে একটি ট্রাক বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কুর্মিটোলা এয়ার বেসের কয়েক শত সৈনিক এ বিদ্রোহে যোগদান করে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য সেন্ট্রাল অর্ডিন্যান্স ডিপোতে যায়। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সেনানিবাসে প্রচুর লিফলেট ছড়ানো হয়। এই সমস্ত লিফলেট সৈনিকদের ৭ই নভেম্বরের অনুরূপ একটি সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত ক'রে দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব করার আহ্বান জানানো হয়। এই সব লিফলেটে জিয়াকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করে তাঁর সরকারকে উৎখাত করতে আহ্বান জানানো হয়।

ভোর ৫টায় বিদ্রোহী সৈনিকেরা বেতার কেন্দ্রে যান এবং সিপাহী বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেন। সার্জেন্ট আফসার নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করে দেশ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয়েছে বলে জানান। অপর দিকে তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিমানবাহিনীর বিদ্রোহী সৈনিকেরা এয়ারপোর্ট হ্যাংগারের সন্নিকটে দুইজন তরুণ পাইলট অফিসারকে হত্যা করে। একইভাবে টার্মিনাল বিল্ডিং এবং কন্ট্রোল টাওয়ার দখল করে ৯ জন বিমানবাহিনীর অফিসারকে হত্যা করা হয়। বিমানবাহিনী প্রধান, এ, জি, মাহমুদের সম্মুখেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদকে হত্যা করা হয়। এ, জি, মাহমুদ অলৌকিকভাবে প্রাণে বাঁচেন। তিনি নিচ তলায় লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় লুকিয়ে ছিলেন। অন্য যারা নিহত হন তাঁরা হলেন : গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার আহমেদ চৌধুরী, উইং

কমান্ডার আনোয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লিডার আবদুল মতিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শতকত জান চৌধুরী এবং সালাউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুবুল আলম ও আকতারুজ্জামান এবং তিন জন পাইলট অফিসার এম, এইচ, আনসার, নজরুল ইসলাম এবং শরিফুল ইসলাম। এছাড়া স্কোয়াড্রন লিডার সিরাজুল হকের ১৬ বছর বয়স্ক ছেলে এনামকেও হত্যা করা হয়।

জিয়া-বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা : কঠোর হস্তে দমন

জিয়ার অনুগত অফিসার ও সৈনিকরা কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড ও ৯ম পদাতিক ডিভিশনের সৈন্যরা জিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। মেজর মোস্তাফার নেতৃত্বে ২৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা টার্মিনাল বিল্ডিং সকাল ৭টার মধ্যে পুনর্দখল করে এবং ২০ জন বিদ্রোহীকে হত্যা ও ৬০ জনকে বন্দি করে। ২৯ ইস্ট বেঙ্গলের অন্য একটি কোম্পানি বেতার কেন্দ্র পুনর্দখল করে।

জিয়া ডি জি এফ আই প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল ইসলামকে চাকুরি হতে অপসারণ করেন এবং ২২ ইস্ট বেঙ্গল, আর্মি ফিল্ড সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, সিগন্যাল সেন্টার অ্যান্ড স্কুল এবং আর্মি সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে জিয়া মঞ্জুরের পরামর্শে বিমানবাহিনীকে বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আর্মি এভিয়েশন উইং হিসেবে বিমান বাহিনীর সমন্বয় সাধনের চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তা করা হয়নি। জিয়া এ, জি, মাহমুদকেও সন্দেহ করেন। জিয়া ধারণা করেন যে, জাপান এয়ার লাইনের বিমানটি হাইজ্যাক করে সবার দৃষ্টি ঐদিকে সরিয়ে দিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্রোহ ঘটাবার ষড়যন্ত্রে এ, জি, মাহমুদ লিপ্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিচার বিভাগীয় তদন্তে জানা যায় যে মাহমুদ এই বিদ্রোহের সঙ্গে কোনোক্রমেই জড়িত ছিলেন না।...

১৯৭৭ সালের মে মাসের ১ম সপ্তাহে আংকারায় বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রথম সেক্রেটারী হিসাবে কর্মরত লে. কর্ণেল (অব.) আব্দুল আজিজ পাশা ছুটিতে দেশে ফেরার পথে ইসলামাবাদে যাত্রা-বিরতি করেন। সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত মেজর বজলুল হুদা এবং পিকিং থেকে আগত লে. কর্ণেল শরিফুল হক ডালিমের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। তাঁদের বৈঠকে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ সরকারকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করার বিষয়টি আলোচিত হয়। পাশা, ডালিম ও হুদা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ও সেনাবাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা করেন। ডালিম এর আগে তেহরানে মেজর নুরের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক হলিডে-তে প্রকাশিত পাশার স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, ক্ষমতা দখল করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বামপন্থী সরকার গঠন করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল।

ডালিম ও পাশা সমমনা সামরিক অফিসারদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেনাবাহিনীর সৈনিকদের নিয়ে একটি গোপন সংগঠন গড়ার জন্য লে. কর্ণেল দিদারুল আলম ও লে. কর্ণেল নুরুন্নবী খানের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। মোশাররফ হোসেন ও কাজী মনির হোসেনকে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মনির জগন্নাথ কলেজের বামপন্থী ছাত্রনেতা ছিলেন এবং মোশাররফ ছিলেন কৃষি ব্যাংকের অফিসার যার সঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের যোগাযোগ ছিল। মাওপন্থী সর্বহারা দলের নেতা লে. কর্ণেল জিয়াউদ্দিনের সমর্থনের জন্য ডালিম বেশ কয়েকবার জিয়া উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু জিয়াউদ্দিন এধরনের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ডালিম ও পাশা লিফলেট ছাপানোর জন্য একটি প্রিন্টিং প্রেস ক্রয়ের অর্থ দিদারুল আলমকে দেয়ার নিশ্চায়তা দেন। অনুরূপভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি আন্তঃনগর বাস সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২৬ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর আংকারায় অপর একটি বৈঠকে পাশা, বজলুল হুদা, রশিদ ও নুর মিলিত হন। ডালিম ও শাহরিয়ারেরও যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছুটি না পাওয়ার কারণে শাহরিয়ার উপস্থিত থাকতে পারেননি। ফারুক তখন বাংলাদেশে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে দিন কাটাচ্ছিলেন। আংকারায় এই বৈঠকের কথা বাংলাদেশের অ্যামবেসডর মেজর জেনারেল মামুন ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। এতে পাশা ক্ষিপ্ত হয়ে মামুনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

এই ঘটনার ৫ মাস পরে ডালিম, শাহরিয়ার ও হুদা আংকারায় যান এবং ২৭শে মে তারিখে পাশার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। নুর ছুটি না পাওয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি। রশিদের পরিবর্তে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত এবং লিবিয়ায় নির্বাসিত জীবন-যাপনকারী ফারুকুর রহমান আসেন।

দিদারুল আলম জুন মাসেই অভ্যুত্থান ঘটাতে চান কারণ বেশি দেরি করলে গোপনীয়তা রক্ষা করা যাবে না। দিদারুল আলম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সৈনিকেরা ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের মতো একটি বিপ্লব ঘটাতে অধিকতর আগ্রহী হয়ে পড়ে। দিদারুল আলম ঢাকা, কুমিল্লা ও সাভার সেনানিবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এভাবেই ১৯৮০ সালের ১৭ই জুন তারিখে আর একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। জিয়া এই সময়ে বিদেশ ভ্রমণে ছিলেন। অভ্যুত্থানকারীরা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদকে হত্যা ও অন্যান্য অফিসাকে বন্দি অথবা

হত্যা করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন। অতঃপর একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে দেশ শাসন করা হবে এবং ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিদ্রোহের দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেন এবং একটি লিফলেট সংগ্রহ করেন। ফলে ১৭ই জুন তারিখের অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার আগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারগণ অনেক সৈনিককে গ্রেফতার করেন এবং বাকী সৈন্যরা পালিয়ে যায়। দিদারুল আলম ভারতে পালিয়ে যায় এবং পরে বাংলাদেশে ফিরে আসলে ১৯৮০ সালের ১১ই নভেম্বর কুষ্টিয়া শহরে একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আব্দুল আজিজ পাশাকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেশে ফিরে আসতে বলেন। ১৮ই নভেম্বর পাশা দেশে ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ক্ষমতাসীন সরকারকে উৎখাত ও সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকদের বিপথগামী করার অভিযোগে ১০ই মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকা সেনানিবাসে এবং সামরিক আদালতে এদের বিচার করা হয়। আব্দুল আজিজ পাশা ও কাজী মনির হোসেন অপরাধ স্বীকার করেন এবং রাজসাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ২০শে মে তারিখে আদালত দিদারুল আলমকে ১০ বছরের কারাদণ্ড, মোশাররফ হোসেন ও লে. কর্ণেল নূরুন্নবীকে যথাক্রমে ২ বছর ও ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কাজী মুনির হোসেনকে ক্ষমা করা হয় এবং সেই সঙ্গে আব্দুল আজিজ পাশা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আংকারাস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসে নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান।...

১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের বেশ কিছু রদবদল করেন। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ও মেজর জেনারেল মনজুরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে মনজুর ঢাকা সেনানিবাসস্থ ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডকে সরাসরি সেনাসদর অধীনস্থ করেন। শওকত এতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং উভয়ের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

ফলে উভয়কেই ঢাকা থেকে বদলী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শওকতকে যশোরে ৫৫তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এবং মনজুরকে চট্টগ্রামে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি ও সি হিসেব বদলী করা হয়। চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে মনজুর সমস্ত সেনাবাহিনীর উপরে আধিপত্য করতে পারতেন। স্বভাবতই এই বদলীর আদেশ তাঁর পছন্দ ছিল না। রাষ্ট্রপতির দেয়া বিদায়ী ভোজসভায় মনজুরের সস্ত্রীক অনুপস্থিতি তাঁর অসন্তোষের কথা প্রমাণ করে। ঢাকায় অবস্থানের জন্য স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট হিসেবে পদস্থ করার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি মনজুরের অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হয়। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে মনজুর ২৪শে নভেম্বর ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৩১শে মে '৮১ চট্টগ্রামে জিয়া : সর্বত্র নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি

১৯৮১ সালের মে মাসে রহস্যজনকভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারগণ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াসহ্ ঊর্ধ্বতন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছেন। এই গুজবের উৎস কী ছিল—কারা স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে এই গুজব ছড়িয়েছিলেন তা রহস্যের অন্তরালে ঢাকা থাকলেও মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের উত্তেজিত করাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল তা একরকম নিশ্চিতভাবে বলা চলে। মে মাসের শেষের দিকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য সেনানিবাসেও এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে চট্টগ্রামে ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর হিসেবে কর্মরত মেজর কাইউম এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ব্রাঞ্চে কর্মরত মেজর তাহেরকে ফোনে আসন্ন বিপদের কথা বলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যেতে পরামর্শ দেন। এর কয়েকদিন পরেই ৩০শে মে রাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা করার জন্য এর আগেও তিনবার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৮০ সালের ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি ভাটিয়ারীতে অফিসার ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা ছিল। এই কুচকাওয়াজে জিয়ার অভিবাদন গ্রহণ করার কথা ছিল এবং সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদেরও উপস্থিত থাকার কথা। পরিকল্পনা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর ইবিআরসি অফিসারস মেসে এক নৈশভোজে রাষ্ট্রপতিসহ্ অন্যান্যদের আমন্ত্রণ করা হবে এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হবে। এটাই ছিল প্রথম পরিকল্পনা যা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এ্যাকসারসাইজ আয়রন শিল্ড চলাকালে কক্সবাজারে 'অ্যামফিবিয়াস ল্যান্ডিং'- এর মহড়া দেখানো হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল রাষ্ট্রপতি ও তিন বাহিনী প্রধান এই মহড়া পরিদর্শনে কক্সবাজার যাবেন এবং সেখানে তাঁদেরকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হবে এবং কয়েকটি দাবী মানতে বাধ্য করা হবে। বিপ্লবী পরিষদ গঠন, সংবিধান বাতিল করা, কমপক্ষে তিন বছরের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি এই দাবিসমূহের অন্যতম ছিল। পরিকল্পনা মোতাবেক লে. কর্ণেল মতি কক্সবাজারে যান এবং প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানকে রাষ্ট্রপতির সাথে সার্কিট হাউজে অবস্থান করতে বাধা সৃষ্টি করেন। শাহ আজিজ এতে এতই অপমানিত বোধ করেন যে, তিনি স্থানীয় একটি হোটেলে অবস্থান করেন। ২৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এই পরিকল্পনা পরে বাতিল করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনা ছিল এপ্রিলে চট্টগ্রাম ড্রাইডক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কন্ট্রোল রুমে প্যানেল বোর্ডে প্লাস্টিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে জিয়াকে হত্যা করা। প্যানেল বোর্ডে সুইচ টিপে রাষ্ট্রপতি ড্রাইডক উদ্বোধন করবেন এবং বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করবেন। এই পরিকল্পনাটিও প্লাস্টিক বোমার অবস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব অবগতি ও অপসারণের ফলে বাস্তবায়িত হয়নি। ইরাক-ইরান সংঘর্ষ নিরুপণের জন্য অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্সের শান্তি কমিটির বৈঠকে যোগাদানের উদ্দেশে জিয়ার জেদ্দার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করার কথা। শান্তি কমিটির বৈঠক ২৫শে মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বৈঠক শেষ মুহূর্তে বাতিলের ফলে জিয়ার বিদেশ গমন স্থগিত হয়। জিয়া ২৯শে মে রাজশাহী যাওয়া মনস্থির করেন এং সেই মোতাবেক সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্য তার সামরিক সচিবকে নির্দেশ্ন দেন। কিন্তু চট্টগ্রামে বি এন পি-র দুই দলের কোন্দলের ফলে শেষ পর্যন্ত জিয়া রাজশাহী না গিয়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এপ্রিলে ড্রাইডক উদ্বোধনের জন্য জিয়া চট্টগ্রাম গেলে বিমান বন্দরে বি.এন.পি-র দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। একদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদ ও অন্য দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ডেপুটি স্পিকার সুলতান আহমদ চৌধুরী। দুই মারমুখী গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা. সৃষ্টির উদ্দেশে তিনি ২৯শে মে চট্টগ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য সামরিক সচিব-কে ২৫শে মে নির্দেশ দেন। আর ঐ দিনই রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল মনজুরকে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি থেকে ঢাকায় মীরপুরে অবস্থিত স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট হিসেবে বদলীর আদেশ দেন।

লে. কর্ণেল মতি এই সময় বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সেনাসদরে সাক্ষাৎকারের জন্য ঢাকা এসেছিলেন। যতদূর জানা যায়, লে. কর্ণেল মতি মাহফুজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়াও মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ও বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। বঙ্গভবনে সামরিক সচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের অজুহাতে লে. কর্ণেল মতি বঙ্গভবন চত্বরে হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং-এর স্থান পরীক্ষা করে দেখেন।

মনজুরের বদলীর আদেশে বিদ্রোহী অফিসারগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। মনজুরের মতো একজন মেধাবী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ডিভিশনের কমান্ড থেকে সরানো হচ্ছে এবং এটা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রপতির চরম অবিচার ও স্বার্থের প্রতি আঘাত হিসেবে অপপ্রচার চালানো হয়। মনজুর ব্যক্তিগতভাবে এই বদলীর আদেশে ক্ষুব্ধ হন। যদিও প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে তিনি জিওসি হিসেবে ২৪ তম পদাতিক ডিভিশন কমান্ড করছিলেন এবং একজন শৃংখলাবান অফিসার হিসেবে বিনা প্রশ্নে সরকারের আদেশ মান্য করে বদলীকৃত স্থানে যোগদান করাই তার একান্ত কর্তব্য ছিল।

মনজুর আরও বেশি ক্ষুব্ধ হন যখন জানতে পারলেন রাষ্ট্রপতিকে অর্ভ্যথনা জানানোর জন্য পতেঙ্গা বিমানবন্দরে তাকে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। মনজুর এই নির্দেশে অপমানিত বোধ করেন। প্রটোকল অনুযায়ী স্থানীয় জিওসি হিসেবে বিমান বন্দরে তাঁর উপস্থিত থাকাই ছিল স্বাভাবিক। বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন ও রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী নৌবাহিনী প্রধান যখন বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকছেন তখন মনজুরকে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করায় মনজুরের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মনজুরকে জানানো হয় যে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক কারণে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন এবং তিনি এই বিষয়ে জিওসিকে জড়াতে চান না।

যথাসময়ে তিনি চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছান। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, ড. আমিনা রহমান, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং জনাব রাজ্জাক চৌধুরী। ৯-৫০ মিনিটে পতেঙ্গা বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন ও বি.এন.পি-র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমদ সময়মতো বিমানবন্দেরে উপস্থিত হতে না পারলেও শীঘ্রই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সার্কিট হাউজে মিলিত হন।

মেজর জেনারেল মনজুর ২৯শে মে শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে তাঁর অফিসে আসেন এবং লে. কর্ণেল মেহবুবুর রহমান ও মেজর খালেদকে ডাকেন। মনজুর বলেন, এখনই আঘাত করার সময়। কী ভাবে করতে হবে জানি না। শুধুমাত্র অফিসাররাই সার্কিট হাউজে যাবে, সৈনিক মোতায়েনের প্রয়োজন নেই। মনজুর লে. কর্ণেল মতির অনুপস্থিতির জন্য রাগান্বিত হন। মতি অজ্ঞাত কারণে আকস্মিকভাবে রাঙ্গামাটি গিয়েছিলেন। মনজুরকে জানানো হয় মতি সময় মতোই যোগদান করবেন।

জানা যায়, লে. কর্ণেল দেলোয়ারের বাসায় বিদ্রোহীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত এই বৈঠকে অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

২৮ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর কাজী মোমিনুল হকের অফিসে রাত ১১ টার সময় লে. কর্ণেল মতি, লে. কর্ণেল মেহবুব, মেজর মোমিন, মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন মুনীর, ক্যাপ্টেন জামিল ও ক্যাপ্টেন মইনুল মিলিত হন। অপরদিকে রাত ১২টায় ৬ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক লে. কর্ণেল শাহ ফজলে হোসেনের অফিসে লে. মেহবুব, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, ক্যাপ্টেন আরেফিন, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস ও লে. মোসলেহ উপস্থিত হন। রাত ১-৩০ মিনিটে বিদ্রোহী অফিসারগণ পাবলিক স্কুলের দিকের রাস্তা দিয়ে কালুর ঘাট ব্রিজের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

রাত ২ টার সময় বিদ্রোহীরা কালুরঘাটে এসে পৌঁছায়। একটি সাদা টয়োটা গাড়িতে চড়ে লে. কর্ণেল মতি, মেজর মোজাফফর ও ক্যাপ্টেন মুনীর আসেন। কিছুক্ষণ পরে ৬ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন সাত্তার, লে. রফিকুল হাসান খান, লে. মোসলেহ, সুবেদার সাজদার রহমান ও ২১ ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন জামিল হক আসেন। ১৯ ইস্ট বেঙ্গলের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার মেজর গিয়াস, ২৮ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর মোমিন, ১১ ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর খালেদ, ১ম ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর ফজলুল হক, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের স্টাফ ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাডজুটেন্ট মতিউর রহমান পরে এসে মিলিত হন।

মেজর ফজলুল হক বান্দরবন থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুই প্লাটুন সৈন্যসহ সুবেদার জাফর ও নায়েব সোবেদার সোলায়মানকে সঙ্গে আনেন। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের কাছে থেকে কোনো উৎসাহমূলক সাড়া না পাওয়ায় লে. মতিউর রহমানের কর্তৃত্বাধীনে সাধারণ সৈন্যদের পেছনে ফেলে রেখে সার্কিট হাউসে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

লে. কর্ণেল মতি পবিত্র কোরান দিয়ে সকল অফিসারদের শপথ করান। অফিসারগণ একটি পিক আপের ভিতরে বসে ছিলেন– কোনো কোনো অফিসার স্থানের অভাবে পিক আপের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মতি তাদের বলেন, দেশকে বাঁচাতে হলে তার সাথে এখনই সার্কিট হাউসে যেতে হবে, জিয়াকে উঠিয়ে সেনানিবাসে আনতে হবে এবং চাপ প্রয়োগ করে দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ না করলেও জিয়াকে হত্যা করাই ছিল গোপন পরিকল্পনা। জিয়াকে হত্যা করা হবে বললে অনেকেই যেতে অস্বীকার করবেন এই ভেবে তা প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী জানা যায়, লে. কর্ণেল মতি উপস্থিত অফিসারদের নিম্নলিখিত তিনটি দলে বিভক্ত করেন এবং দায়িত্ব অর্পণ করেন :

১. প্রথম গ্রুপ

(ক) সদস্যদের নাম :

১. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মেহবুবুর রহমান
২. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফজলে হোসেন
৩. মেজর এস.এম.খালেদ
৪. ক্যাপ্টেন জামিল হক
৫. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার
৬. লেফটেন্যান্ট রফিকুল হাসান খান

(খ) দায়িত্ব :

১. সার্কিট হাউসের প্রধান ফটক অতিক্রম করা মাত্র লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন নিচের তলার প্রধান দ্বারে হ্যান্ড ল্যাঞ্চার হতে রকেট নিক্ষেপ করবেন।

২. লেফটেন্যান্ট রফিক ও ক্যাপ্টেন সাত্তার সার্কিট হাউসের দিকে গ্রেনেড ফায়ারিং রাইফেল হতে গ্রেনেড বর্ষণ করবেন এবং ক্যাপ্টেন জামিল ঐ এলাকার ওপর ৭.৬২ মিলিমিটার লাইট মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করতে থাকবেন।

৩. সার্কিট হাউসে পৌঁছানো মাত্র তারা সাবমেশিন গান নিয়ে দোতলায় ছুটে যাবেন এবং প্রত্যেকে সেখানে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে চলে যাবেন।

(গ) কক্ষ বণ্টন :

১. কক্ষ নং ৭-ক্যাপ্টেন জামিল হক।

২. কক্ষ নং ৮- লেফটেন্যান্ট রফিকুল হাসান খান।

৩. কক্ষ নং ৯- লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার।

(ঘ) পরিবহন : পিক আপ ড্রাইভ করবেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মেহবুব।

(ঙ) কমান্ড লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফজলে হোসেন।

২. দ্বিতীয় গ্রুপ

(ক) সদস্যদের নাম :

১. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমান।

২. মেজর মোমিনুল হক।

৩. মেজর মোজাফফর হোসেন।

৪. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ইলিয়াস।

৬. লেফটেন্যান্ট মোসলেহ উদ্দিন।

(খ) দায়িত্ব : প্রথম দলটি প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে যাওয়ার সময় বাইরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

(গ) পরিবহন : পিক আপ ড্রাইড করবেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমান।

(ঘ) কমান্ড : মেজর মোমিনুল হক।

৩. তৃতীয় গ্রুপ

(ক) সদস্যদের নাম :

১. মেজর গিয়াসউদ্দিন।

২. মেজর ফজলুল হক।

৩. ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমেদ।
৪. ক্যাপ্টেন সৈয়দ মোহাম্মদ মুনীর।

(খ) দায়িত্ব : সার্কিট হাউসের পেছনে আলমাস সিনেমা হলের কাছে দল হিসাবে কাজ করা এবং সার্কিট হাউস হতে যদি কেউ পালাতে চেষ্টা করে তাকে গুলি করে মারা।

(গ) পরিবহন : জিপ।

(ঘ) কমান্ড : মেজর গিয়াসউদ্দিন।

জিয়া পতেঙ্গা বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে যান। সার্কিট হাউসের দোতলার বারান্দায় ২ ঘন্টাব্যাপী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করেন। দুপুর সাড়ে বারোটায় আলোচনায় বিরতি দিয়ে তিনি চন্দনপুর মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েন। নামাজের পরে তিনি সার্কিট হাউসে আসেন এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ দুপুরের খাবার খান। তারপর তিনি প্রায় দেড় ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিকাল ৫ টায় তিনি চা পানের পর নিচ তলার হল রুমে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকের সাক্ষাৎ দান করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও অধ্যাপকবৃন্দ, বার এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিক মিলে প্রায় ৪৫ জন জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে জিয়া তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন।

রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বি.এন.পি-র দুই মারমুখী দলের আলোচনায় বসেন। মাঝে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার সাইফুদ্দিন আহম্মদ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এ.বি. এম বদিউজ্জামান কয়েক মিনিটের জন্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

রাত ১১টার পরে রাষ্ট্রপতি রাতের খাবার খান। তিনি ঢাকায় তাঁর স্ত্রীকে ফোন করেন এবং প্রায় ১৫ মিনিট ধরে কথা বলেন। এ সময় আকস্মিকভাবে প্রবল বজ্রপাতসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। জিয়া মধ্যরাতের কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়েন।

৩০শে মে রাত সাড়ে তিনটায় কালুরঘাট থেকে বিদ্রোহীরা সার্কিট হাউস অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। বিদ্রোহীরা দুটি পিক আপসহ কোনো রকম বাধা ছাড়াই সার্কিট হাউসে ঢুকে পড়ে। লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন হ্যান্ড ল্যাঞ্চার দিয়ে গোলা বর্ষণ করেন। গ্রেনেড রাইফেল থেকে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে হালকা মেশিন গান এবং সাব মেশিন থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। তারপর বিদ্রোহীরা দৌড়ে দোতলায় ওঠে। লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন এবং ক্যাপ্টেন জামিল গুলিবিদ্ধ হন, যার ফলে ফজলে হোসেন দোতলায় উঠতে পারেননি। সম্ভবত দ্বিতীয় গাড়ি থেকে বিদ্রোহীদের গুলি বর্ষণের ফলে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হন। ক্যাপ্টেন জামিল আহত অবস্থাতেই দোতলায় যান লে. কর্ণেল মেহবুব নিচ তলায় অবস্থান করেন। লে. কর্ণেল মতি, মেজর খালেদ, মেজর মোজাফফর, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, লে.

মোসলেউদ্দিন, আহত ক্যাপ্টেন জামিল হক, ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার ও লে. রফিকুল হাসান খান দোতলায় যান এবং প্রত্যেক ঘরের দরজায় লাথি মারতে শুরু করেন। ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার ৯ নং কক্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থান করছেন ভেবে দরজায় ধাক্কা দেন এবং ড. আমিনা রাহমানকে দেখতে পান। এ সময় ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন বলতে থাকেন এই যে প্রেসিডেন্ট প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি সিঁড়ির পাশে ৪ নং কক্ষে অবস্থান করছিলেন। এই কক্ষে দুইটি দরজা ছিল একটি সিঁড়ির দিকে– অন্যটি বারান্দার দিকে। বারান্দার দিকের দরজাটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। লে. কর্ণের মতি ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার তালা দেওয়া দরজায় লাথি মারতে শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি সিঁড়ির দিকের দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসেন আর এ সময়ই ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন চিৎকার করে বলে "এই যে প্রেসিডেন্ট"। জিয়া ধীরস্থির ও শান্তভাবে জিজ্ঞেস করেন "কী হয়েছে তোমরা কী চাও"। এ সময় মেজর মোজাফফর ও লে. মোসলেহউদ্দিন জিয়ার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করছিলেন। মোসলেহ উদ্দিন বলেন চিন্তা করবেন না স্যার, ভয়ের কোনো কারণ নাই। সম্ভবত তাঁরা ঐ সময়ে ঐ ধারণা পোষণ করছিলেন যে রাষ্ট্রপতিকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হবে– হত্যা করা হবে না। লে. কর্ণেল মতি জিয়াকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার সাব-মেশিনগান দিয়ে খুব নিকট থেকে গুলি বর্ষণ করে। জিয়া শরীরের ডান দিকে প্রবলভাবে গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘুরে দরজার কাছে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর শরীর থেকে প্রবল রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। মতি এতই রাগান্বিত ছিল যে আহত জিয়ার শরীর উল্টিয়ে তাঁর মুখ মণ্ডলের উপর এক ম্যাগাজিন গুলিবর্ষণ করে। ৪-৩২ মিনিটে জিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মতি তাড়াহুড়া করে আহত অফিসারদের নিয়ে সেনানিবাসের প্রথম গেট দিয়ে ৬৫ পদাতিক বিগ্রেড সদর দপ্তরে আসে।

লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিলকে লে. কর্ণেল দেলোয়ার তাঁর গাড়িতে করে সি এম এইচ-এ স্থানান্তর করে। লে. কর্ণেল দেলোয়ার তারপর জেনারেল মনজুরের বাসায় যায় এবং জিয়া হত্যাকাণ্ডের খবর দেয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রপতির প্রধান নিরাপত্তা অফিসার লে. কর্ণেল আহসান, প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ, নায়েক আবু তাহের, সিপাহী আবুল কাশেম, সিপাহী আবদুর রউফ, সিপাহী শাহ আলম নিহত হন। গার্ড রেজিমেন্টের সিপাহী মাইনুদ্দিন, সিপাহী আবদুল হাই সরদার এবং রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী নায়েক রফিউদ্দিন আহত হন। পুলিশ কনস্টেবল দুলাল মিয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

মেজর জেনারেল মনজুর দেলোয়ারের কাছ থেকে সব ঘটনা জেনে বেসামরিক পোশাকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ৬ ইস্ট বেঙ্গলের সদর দপ্তরে যান। লে. কর্ণেল মেহবুব, মেজর খালেদ, ক্যাপ্টেন সাত্তার ও ক্যাপ্টেন রফিক ৫টার দিকে আগ্রাবাদ

রেডিও স্টেশনে যায় এবং কতর্ব্যরত পুলিশদের নিরস্ত্র করে রেডিও স্টেশনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

সাধারণ সৈনিকদের এই অপারেশনের সঙ্গে জড়িত করতে জেনারেল মনজুরের নিষেধ সত্ত্বেও মেজর খালেদ সৈন্য সংগ্রহে উদ্যোগী হন। রাত তখন প্রায় নয়টা বাজে। মেজর রেজা ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে ৬৯ ব্রিগেড সদর দপ্তরে মেজর খালেদের অফিসে যান এবং সেখানে মেজর খালেদের সঙ্গে মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন কাসেম ও ক্যাপ্টেন ইকবালকে বসে গল্প করতে দেখেন। মেজর খালেদ উল্লিখিত অফিসারদের অস্ত্র গোলাবারুদসহ কিছু সৈন্য আনতে বলেন। এই সময় মেজর মোস্তফা (৬৯ ব্রিগিডের ডি কিউ) খালেদের অফিসে ঢুকেন এবং কথাগুলো শুনে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোস্তফা ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মহসিনকে ফোন করে খালেদের সন্দেহজনক কর্মতৎপরতার কথা অবহিত করেন। ব্রিগেডিয়ার মহসিন সৈন্য মোতায়েন করা এবং এসব কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য খালেদকে তাঁর আদেশ জানানোর জন্য মেজর মোস্তফাকে জানান। মহসিন জিওসি কেও ব্যাপারটি জানানোর চেষ্টা করেন কিন্তু যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্রিগেডিয়ার মহসিন এই সময় অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল অফিসারের পরামর্শে নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন।

মেজর খালেদ, শওকত, রেজা, ইকবাল ও কাশেম ৬৯ ব্রিগেড সদর দপ্তরের সন্নিকটে কালভার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে লে. কর্ণেল মতি ও মেহবুব হেঁটে এলেন। এখানে মেজর শওকত ১৫ ইস্ট বেঙ্গল থেকে সৈন্য আনতে দ্বিধা প্রকাশ করেন। ইকবাল বলেন যে, জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণের প্রস্তাবে সৈন্যরা তাঁদেরকেই হত্যা করতে পারে। লে. কর্ণেল মতি স্পষ্টতই বলেন যে, আমরা জিয়াকে হত্যা করতে যাচ্ছি কোনোক্রমেই তা সৈন্যদের বলা হবে না। মেজর খালেদ ইকবালকে কাওয়ার্ড বলে গালিগালাজ করেন। মেজর শওকত কাশেম ও ইকবাল ১৫ বেঙ্গল থেকে সৈন্য আনতে চলে যান। লে. কর্ণেল মতি ও মেহবুবকে জিওসি-কে ডেকে পাঠান। মতি ও মেহবুব জিওসি-এর অফিসে যান। রেজাও তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে থাকেন। আকাশ তখন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রেজা লে. কর্ণেল মতিকে বললেন, স্যার আকাশের অবস্থা দেখেছেন, একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। কয়েকজন অফিসার গিয়েই অপারেশন সফল করা সম্ভব। রেজা আরও বললেন যে, সন্দেহজনক গতিবিধি ও ফিসফাসে সবাই জেনে গেছে যে আমরা কী করতে যাচ্ছি। এখন যদি কিছু না করা হয় তাহলে কাল সকালেই আমাদেরকে গ্রেফতার করে কোর্ট মার্শাল করা হবে। লে. কর্ণেল মেহবুবের নির্দেশে ৫৭৫ ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অফিসার কমান্ডিং ক্যাপ্টেন মুজিব সার্কিট হাউস রেকি করতে যান। এই সময় মুজিব ফিরে এসে

হতাশাব্যঞ্জক রিপোর্ট দেন। মুজিব বলেন, স্যার ডোন্ট গো। প্রেসিডেন্ট কড়া প্রহরায় আছেন। ইমপসিবল, ভেতরেই ঢুকতে পারবেন না। মেজর রেজা বাধা দিয়ে মতিকে বলেন, বাজে কথা, আকাশের দিকে তাকান, কিছুক্ষণের মধ্যে বজ্রবৃষ্টি শুরু হবে। তখন সব প্রহরীরাই ঘরে ঢুকে পড়বে। মেজর রেজা আর বলেন যে, স্যার আমি এসব ফিসফাসের মধ্যে নেই। আমি বাসায় যাচ্ছি– যদি অপারেশনে যান তাহলে আমাকে ফোন করলেই আমি চলে আসবো। তারপর মেজর রেজা শেরশাহ কলোনিস্থ তাঁর বাসায় যান এবং জাংগল পোশাক খুলে খাঁকি ড্রেস (শুধুমাত্র প্যান্ট) পরিধান করে বিছানায় শুয়ে পড়েন। এতে তাঁর স্ত্রী অবাক হলে রেজা বলেন যে, কাল সকালেই আবার কনফারেন্স আছে। তাড়াতাড়ি যেন যেতে পারেন সেজন্য ইউনিফরম পরেই ঘুমাতে হবে। মেজর রেজার ফোন খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাজেনি। দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে অপারেশন প্রায় বাতিল হওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। মেজর শওকত একাকী এসে হতাশাব্যঞ্জক খবর দেন। তিনি জানান কাশেম ও ইকবাল যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বিশেষ করে কিছুদিন আগে জিওসি কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কাশেম মনজুরের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় মেজর শওকত কোনো সৈন্য আনতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তবে সার্কিট হাউসে আক্রমণ চলাকালে মেজর শওকত ও মেজর লতিফ চট্টগ্রাম ক্লাবের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতি পলায়ন রোধ করাও এদের দায়িত্ব ছিল।

সার্কিট হাউসে যখন গুলিবর্ষণ হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রপতির এডিসি ক্যাপ্টেন মাজহার রাষ্ট্রপতির পাশের কক্ষে অবস্থান করছিলেন। বেসামরিক তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির কক্ষ থেকে এডিসি-র কক্ষে প্রবেশ করার জন্য একটি দরজা ছিল। অতি সহজেই এডিসি রাষ্ট্রপতির সাহায্যে আসতে পারতেন। হত্যাকারীরা যখন রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করছিলেন তখন এডিসি-এর কক্ষ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বেরিয়ে যেতে পারতেন। রাষ্ট্রপতির কক্ষের দরজা থেকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ থাকলেও এডিসি ধাক্কা দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে খুলে দিতে বলতে পারতেন। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে ক্যাপ্টেন মাজহার এই দরজা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার কোনো চেষ্টা না করে তিনি ফোনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। লে. কর্নেল মাহফুজও রাষ্ট্রপতির সাহায্যে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হন।

ক্যাপ্টেন মাজহারকে নৌবাহিনী প্রধানের এডিসি ফোন করে গুলিবর্ষণের বিষয়ে জানতে চান। এই সময় বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জামান লে. কর্নেল মাহফুজকে ফোন করে গোলাগুলির কারণ জানতে চান। মেজর আব্দুল্লাহ আলমাস সিনেমা হলের কাছে একটি বাসায় থাকতেন। তিনিই প্রথম মনজুরকে ফোনে গোলাগুলির খবর দেন।

জিয়া হত্যার পরবর্তী ঘটনা :
১২ জন অফিসারের ফাঁসি

হত্যাকারীরা সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে গেলে ক্যাপ্টেন মাজহার বুকে হেঁটে দুই নম্বর কক্ষে যান এবং রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী নায়েক রফিকের রক্তক্ষরণ দেখতে পান। মাজহার নায়েক রফিকের সাবমেশিনগানটি তুলে নিয়ে আবার নিজ কক্ষে ফিরে যান।

রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক লে. কর্ণেল মাহতাবুল ইসলাম বিদ্রোহীদের প্রত্যাহার পর্বের পরে বেরিয়ে আসেন এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন এবং পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। এই সময় মাহফুজ লুঙ্গি ও শার্ট পরিহিত অবস্থায় তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। ড. আমিনা রহমান প্রায় ৪৫ মিনিট পরে তাঁর কক্ষ থেকে বের হন। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান এই ঘটনার ভয়াবহতায় এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে তাঁরা দরজা খোলেন।

ক্যাপ্টেন মাজহার (রাষ্ট্রপতির এডিসি) আনুমানিক ভোর সাড়ে পাঁচটায় টেলিফোনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীকে হত্যাকাণ্ডের খবর দেন। কিছুক্ষণ পরে নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এ, খান, বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন, জেলা কমিশনার জিয়াউদ্দিন ও পুলিশ কমিশনার জামান সার্কিট হাউসে যান।

লে. কর্ণেল মাহফুজ ঢাকায় ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস ও তাঁর স্টাফের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাষ্ট্রপতির লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনী প্রধান, সামরিক সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম পাঠাতে অনুরোধ করেন। ডা. বদরুদ্দোজা, মহিবুল হাসান ও ড. আমিনা রহমান সার্কিট হাউস ছেড়ে শহরের কোনো বাসায় চলে যান। লে. কর্ণেল মাহফুজ, লে. কর্ণেল মাহতাব ও ক্যাপ্টেন মাজহার বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিনের বাসায় যান।

মেজর জেনারেল মনজুর ৬ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদারকে কুমিল্লা থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দুই কোম্পানি সৈন্য শুভপুর ব্রিজের দিকে পাঠাতে এবং সিগন্যাল সেন্টারে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন।

নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে ২০৩ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর সালাম, ৬ ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন ইলিয়াস ও লে. মোসলেউদ্দিন ৩০ মে সকাল সাড়ে ন'টার সময় শুভপুর ব্রিজের উদ্দেশে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে যাত্রা করেন এবং শুভপুর পৌঁছে শুভপুর ব্রিজ ও ফেনী নদী উপরে নতুন ব্রিজ এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন।

মনজুর ৬ ইস্ট বেঙ্গল থেকে তাঁর অফিসে যান এবং সকল ব্রিগেড কমান্ডার, ডিভিশনাল স্টাফ অফিসার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ড্যান্ট, কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, আর্টিলারি সেন্টার কমান্ডান্ট এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ সকল ইউনিট অধিনায়কদের তাঁর অফিসে আসার নির্দেশ দেন। এখানে মনজুর উপস্থিত অফিসারদের উদ্দেশে বক্তৃতায় বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রত্যেককে পবিত্র কোরান স্পর্শ করে বিপ্লবের প্রতি অনুগত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ ও লে. কর্নেল শাজাহান ছাড়া উপস্থিত সবাই শপথ গ্রহণ করেন। বিমানবাহিনীর বেস কমান্ডার ও তাঁর স্টাফ অফিসার (অপারেশন) ও জেনারেল স্টাফ-২ (অপারেশন) বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম রেঞ্জের পুলিশের ডি, আই, জি ও বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সেক্টর কমান্ডারও অনুরূপভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

তারপর মনজুর ৩০৫ ব্রিগেডকে শুভপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম রক্ষা ও কুমিরা সমুদ্র তীর অবরোধ করার জন্য নির্দেশ দেন। ৬৫ ব্রিগেডকে চট্টগ্রাম শহর রক্ষা করার জন্য এবং ৬৯ ব্রিগেডকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও রেডিও স্টেশনসহ কালুরঘাট এলাকা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দেন।

৩০ মে সকাল ন'টায় মেজর রেজা অফিসে আসেন। মনজুর তাঁর অফিসের সামনে পায়চারি করছিলেন। মনজুর রেজাকে হাতের ইশারায় ডেকে তাঁকে তাঁর নিরাপত্তা অফিসার নিয়োগ করেন। উল্লেখ্য যে, মেজর রেজা তখন থেকে মনজুরের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত একান্ত অনুগত হিসাবে মনজুরের বডিগার্ড হিসেবে কাজ করেন।

লে. কর্নেল মতির নির্দেশে মেজর মোজাফফর, মেজর শওকত ও মেজর রেজা ঐ সময় সার্কিট হাউসে যান। বেলা ১২ টার দিকে মেজর রেজা রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের জীবিত সৈনিকদের সেনানিবাসে নিয়ে আসেন। মেজর শওকত ও মেজর মোজাফফর রাষ্ট্রপতি জিয়া, লে. কর্নেল আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ কাপ্তাই সড়কের পাশে রাঙ্গুনিয়া থানার পাথরঘাটায় নিয়ে যান। সেখানে গ্রামের একজন মৌলভীর সাহায্যে জানাজা পড়ানো হয় এবং তিনটি লাশ গাড়ির ত্রিপল দিয়ে জড়িয়ে মাটি খুঁড়ে একসঙ্গে চাপা দিয়ে দাফন সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ রেডক্রস জিয়ার লাশ চাইলে বিপ্লবী পরিষদের পক্ষে মনজুর লাশ দিতে অস্বীকার করেন।

লে. কর্নেল মাহফুজ, লে. কর্নেল মাহতাব ও ক্যাপ্টেন মাজহারকে বিভাগীয় কমিশনারের বাসা থেকে সকাল সাড়ে এগারোটায় মেজর রওশন ইয়াজদানী চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ডিভিশনাল সদর দপ্তরে নিয়ে আসেন এবং পরে ৬৯ ব্রিগেড মেসে থাকার ব্যবস্থা করেন।

৩০শে মে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। সমগ্র চট্টগ্রাম নগরী জিয়া নিহত হওয়ার সংবাদে শোকের নগরীতে পরিণত হয়। ৩১শে মে চট্টগ্রামে পৌর কমিশনার মাহবুব, শ্রমিক নেতা লিয়াকত ও যুবদল নেতা রমিজ আহমেদের নেতৃত্বে জিয়ার গায়েবানা জানাজা পড়ার আয়োজন করা হয়। লালদীঘি ময়দান সংলগ্ন পুকুর পাড়ে জানাজা পড়ানোর পরে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে।

৩০শে মে বেলা ১২ টায় মনজুর ২৪ ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৩১শে মনজুর ১১ ইস্ট বেঙ্গল, ২৮ ইস্ট বেঙ্গল, আর্টিলারী সেন্টার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, ৩৫ সরবরাহ ও যান ব্যাটালিয়ান, ৩১ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স, ১৮ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ও ৩৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। মনজুর সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশে বলেন, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছে এটা বড় কথা নয়– কেন তিনি নিহত হয়েছেন সেটাই বড় কথা– সারাদেশে দুর্নীতি চলছে– আপনাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি বুট তিন মাসের বেশি টেকে না– এইসব দুর্নীতি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। মনজুর বিপ্লবী পরিষদের প্রতি সৈনিকদের সমর্থন আছে কি না হাত তুলে জানাবার জন্য বললে সবাই নিরুৎসাহভাবে হাত তোলেন। মনজুর স্পষ্টতই সৈনিকদের নিরুৎসাহভাব দেখে হতাশ হন। তা ছাড়া সৈনিকদের সমর্থন আদায়ের জন্য যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন ছিল– তা করতে তিনি পারেননি।

৩১শে মে মনজুর চট্টগ্রামর ডিপুটি কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে বেসামরিক অফিসার, সাংবাদিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্দেশ্যেও ভাষণ দেন এবং বিপ্লবী পরিষদকে সমর্থন দেয়ার অনুরোধ করেন। চট্টগ্রাম রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালককে চব্বিশ ঘণ্টা অনুষ্ঠান চালু রাখার নির্দেশ দেন এবং বিপ্লবের সমর্থনে অনুষ্ঠান প্রচারের নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেন। বন্দর কর্তৃপক্ষকে ঢাকায় কোনো খাদ্য, পেট্রোল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাঠাতে নিষেধ করেন। লে. কর্ণেল মতি ও মেজর হাশমি স্থানীয় পত্রিকা অফিসে গিয়ে বিপ্লবী পরিষদের সমর্থনে নিবন্ধ প্রকাশের নির্দেশ দেন। মেজর খালেদ চট্টগ্রাম অধিবাসীদের সমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন।

জেনারেল মনজুর অন্যান্য সেনানিবাসে গোপন দূত পাঠিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। মেজর জহির তার চিঠি নিয়ে কুমিল্লায় মেজর জেনারেল সামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে বিপ্লবী পরিষদের ১১ দফা ঘোষণা প্রচারিত হয় (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)। লে. জেনারেল এরশাদকে ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকে পদাবনতি ও বরখাস্ত করে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে সেনাবাহিনী

প্রধান নিয়োগ করা হয়। ৩১ শে মে রাত ন'টায় মনজুর চট্টগ্রাম বেতার থেকে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে নজিরবিহীন দুর্নীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির অবক্ষয়ের উল্লেখ করেন। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, মন্ত্রিসভার অর্ধেকেরও বেশি স্বাধীনতা-বিরোধীদের মধ্য থেকে নেয়া হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মতো পদগুলো কলুষিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। বিপ্লবী পরিষদ দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ মর্যাদা দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ঘোষণা করে তিনি জনগণকে বিপ্লবী পরিষদকে সমর্থন করার আহবান জানান।

মনজুর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল নুরুদ্দীনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। মনজুর ঢাকায় মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ও মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চান। ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আমিনুল ইসলামের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এঁরা তিনজনই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং স্পষ্টত মনজুর মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যাকাণ্ডের দিন উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার ঢাকা সেনানিবাসে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ কুষ্টিয়ায় অবস্থান করছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(১) ধারার বিধান বলে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের ১৪১'ক' ধারা বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং এক আদেশ বলে সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্থগিত ঘোষণা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করেন যে, জিয়ার মৃত্যুতে জাতি চল্লিশ দিনব্যাপী শোক পালন করবে এবং ঐ সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

৩০শে মে পৃথক পৃথকভাবে তিন বাহিনী প্রধান ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে এই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অবিচল আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, খোন্দকার মোশতাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম, জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল, আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, কাজী জাফর ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখেরাও উপস্থিত ছিলেন। সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ প্রধানেরা দেশের সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তাঁদের সর্বাত্মক

আনুগত্য ঘোষণা করেন। ৩১শে মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানের প্রতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর আগে ৩০শে মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধান লে. জেনারেল এরশাদ এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, ৩১শে মে দুপুর বারোটার মধ্যে যাঁরা শুভপুর ব্রিজ অতিক্রম করে অনুগত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে তাঁদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। জেনারেল এরশাদ মনজুরসহ সকল অধিনায়কেরও নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করেন।

জেনারেল এরশাদের এই ঘোষণা প্রথমে আধ ঘণ্টা পর পর এবং পরবর্তীকালে এক ঘণ্টা পর পর রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিল। সেনাবাহিনী প্রধানের এই ঘোষণা সাধারণ সৈন্যদের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। বিপুলসংখ্যক অনুগত অফিসার ও সৈনিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুভপুর ব্রিজ অতিক্রম করতে শুরু করে। ৩১শে মে জেনারেল এরশাদ সময়সীমা ১৮ ঘণ্টা বৃদ্ধি করে ১লা জুন ভোর ছ'টার মধ্যে মনজুরসহ সকল অধিনায়ক, অফিসার ও সৈনিকদের আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেন। এই ঘোষণায় জেনারেল এরশাদ চূড়ান্ত সময় সীমার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণের জন্য অফিসার ও সৈন্যদের আহ্বান জানান। যাঁরা তাঁর এই নির্দেশ মানবে তিনি তাঁদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

৩১শে মে বেলা ১১টায় ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল, ২৬ ইস্ট বেঙ্গল ও ৩৬ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার ও সৈন্যরা শুভপুর ব্রিজ অতিক্রম করে অনুগত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। কিছুক্ষণ পরেই ১২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড সদর দপ্তর, ১১৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানি, ৩১ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স ও ২৮ ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরাও আত্মসমর্পণ করেন। লে. কর্ণেল জোয়ার্দার, মেজর কাইউম, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, মেজর সালাম, মেজর ইসমত ও ক্যাপ্টেন ইলিয়াস আত্মসমর্পণ করেন। বাকী অফিসার ও সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্তভাবে দ্রুত চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ফিরে আসে।

বিপুলসংখ্যক সৈনিকের দলত্যাগের সংবাদে জেনারেল মনজুর হতাশ হয়ে পড়েন। ৩১শে মে সন্ধে ছ'টায় মনজুর ব্রিগেড কমান্ডার, ইউনিট অধিনায়ক ও স্টাফ অফিসারদের এক বৈঠক ডাকেন। মনজুর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ঢাকার সঙ্গে আপস-আলোচনার পক্ষে মত প্রকাশ করলে লে. কর্ণেল মতি ও দেলোয়ার ছাড়া সবাই মনজুরের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। সাড়ে ছ'টায় ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহকে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। মনজুরের নির্দেশ মতো হান্নান শাহ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন থেকে বিপ্লব বিরোধী প্রচার

বন্ধ করে চট্টগ্রাম অভিমুখে কুমিল্লা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে অনর্থক রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ শুরু না করতে অনুরোধ জানান যে, আপস-আলোচনার অবকাশ আছে। হান্নান শাহ মনজুর কর্তৃক চারটি দাবি চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল নুরুদ্দীনকে জানান। প্রথমত, সারাদেশে সামরিক আইন জারি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। তৃতীয়ত, সংসদ বাতিল করতে হবে এবং চতুর্থত, বিপ্লবী পরিষদকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অপরপক্ষে নুরুদ্দিন সরকার ঘোষিত নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে এসব দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান। রাত একটার সময় মনজুর নুরুদ্দিনের সঙ্গে সর্বশেষ ফোনে আলাপ করেন। উভয়ের আলাপ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কী আলাপ হয়েছিল তা সঠিক জানা যায়নি।

১লা জুন রাত ১-৩০ মিনিটে মেজর জেনারেল মনজুর, মেজর মোজাফফর ও মেজর রেজাকে সঙ্গে করে ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে তাঁর বাসভবনে যান। মেজর রেজা জিপে বসে থাকেন এবং মনজুর ও মোজাফফর বাসার ভেতরে যান। প্রায় আধঘন্টা পরে মনজুর ও মোজাফফর বাসা থেকে বেরিয়ে এসে জিপে চড়েন। এই সময় জিপ থেকে ফ্লাগ সরিয়ে ফেলা হয়। জিপটি দ্রুতবেগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে হাটহাজারীর দিকে যেতে শুরু করে। জিপটি চালাচ্ছিলেন ড্রাইভার। মনজুর পাশের আসনে এবং মোজাফফর ও রেজা পেছনের আসনে বসেছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জিপটি থামে এবং একটু আড়ালে জিপ পার্ক করে তাঁরা সবাই জিপ থেকে নেমে পড়েন। রেজা মোজাফফরকে থামার কারণ জিজ্ঞেস করলে মোজাফফর বলেন জিওসি পরিবারবর্গ আসবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটি জিপ ও স্টাফ কার এসে পৌঁছালো। স্টাফ কারে মনজুরের স্ত্রী ও তিন ছেলে মেয়ে ও লে. কর্ণেল দেলোয়ারের স্ত্রী ও তিন মেয়ে। জিপটিতে ছিলেন লে. কর্ণেল মতি ও লে. মেহবুব। মতি গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর গাড়িগুলো থামলো। তখন একটি পিক আপ এসে যোগ দিলো। পিক আপটিতে ছিলেন আহত লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিল। এই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন মেজর খালেদ। মেজর গিয়াস, মেজর ইয়াজদানী ও ক্যাপ্টেন মুনীরও এদের সঙ্গে ছিলেন।

এখান থেকে জিওসি-র স্টাফ কারের ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে জিপের ড্রাইভারসহ সেনানিবাসে চলে যেতে বলা হয়। অন্য চারটি গাড়ি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম জিপ চালাচ্ছিলেন লে. কর্ণেল মতি। পাশের আসনে মাহবুব এবং পেছনে মোজাফফর ও মুনীর বসেছিলেন। দ্বিতীয় জিপটি চালাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস। পাশের আসনে মনজুর এবং পেছনে মেজর রেজা ও মনজুরের ছেলে-মেয়েরা। তৃতীয় জিপটি চালাচ্ছিলেন মেজর ইয়াজদানী। পাশের আসনে মনজুরের স্ত্রী ও দেলোয়ারের স্ত্রী এবং পিছনের আসনে দেলোয়ারের তিন মেয়ে।

চতুর্থ গাড়ি পিক আপটি চালাচ্ছিলেন মেজর খালেদ। এই পিক আপে ছিলেন আহত ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। লে. কর্ণেল মতির জিপটি ১২ ইনজিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নের এক ট্রাক সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ইনজিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের সঙ্গে মেজর মান্নান ছিলেন। লে. কর্ণেল মতি মান্নানকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলি ছোঁড়েন। নায়েক সুবেদার শামসুল আলম গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এরপরে ১২ ইনজিনিয়ার ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং ঘটনাস্থলেই মতি ও মেহবুব নিহত হন। ক্যাপ্টেন মুনিরকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেজর মোজাফফর পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। গুলিবর্ষণের শব্দে মনজুর গাড়ি থামাতে বলেন এবং চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করেন। এই সময় মনজুরের জিপটি বিকল হয়ে গেলে ছেলেমেয়েসহ মনজুর ও অন্যান্যরা মেজর ইয়াজদানী চালিত তৃতীয় জিপে এবং গিয়াস ও রেজা খালেদ চালিত পিক আপে চড়েন।

প্রথমে মনজুর গুইমারা এলাকায় মোতায়েনকৃত ২১ ইস্ট বেঙ্গলের এলাকায় যেতে মনস্থির করেছিলেন। লে. কর্ণেল মেহবুব এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন বলে সেখানে যাওয়া নিরাপদ ভেবেছিলেন। পরে সেখান থেকে রামগড় এলাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ভারতে যেতে মনস্থির করেছিলেন। জানা যায় মনজুরের স্ত্রী ভারতে যেতে নিষেধ করেন কারণ বিপ্লবী পরিষদ পঁচিশ বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি বাতিল করেছিল।

পরবর্তীকালে লে. কর্ণেল মতি ও মেজর মান্নানের সংঘর্ষের শব্দে মনজুর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফটিকছড়ির দিকে যাত্রা করেন। এখানে তিনি তাঁর র‍্যাংক খুলে ফেলেন এবং গিয়াস ও রেজাকে র‍্যাংক ব্যাজ খুলে ফেলতে বলেন। আহত লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিলকে পথিমধ্যে ফেলে রেখে মনজুর তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে এবং দেলোয়ারের মেয়েসহ মেজর গিয়াস ও রেজাকে সঙ্গে নিয়ে পার্বত্য এলাকা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। মেজর ইয়াজদানী ও মেজর খালেদ গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

মনজুর স্থানীয় গাইডের সাহায্যে অগ্রসর হতে থাকেন। কিছু দূর এসে প্রথম গাইড পরিবর্তন করে দ্বিতীয় গাইড নেয়া হয়। দ্বিতীয় গাইডের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তৃতীয় গাইড নেয়া হয়। খুব সম্ভব দ্বিতীয় গাইড ফটিকছড়ি থানায় এসে খবর দেয়। মনজুর সবাইকে নিয়ে প্রায় আড়াইটার সময় ফটিকছড়ি থানার পাইন্দ ইউনিয়নের খৈয়াছড়া চা বাগানে পৌঁছান। এখানে মনজুর চা বাগানের কুলি মনু মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেন।

স্থানীয় বাজার থেকে শিশু ও মহিলাদের জন্য খাবার কিনে আনা হয়। তখন বিকেল চারটা বেজে গেছে। পুলিশ এই সময় তাদেরকে ঘিরে ফেলে। বি.এন.পি-র

সমর্থক ছাত্র-জনতা চারিদিক থেকে শ্লোগান দিতে থাকে। মনজুর গিয়াস ও রেজাকে পালিয়ে যেতে বলে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, আমি এখানে আছি- কোনো গোলমালের প্রয়োজন নেই, আমি আত্মসমর্পণ করছি। গিয়াস চা বাগানে আত্মগোপন করে এবং রেজা নিকটস্থ নালায় লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে অপর প্রান্তে চলে যান। এই পুলিশ বাহিনীতে ছিল হাটহাজারী থানার ইন্সপেক্টর মোস্তফা, গোলাম কুদ্দুস, এন এস আই-এর সাত্তার ও আজাদ, ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন-চার্জসহ কয়েকজন কনস্টেবল। ফটিকছড়ি থানার কনস্টেবল সুধীরের কাছে মনজুর আত্মসমর্পণ করেন। মেজর রেজাও এই সময় নালা থেকে উঠে এসে আত্মসমর্পণ করেন। বিকেল পাঁচটায় একজন কন্ট্রাকটরের জিপে তাদের হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রনেতা মনজুরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে এবং হাটহাজারী থানার চারিদিকে সমবেত হয়। মনজুরের ধৃত হওয়ার সংবাদ পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান হাটহাজারী পৌঁছেন। মনজুর শাহজানকে বলেন, আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে- সুতরাং আমি আর সেনাবাহিনীর কেউ নই। আমাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দাও।

চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদ কয়েকজন সৈন্যসহ হাটহাজারী পৌঁছান। রাত তখন প্রায় দশটা। মনজুর সেনানিবাসে যেতে অস্বীকার করলে তাঁকে প্রায় জোর করেই সেনাবাহিনীর গাড়িতে উঠানো হয়। পুলিশের ট্রাক সামনে, পেছনে মেজর রেজাকে বহনকারী জিপ, পরিবারবর্গ নিয়ে পিক আপ ও একটি পুলিশ ট্রাক এবং তারপরে এসকর্ট অফিসার ক্যাপ্টেন এমদাদ ও জেনারেল মনজুরকে বহনকারী জিপ ও পুলিশের অন্যান্য পরিবহনের একটি বিরাট কনভয় চট্টগ্রাম সেনানিবাস অভিমুখে যাত্রা করে। দুই নম্বর এম পি, চেক পোস্ট দিয়ে তাঁরা সেনানিবাসে প্রবেশ করলে পুলিশ কনভয় আলাদা হয়ে শহরে চলে যায়।

মনজুরের পরিবারবর্গকে ফ্লাগ স্টাফ ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর রেজাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে; পরে সেখান থেকে ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটে। রেজা সেখানে মেজর মুজিবের সাক্ষাৎ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রেজাকে বন্দি করার সময় থেকেই হাত পেছন করে বেঁধে চোখ বেঁধে ফেলা হয়। সুতরাং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রেজা তা বুঝতে পারছিলেন না। মেজর মুজিবের কণ্ঠস্বরে তিনি বুঝলেন তাঁকে ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটে আনা হয়েছে। সেখানে চোখ বাঁধা অবস্থায় সারারাত কাটানোর পর সকালে আবার গাড়িতে তোলা হয়। ঘণ্টাখানেক পরে যখন তাঁর চোখ খোলা হয় তখন রেজা দেখলেন তিনি চট্টগ্রাম কারাগারের অভ্যন্তরে। সেখানে মেজর মুজিবসহ সকল বন্দি অফিসারদের দেখতে পান। মেজর গিয়াস পরে চা বাগান থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের বাসায় যান এবং ফটিকছড়ি থানায় আত্মসমর্পণ করেন।

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী মনজুরকে বহনকারী গাড়িটি যখন ভি.আই.পি হাউজের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন সেখানে বহুসংখক অস্ত্রধারী সৈন্য টহল দিচ্ছিল। ক্যাপ্টেন এমদাদ গাড়িটি ঘুরিয়ে আর্টিলারি লাইনের দিক দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার অফিসারস মেসের ভি.আই.পি হাউজে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। গাড়িটি ক্যান্টিন স্টোরস ডিপার্টমেন্টের কাছে এলে ২০ থেকে ৩০ জন সৈন্য গাড়িটি অবরোধ করে। সৈন্যরা এসকর্ট অফিসারকে অবিলম্বে ঐ স্থান ত্যাগ করতে বলেন। ভীতসন্ত্রস্ত এমদাদ ব্রিগেডিয়ার আজিজ ও ব্রিগেডিয়ার লতিফের কাছে রিপোর্ট করার জন্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে যান। ব্রিগেডিয়ার আজিজ ও ব্রিগেডিয়ার লতিফ অবিলম্বে এসকর্ট অফিসারকে ঘটনাস্থলে ফিরে যেতে আহবান জানান। এমদান ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন এবং মনজুরকে ড্রেনের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। মনজুরকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার পরীক্ষার পর মনজুরকে মৃত ঘোষণা করেন। লে. কর্ণেল এ জেড তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক পরীক্ষিত পোস্ট মোর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী মনজুরের মাথায় ডান অসিপিটাল রিজিয়নে ৪ ও ২ ইঞ্চি গর্ত দেখা যায়। একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে মাথার হাড় ও মগজ ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং তাঁর শরীরে আর কোনো আঘাত ছিল না। মনজুরকে কে বা কারা একটি মাত্র বুলেট দিয়ে হত্যা করলো– তা সামরিক তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন মনজুর একজন সেনাবাহিনীর জেনারেল পদ মর্যাদায় উচ্চতর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন– সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মনজুরকে যাঁরা হত্যা করলো তাদের শনাক্ত করা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ছিল।

২রা জুন মনজুরের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। মনজুর, মতি ও মেহবুবের লাশ সেনানিবাস কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে অবসর প্রদান করে বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরীর চাকুরিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করে ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া কয়েকদিনের মধ্যেই বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকে অবসর প্রদান করা হয়।

জিল্লুর রহমান খান, Leadership Crisis in Bangladesh গ্রন্থে লিখেছেন,

Manzoor and his closest associates attempted to escape but were captured and brought to the Chittagong Cantonment, where Manzoor was killed under mysterious circumstances. The unexplained killing of Manzoor and the swift removal from command of such Senior Officers as Mir Shawkat Ali, former Commander of Jessore Garrison and Principal Staff Officer to the President, and Air-Vice Marshal M.

Sadruddin Chief of Airforce, folled by secret trial of Manzoor's co-conspirators and their execution in September, 1981-all cast serious doubts in the minds of Political commentrators as to the reason behind Zia's assassination. Some believe that Zia was killed because he wanted to bring about too critical a change in the traditional power relationships or because he wanted to shift his power base from a millitary-bureaucratic-industrial combine to a mass-oriental institutional frame, According to this interpretation the deaths of Zia and Manzoor can be attributed to a much bigger conspiracy. This interpretation also suggests that opponents of critical change, comprising mostly those with vested interests, are determined to maintain the status quo which consists essentially of the dominationg of the political system by a combincd elite of military, bureaucratic and entrepreneurial interests.

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অনেক তথ্যই রহস্যাবৃত হয়ে আছে। ভবিষ্যতে হয়তো কোনো রাজনৈতিক ভাষ্যকার অথবা অনুসন্ধিৎসু গবেষক অজানা তথ্য প্রকাশে সমর্থ হবেন। মনজুরের সঙ্গে বিদ্রোহ করে যাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তারা প্রায় সবাই কারা মেয়াদ শেষে মুক্ত হয়েছেন। মেজর খালেদ, কাইউম, মঈন ও মোজাফফর দেশের বাইরে পালিয়ে গেছেন। মনজুর ভেবেছিলেন মুজিব হত্যার মতো জিয়া হত্যার খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার সৈনিকেরা তাঁকেই সমর্থন দেবে। মনজুর নিজেকে জিয়ার চেয়ে জনপ্রিয় ভেবেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে অন্যরকম ঘটেছে। জিয়ার নিহত হওয়ার সংবাদে সৈনিকরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মৃত জিয়া জীবিত জিয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ঢাকাসহ অন্যান্য সেনানিবাস থেকে অপ্রত্যাশিত সমর্থন না পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় হতাশ হয়ে পড়েন। অনেকে বলেন মনজুর শুধু রাষ্ট্রপতিকে সেনানিবাসে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন- হত্যার আদেশ দেননি। ঘটনা যা-ই হোক-না-কেন–মনজুর সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে জোরপূর্বক সেনানিবাসে নিয়ে আসার জন্য বিদ্রোহ করতে নির্দেশ দিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধে তাঁর বিচার হতে পারতো এবং বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারতো। ইতিহাসে সেনা বিদ্রোহের জন্য দায়ী ও অপরাধী হিসেবে মনজুর চিহ্নিত হয়ে থাকবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ব্রিগেডিয়ার মহসিন, কর্ণেল নওয়াজিশ ও কর্ণেল রশিদ জিয়া হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন একথা অনেকেই অস্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার পরে মনজুরের আদেশে এরা তৎপর ছিলেন। সেনাবাহিনীর ধারা অনুযায়ী কোনো অফিসার বা সৈনিক বিদ্রোহের অস্তিত্বের কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে

তা প্রতিরোধ করবে। মহসিন, নওয়াজিশ ও রশিদ প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন এবং পরে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ব্রিগেড আয়ত্তে রাখতে ব্যর্থ হন।

বাংলাদেশ পেনাল কোডের সপ্তম অধ্যায় ফৌজদারী আইন ১৩৯ ধারা অনুযায়ী কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকেও সেনা বিদ্রোহের অপরাধে কোর্ট মার্শালে বিচার করা যাবে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। সুতরাং সেনাবাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী আইন ৩১ ধারার বলে বিদ্রোহী অফিসারদের বিচার করার জন্য একটি জেনারেল কোর্ট মার্শাল গঠন করেন। এই কোর্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, পিএসসি, এবং সদস্যবৃন্দ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নাসরাত আলী কোরেশী, কর্ণেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান, বিপি, কর্ণেল মফিজুর রহমান চৌধুরী, কর্ণেল মোহাম্মদ মাসুদ আলী খান, লে. কর্ণেল মকবুল হায়দার ও লে. কর্ণেল মোহাম্মদ হারিস, পিএসসি। সেনাবাহিনীর ৬৪ বিধি অনুযায়ী সরকারি পক্ষের কৌসুলী হিসেবে ব্রিগেডিয়ার নাজিরুল আজিজ চিশতি, পিএসসি, কর্ণেল এ, এম, এস, এ, আমিন, পিএসসি ও লে. কর্ণেল আবু নঈম আমিন আহমেদ, পিএসসি কে নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর ১৮ বিধি মোতাবেক অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সহায়তা করার জন্য ব্রিগেডিয়ার এম আনোয়ার হোসেন, কর্ণেল মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বিপি, পিএসসি ও লে. কর্ণেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বিপিকে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে মেজর জেনারেল মোজাম্মেল হোসেন, পিএসসিকে সামরিক তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিচারপতি রুহুল ইসলাম, বিচারপতি এ, টি, এম আফজাল ও খুলনার সেশন জাজ সৈয়দ সিরাজউদ্দিনকে অসামরিক তদন্ত কার্য সম্পাদনের সরকারি নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়।

সিভিল তদন্ত কমিটি দুই মাসের মধ্যেই সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করলেও সাত্তার সরকার জনসমক্ষে তা প্রকাশে বিরত থাকেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, ক্ষমতাসীন বিএনপি-র প্রভাবশালী নেতারা রিপোর্টটি প্রকাশ না করার জন্য সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এন্থনি ম্যাসকারেনহাস 'বাংলাদেশ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে লিখেছেন যে, All this understandably has raised quesitons in the public mind about the real truth of the events in Chittagong on that fateful night in May, 1981 and the circumstances surrounding President Zia and General Manzoor's death.

এই রিপোর্টে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার উল্লেখ ছিল– যার ফলে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং অতি সহজেই আক্রমণকারী দলটি

রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাত্তার সরকারের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে অক্ষমতা ও বি,এন,পি নেতাদের চাপ সৃষ্টির মূল কারণ বোধগম্য নয়।

সামরিক তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মেজর জেনারেল মোজাম্মেল ৩৩ জন সেনাবাহিনীর অফিসার (তিনজনের অনুপস্থিতিতে) এবং দুইজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে অভিযুক্ত করার সুপারিশ করেন এবং দশজন অফিসারকে চাকুরি থেকে অবসর প্রদানের সুপারিশ করেন। তিরিশ জন অফিসারের জেনারেল কোর্ট মার্শালে চট্টগ্রাম কারাগারের অভ্যন্তরে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে ১২ জন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৬ জন অফিসারকে ৭ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চারজন অফিসারকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দেয়া হয়। লে. কর্ণেল ফজলে হোসেন গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকায় তাঁর কোর্ট মার্শালে বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে ফজলে হোসেন সুস্থ হলে কোর্ট মার্শালে বিচার হয় এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অসামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে সাত্তার সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিনকে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে ইকনমিক মিনিস্টার হিসেবে বদলি করা হয়। ডিপুটি কমিশনার জিয়াউদ্দিন বর্তমানে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকে চাকুরিরত আছেন। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার অভিযোগে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় হয়নি। কোনো বেসামরিক বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১২ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের গোপন বিচার ও ফাঁসির আদেশ রদ করে প্রকাশ্য বিচারের দাবিতে গণসমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান লে. কর্ণেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান বক্তৃতা করেন। মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্ণেল (অব.) শওকত আলী ও মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মেজর (অব.) জিয়াউদ্দিনও ভাষণ দেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যার প্রকাশ্য বিচার দাবি করেন। এই সমাবেশে একটি হ্যান্ডবিলও বিলি করা হয়। এই হ্যান্ডবিলে মেজর জেনারেল মনজুরকে বিনাবিচারে হত্যা করারও বিচার দাবী করা হয়। এই হ্যান্ডবিলে আরও বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি হত্যা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দেশবাসীর এ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানার অধিকার আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি সংগঠনের প্রকাশ্য বিচারের দাবি সম্বলিত বিবৃতি ২৯-৭-৮১ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্তদের পক্ষে প্রকাশ্য, নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগদানের জন্য সুপ্রিমকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ফাঁসির আদেশ স্থগিত ঘোষণা করে মামলাটি এপোলেড ডিভিশনের বিচারকদের কাছে স্থানান্তর করে। এই সভায় ২৪ শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শহীদ মিনারে একদিনের গণ অনশন করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ফাঁসির আদেশ রদের জন্য আসামীদের পরিবার-পরিজন প্রেসক্লাবের সামনে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। বিরোধী জোটের নেতারা তাঁদেরকে এই অনশন ভঙ্গ করতে সম্মত করেছিলেন এই শর্তে যে, যে ভাবেই হোক ফাঁসির আদেশ কার্যকর রদ করা হবে অথবা দেশে প্রবল গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বিরোধী দলের নেতারা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে দেখা করতে বঙ্গভবনে যান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। বঙ্গভবনের প্রধান ফটকে বিরোধী নেতৃবৃন্দ গভীর রাত পর্যন্ত অবস্থান করে ফিরে আসেন। এপোলেড ডিভিশনের রায় অনুযায়ী ২২শে সেপ্টেম্বর ভোর রাতে চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত ১২ জন অফিসারের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়। ... [মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসপি রচিত-'বাংলাদেশঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ সংকলিত। -সম্পাদক]